অভিযান

রাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
মাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, ১২

—পাঁচ টাক

প্রথম সংস্করণ—পৌষ,

দ্বিতীয় সংস্করণ—আষা

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে ঘোষ কর্তৃক প্রকা
দি প্রিন্টিং হাউস, ৭০, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা [illegible]নাথ সিংহ কর্তৃক

শ্রীযুক্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলেষু

…পুর, বীরভূম

…য—১৩৫৩

এই লেখকের—

কবি
মন্বন্তর
পঞ্চগ্রাম
ধাত্রীদেবতা
গণদেবতা
প্রতিধ্বনি
কালিন্দী
স্থলপদ্ম
বেদেনী
ছলনাময়ী
১৩৫০
ইমারৎ
রসকলি
জলসাঘর
হারানো সুর
চৈতালী ঘূর্ণি
আগুন
রাইকমল
নীলকণ্ঠ
পাষাণপুরী
ত্রিনশূন্য
যাদুকরী
দিল্লীকা লাড্ডু
সন্দীপন পাঠশালা
হাঁসুলীবাঁকের উপকথা
দুইপুরুষ
দ্বীপান্তর
পথের ডাক
বিংশ-শতাব্দী

মিত্র ও ঘোষ,
দি প্রিন্টিং হাউস,
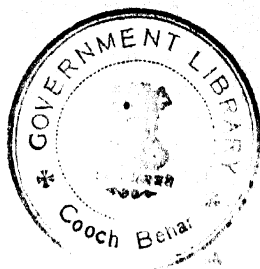
এক

উত্তর-দক্ষিণে বরাবর চলে গিয়েছে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তা। দেশের লোক বলে পাকা শড়ক। ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের খাতায় আছে—মেটাল্ড রোড! বারো ফুট চওড়া; লম্বায় মেন মেটাল্ড রোড থেকে "রামনগর রিভার ঘাট" পর্য্যন্ত টুয়েলভ মাইলস্—অর্থাৎ রামনগর নদীর ঘাট পর্য্যন্ত বারো মাইল লম্বা।

পাথরের নুড়ি বিছিয়ে তার উপর বালিবহুল লাল আঠালো কাঁকর-মাটি ফেলে বর্ষার সময় রোলার চালিয়ে জমানো হয়েছে। বারো ফুট চওড়া লাল ফিতের মত মাঠও গ্রামের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে। অ্যাশফল্ট কি কংক্রিটের রাস্তার মত মসৃণ নয়, লাল কাঁকর-মাটির বিছানির সর্ব্বাঙ্গে পাথরের নুড়িগুলোর মাথা বেরিয়ে আছে, সেই জন্যই খুব শক্ত। দেশের লোকে বলে বজ্র-কঠিন। বজ্র-কঠিনই বটে—আছাড় খেয়ে পড়লে সর্ব্বাঙ্গে পাথরের নুড়ির মাপের কালশিটেতে ভরে যায়, মাথা কপাল ফাটে, দু-চার জায়গায় কেটেও যায়। পাথরের নুড়িগুলো গোলালো, দু-একটা তীক্ষ্ণ ধারালো হয়েও উঠে থাকে। উপর থেকে দেখে বেশ মসৃণ কোমল মনে হয়। লাল মাটির ধুলো কোমল ফাগের মত জমে থাকে। লালচে ধোঁয়ার মত ওড়ে। আজ উড়ে চলছে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর-মুখে।

নরসিংয়ের মোটরখানা চলছে। পুরনো মডেলের গাড়ী। হুডের কাঠামো নতুন, বডির রংও চকচকে। কিন্তু মাডগার্ডগুলো টোল খাওয়া—মধ্যে মধ্যে জং ধরে ছিদ্রও হয়ে গেছে। দরজার হ্যাণ্ডেলগুলোর রূপোলী কলাই উঠে গিয়ে পেতল বেরিয়ে পড়ছে। দরজাগুলো গাড়ীর চলার বেগে বিচিত্র ভঙ্গিতে নড়ছে; এ কোণটা যখন নামছে, ও মাথাটা তখন উঠছে, তবে বেশী নয়, অল্প-স্বল্প। সামনের কাচের চারি পাশের রবার লাইনিং খসখসে; শীতকালের রুক্ষ মানুষের গায়ের মত ফাটি-ধরা, জায়গায় জায়গায় একটু-আধটু খসেও গিয়েছে। পুরনো গাড়ী। বয়েস হয়েছে। কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দে একটু খুঁত নাই। একটানা ওঁ-ওঁ শব্দ করে চলেছে। আয়রণ-চেষ্টের মত শক্ত কলিজার মানুষের মত কলিজা ওর—এই কথা নরসিং বলে রসিকতা করে। বছর দুয়েক আগে নরসিং একবার বুক দেখাতে গিয়ে ডাক্তারকে প্রশ্ন করেছিল—চেষ্ট কেমন দেখলেন স্যার? ডাক্তার হেসে বলেছিলেন—আয়রণ-চেষ্টের মত শক্ত। প্রাণ-সম্পদ তোমার নিরাপদেই আছেন। কোন ভয় নেই। নরসিং সেই অবধি উপমাটি ব্যবহার করে তার গাড়ীর ইঞ্জিন সম্পর্কে।

নরসিংয়ের গাড়ীখানা সখের নয়, 'ট্যাক্সি-কার', নিয়মিত সময় ধরে ছাড়ে ইমামবাজার থেকে—জেলার সদর শহর। ছাড়ে ভোর ছ'টার সময়। সাত মাইল পাল্লা দেয় ছোটি-লাইনের গাড়ীর সঙ্গে। রেল-লাইন আর ডি বি রোড চলেছে পাশাপাশি। দস্তুর নরসিং। বড় বড় দাঁত বার করে রেল-ইঞ্জিনের ড্রাইভারকে ভেঙচায়, কখনও ব্যঙ্গ হাসি হাসে আর রেল-লাইনের পাশের রাস্তা ধরে গাড়ী চালিয়ে যায়। ড্রাইভারও ভেঙচায়, হাসে। রাস্তায় তিনটে লেবেল-ক্রসিং আছে, প্রথমটা পড়ে ইমামবাজার পেরিয়েই, সেখানে রেল-কোম্পানীর ফটক নাই; নরসিং সেটা পার হয় প্রায় লাফ দিয়ে; সার্কাসের মোটর গাড়ীর নালা পার হওয়ার কৌশলে রেল-ইঞ্জিনের দশ-পনের গজ সামনে দিয়ে পার হয়ে যায়। গ্রাম থেকে বেরিয়েই পড়ে একটা বাঁক, সেই বাঁক পার হয়েই নরসিং বাঁ প ক্লাচ-চেপে গীয়ার বদলে আনে টপ-গীয়ারে। তার পর ক্লাচ ছেড়ে দি

দিয়ে চাপে এ্যাক্সিলারেটারকে ; সেটাকে একেবারে নিঃশেষে বসিয়ে দিয়ে দু' হাতের মুঠোয় ষ্টীয়ারিং শক্ত করে ধরে। পেট্রোলগন্ধী ধোঁয়ার রাশি বের হয় গাড়ীখানা গর্জন করে ওঠে। স্থানীয় প্যাসেঞ্জারেরা সাবধান হয়ে বসে, কিন্তু তারা ভয় পায় না ; নরসিংয়ের এ কৌশল তাঁদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে ; গাঁইয়া কেউ থাকলে সে ভয় পায়, চীৎকার করে ওঠে। গাড়ীখানাকে উল্কাবেগে ছুটতে দিয়ে —সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে নরসিং হিংস্র বিরক্তিতে গর্জ্জন করে ওঠে —এ্যাও! বলতে বলতে গাড়ীখানা তখন ওপারে পেরিয়ে যায়। নরসিং ভীরু প্যাসেঞ্জারের কথা ভুলে যায়, সে গাড়ীর গতিবেগ কমিয়ে পিছনের দিকে ইঞ্জিন্-ড্রাইভারের দিকে চেয়ে ব্যঙ্গ হাসি হাসে আর ডান হাত বাইরে প্রসারিত করে বুড়ো আঙুল নাড়ে।

কণ্টক যেখানে আছে, সেখানে আটক পড়তে হয় নরসিংকে। সেখানে ইঞ্জিন-ড্রাইভার হাসতে হাসতে দাড়ীতে হাত বুলায়, মুখ বাড়িয়ে জোরে শিষ দেয় —যে ভাবে কুকুরের মালিক শিষ দিয়ে ডাকে কুকুরকে। এমনি ভাবে পাল্লা দিয়ে সাত মাইল দূর পর্য্যন্ত চলে। সাত মাইল দূরে রেলওয়ে জংসন। সেইখানেই শেষ হয়েছে ছোট-লাইন। তার পর বাইশ মাইল পাল্লা বিশখানা মোটর-বাস আর ট্যাক্সি-কারের সঙ্গে। মূল রেল-লাইন চলে গিয়েছে সোজা উত্তর-মুখে। সদর শহরের মামলা-মকর্দ্দমা সরকারী কাজকে সে গ্রাহ্য করেনি ; সে গিয়েছে বিপুল শস্য-সম্পদ উৎপাদনকারিণী গাঙ্গেয়তটভূমি ধরে গঙ্গার পাশে-পাশে। সদর শহর রেল-জংসন থেকে বাইশ মাইল পশ্চিমে। অনুর্ব্বর প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পথ। এই পথে নরসিংয়ের এবার পাল্লার কৌতুক—সর্ব্বাগ্রে যাওয়ার কৌতুক। রাশি-রাশি ধুলা উড়িয়ে চলে সে। সেই ধুলায় পিছনের গাড়ীর যাত্রীদলের চুলের ডগা থেকে কাপড় জামা সমস্ত ধূসর হয়ে ওঠে ; তারা নাকে কাপড় দেয়, কাশে।

সদর থেকে ফেরে আড়াইটার সময়। ইমামবাজারে পৌছায় বেলা পাঁচটায়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আর একটা ট্রিপ ; টিপ সদর পর্য্যন্ত নয়— রেলওয়ে জংসন পর্য্যন্ত। সেখানে সাড়ে আটটার ও ন'টার ট্রেণ ধরিয়ে দেয়

এবং ওই দুটো ট্রেণের প্যাসেঞ্জার নিয়ে ফিরে আসে। এ সময় প্রতিযোগিতা নাই। ছোট-লাইনের ট্রেণ যায়, কিন্তু সাড়ে আটটার ট্রেণখানা ধরায় না এবং সমস্ত রাত্রের মধ্যে আর ফেরেও না। রাত্রে ফেরবার সময় নরসিংয়ের গাড়ীর মাডগার্ডে লোক চাপে; ফুটবোর্ডে লোক দাঁড়ায়, ভিতরে লোক চাপে খোঁয়াড়ের ভিতর গরু-ছাগলের মত অথবা পাখীওয়ালার খাঁচার 'বগেড়ি' পাখীর মত। গাড়ীখানা তখন চলে ধীর-মন্থর গতিতে। রাস্তার দু'পাশে ঘন গাছের সারির মধ্যে হেড-লাইটের আলো ফেলে নরসিং ভাবতে থাকে সেই সব কথা, যা ভাববার অবকাশ আর সমস্ত দিনের মধ্যে হয় না।

কত মুখ মনে পড়ে, যে সব সুন্দর মুখ ত্রিশ-পয়ত্রিশ মাইল বেগে মোটর চালাবার সময় চকিতের মত চোখে পড়েছিল। সারিবন্দী চলমান লোকের মুখ যাওয়া-আসার পথে তার দ্রুত ধাবমান গাড়ীর পাশ দিয়ে চলে যায় বায়স্কোপের ছবির মত। তার মধ্যে আশ্চর্যভাবে মনে থাকে একখানি কি দু'খানি সুন্দর মুখ। রোজ নূতন একখানি দু'খানি মুখ। আবার কত দিন আগে দেখা একখানি মুখ নিত্যই মনে পড়ে। সে রোজ ভাবে কাল আবার দেখবে তাকে। নরসিং জানে না—তার বিধাতা জানেন—কখনও কখনও তাদের এক জনের সঙ্গে তার দেখাও হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, নরসিং তাকে তখন সেই সুন্দর মুখ বলে চিনতে পারে না। হয় তো পাশ থেকে-দেখা মুখ সামনে থেকে দেখে অন্য রকম মনে হয়। তা ছাড়া যে মুখখানা সে দেখতে চায়, সে মুখ তো এক জনের মুখ নয়। কত মুখ মিশে সে মুখ রচিত হয়েছে তার মনে। রোজই সে তিল তিল করে বদলায়। শুধু অবশ্য এই মুখই ভাবে না সে; এই অলস রথ-চালনার সময় মাকে মনে পড়ে, বাপকে মনে পড়ে, গ্রাম মনে পড়ে। আবার কোন দিন মনে মনে হিসেব করে টাকা-কড়ির। পাশ-বইয়ে কত আছে, নিজের কাছে কত আছে, সবশুদ্ধ জড়িয়ে কত হল, যোগ দিয়ে খতিয়ে দেখে ভাবে গাড়ীখানা পাল্টে একখানা নতুন গাড়ী কেনার কথা, ট্যাক্সির বদলে বাস কেনার কথা, পেট্রোল-বিক্রীর

ব্যবসার কথা। কিন্তু সাত মাইল রাস্তায় যতই আস্তে চলুক মোটর, বিলাস করে ভাববার সময় কতটুকু! দেখতে দেখতে ইমামবাজারের হাটের চৌ-মাথায় এসে পৌঁছে যায়। তার পর গ্যারেজে গাড়ী ঢুকিয়ে স্নান করে। আট মাস দীঘির জলে, অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন চারটে মাস বাড়ীতে, চার মাসের দু'মাস গরম জলে স্নান করে। তার পর আরাম করে আধ পাঁট পচিশ-ডিগ্রী পাকী মদ একটু একটু করে পান করে, তার সঙ্গে গরম তেলে-ভাজা আর সিগারেটের বদলে গুড়গুড়িতে তামাক। সঙ্গে থাকে নিতাই ক্লীনার। রাম কণ্ডাকটার সে ছেলেমানুষ, তার উপর সে নরসিংয়েরই শালা। নরসিং রামকে মদের ভাগ দেয় না। ছেলেমানুষ—ভিতরটা এখনও কাঁচা নরমাই আছে, পঁচিশ ডিগ্রীর বড় ঝাঁঝ।

রবিবার দিন সদর শহরে যায় না গাড়ী। কোর্ট বন্ধ। সেদিন সকালে যায় ওই জংসন পর্য্যন্ত। ফেরে ন'টার মধ্যে। ফিরেই গাড়ীখানা নিয়ে যায় বামুনপুকুরে। মজে এসেছে বামুনপুকুর, পাড় ক্ষয়ে গেছে, নরসিং সটান গাড়ীখানাকে নিয়ে যায় পুকুরের জলের কিনারায়। তার পর তিন জনে ধুতে আরম্ভ করে গাড়ীকে। ধুয়ে মুছে বাড়ী এসে—যন্ত্রের অস্থি-সন্ধিতে ভাল করে মুছে দেয় গ্রীজ মোবিল, যেখানে যা প্রয়োজন।

নিজেরা চুল কাটে, দাড়ী কামায়, নখ কাটে, কাপড় পাঠায় ধোবার বাড়ী, জুতোতে কালি লাগায়। জুতো অবশ্য একা নরসিংয়েরই আছে। নিতাইয়ের জুতো নাই; রামের আছে এক জোড়া স্যাণ্ডেল। রবিবারে আছে সাবান মাখার পালা। সে সাবান মাখা এক ঘণ্টার পর্ব্ব। দুপুরে সে দিন পড়ে তাসের বাজী, পাশার দান; রাত্রে সে দিন মাংস রান্না হয়, বাজারে মাংস বড় পাওয়া যায় না, হাঁস কিনে আনে নিতাই; হাঁসের মাংস রান্না হয়। পুরো বোতল আসে সে দিন। রাম সে দিন ভাঙ খায়। নরসিংয়ের আসরে সে দিন চলে তে-তাসের জুয়াখেলা। যারই হার হোক—ভাঙের নেশায় রাম অনর্গল হাসে। নরসিং নেশায় এবং খেলায় মশগুল হয়ে থাকে। নিতাইটা বসে থাকে ভাম হয়ে,

প্রকাণ্ড বড় মুখখানার মধ্যে অত্যন্ত ছোট দুটো চোখ—সেও আধখানা বন্ধ হয়ে আসে। খেলা চলে। খেলতে আসে নরসিংয়ের বন্ধুরা—এখানকার ষ্টেশনের ষ্টলওয়ালা লোকটা দুর্দ্দান্ত মাতাল, কয়লার ডিপোওয়ালা কালী সিং পশ্চিমা ছত্রি, সোনার গয়নার শান-পালিশওয়ালা লুৎফর রহমন, থানার কনেষ্টবল জোবেদ আলী, ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার রমেশ, বুড়ো-দোকানী শশী চৌধুরী আরও মধ্যে মধ্যে আসে রেল-লাইনের ভারপ্রাপ্ত ফিটার—হরকিষণ। যে রবিবারে হরকিষণ এ ষ্টেশনে আসে—থাকে—সে দিন তার আসা চাইই। সকলে মিলে সে দিন মদের জন্যে চাঁদা দেয়, রাত্রিতেই ছুটে যায় আরও কয়েকটা হাঁসের বা একটা খাসীর খোঁজে। ঠন ঠান শব্দ করে টাকার দান পড়ে, লোকগুলি নিঃশব্দ; তাস উল্টান হয়—যে দান পায় সে টাকা নেয়, বাকী টাকা নেয় যে তাস খেলেছে—সে। রাম হা-হা শব্দে অনর্গল হাসে। সাধারণতঃ নরসিং কিছু বলে না। এক-আধদিন ক্ষেপে যায়। বেমক্কা মাটির উপর একটা চাঁপড় মেরে বলে ওঠে, এ বেতমিজ, বেসায়েস্ত বেয়াদপ কাঁহাকা!

রাম চমকে ওঠে। নিতাইও ঢুলতে-ঢুলতে চমকে উঠে সজাগ হয়ে বসে—বেকুবের মত জিজ্ঞাসা করে—এঁ্যা?

কালী সিং নরসিংকে শান্ত করে—মান যা ভাইয়া—যানে দো। আবার অনেক সময় বলতেও হয় না—রাম চমকে উঠে চুপ করতেই নরসিং চুপ করে খেলায় মজে যায়।

সোমবার ভোরেই আবার সপ্তাহের বাঁধা-কাজ সুরু হয়। রবিবারের কাচা ফর্সা গেঞ্জি, হাত-কাটা খাকী হাফ-সার্ট পরে চোখে গগল-চশমা এঁটে গাড়ীর চাবী খুলে সিটে বসে বলে—মার হ্যাণ্ডেল!

নিতাই হ্যাণ্ডেল ঘুরায়। রাম ভাল মানুষের মত দাঁড়িয়ে থাকে—গাড়ীর দরজা ধরে। গাড়ী যখন ছুটতে থাকে—তখন নিতাই বসে মাডগার্ডে, রাম থাকে ফুটবোর্ডে খাড়া। দু'রকম হর্ণ আছে গাড়ীতে—রবারের বল দেওয়া

অভিযান

হর্ণ টা বাজে ভোঁ—ভোঁ শব্দে—আর একটা হর্ণ বাজে অতর্কিত মানুষকে চমকে দিয়ে ক্যাঁ—এ্যা। ইলেকট্রিক হর্ণ আর বাজে না।

*　　*　　*　　*

আজ কিন্তু মোটরখানা তার বাঁধা রুটে চলছে না। সদর শহর থেকে ইমামবাজার পর্য্যন্ত যে রাস্তা—সেই রাস্তাই হল ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের মেন মেটাল্ড রোড। ওটা চলে গেছে সিধে পূর্ব্বদিকে—এ জেলা থেকে অন্য জেলায়। পূর্ব্ব-পশ্চিমে ও রাস্তাটা আটচল্লিশ মাইল লম্বা। বাইশ মাইলে ইমামবাজার, এই ইমামবাজার থেকেই এই শাখা রাস্তাটি বেরিয়েছে—চলে গিয়েছে রামনগর নদীর ঘাট পর্য্যন্ত—দূরত্ব বারো মাইল। এ রাস্তাতেও একখানা মোটর-বাস চলে। ওই ছোট-লাইনের রেল-কোম্পানী এ জেলার মোটর ব্যবসায়ের হর্ত্তা-কর্ত্তা 'বুধাবাবু'র সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এ মোটর-বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করেছে। এর জন্য ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের সঙ্গেও বিশেষ বন্দোবস্ত করেছে রেল-কোম্পানী। তারা রাস্তা মেরামতের জন্য মোরাম আর পেবেলস্ অর্থাৎ কাঁকর-মাটি আর নুড়ি-পাথর দেয়। নগদ টাকাও কিছু দেয়। বিনিময়ে এ রাস্তায় ওই একখানি বাস ছাড়া অন্য বাস বা মটর নিয়মিত সার্ভিস খুলবার ছাড়পত্র পায় না। তবে কেউ পুরো মোটর ভাড়া করে গেলে মোটর যেতে পারে—পুরো বাস ভাড়া করলে সেও যায়। মধ্যে মধ্যে নরসিংও যায় বর্দ্ধিষ্ণু লোকেদের নিয়ে, তাদের মধ্যে প্রধান হল সা আলমপুরের মিঞা সাহেবেরা। কলকাতায় ছোট-লাটের দপ্তরে চাকরী করেন। একেবারে খাঁটি সাহেবী পোষাক। দরাজ দিল। তা ছাড়া আরও আছে। কিন্তু সে সব লোককে খাতির করে না নরসিং। বিয়ের ভাড়া নিয়েও যায় মধ্যে মধ্যে। বাসে যায় বরযাত্রী 'কায়স্থের' গৌরবে—নরসিংয়ের ট্যাক্সিতে যায় বর। কালে-কস্মিনে আনতে যায় ডাক্তার। জটাধারী ডাক্তার বিচক্ষণ চিকিৎসক। কিন্তু সে থাকে তার গ্রামে—নদীর ধারে এক অজ পাড়াগাঁয়ে। দিনের বেলা হলে জটাধারী নিজের ঘোড়ায় আসে। রাত্রি হলে নরসিংয়ের ট্যাক্সি যায়। এ সব হল দাঁও।

অভিযান

আজ কিন্তু নরসিংয়ের ট্যাক্সি চলেছে খালি। খালি অর্থে নরসিং, রাম এবং নিতাই ছাড়া আর লোক নাই গাড়ীতে। খালি রাস্তা, হু-হু করে চলেছে গাড়ী, এ্যাক্সিলারেটার চেপেই আছে পায়ে। পিছনে লাল ধুলোর আবর্ত্তের মধ্যে পেট্রোলের ধোঁয়া নদীর গেরুয়া রঙের বন্যার জলের মধ্যে পাশের গ্রাম্য ঝর্ণার কাল জলের ধারার মত ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। দু'ধারে ধান-কাটা মাঠ। পথের পাশে বট-পাকুড়ের গাছ। মাঠের মধ্যে রাস্তা চলেছে সোজা। দু'তিন মাইল অন্তর এক-একখানা গ্রাম। গ্রামে ঢুকবার এবং বের হবার মুখে রাস্তা বিসর্পিল পাকে বাঁক নিতে বাধ্য হয়েছে। আকুলিয়া গ্রাম ফেলে এসেছে পিছনে। গ্রাম থেকে উত্তর-মুখে নির্গমন পথে ঘন তেঁতুল-জঙ্গলে-ভরা পুকুরটাকে বেড় দিয়ে রাস্তার যে বাঁকটা—সেটা পার হয়েই সোজা চলেছে গাড়ী। চুপচাপ বসে আছে নিতাই। পিছনে খুব আরাম করে লক্ষপতির মত ঢঙে হেলে বসে রাম বিড়ি খাচ্ছে। নরসিং একটা আক্রোশের উপর যেন গাড়ী চালিয়ে চলেছে।

আক্রোশই বটে!

বুধাবাবুর চোখ-রাঙানি, পুলিশ সায়েবের ড্যাম-সোয়াইন গালি-গালাজ, দারোগা-ইনস্পেক্টারের হুমকী সবই এতদিন সহ্য হয়েছে। রাত্রে বাড়ী ফিরে হিসেব করে থলি ঝেড়ে সিকি আধুলি টাকা নোট গুণবার সময় দিনের ওই সব গ্লানি সে ভুলে যেত। কিন্তু কিছু দিন থেকে রেল-কোম্পানী প্রথম সাত মাইলে উঠে পড়ে লেগেছে—নরসিংহকে ঘায়েল করতে। সাত মাইলের মধ্যে ছ'খানা সাটল্ ট্রেণের ব্যবস্থা করেছে। ওদিকে জংসন থেকে সদর পর্য্যন্ত বুধাবাবুর একচেটিয়া এলাকা। একেবারে ইমামবাজার থেকে সদর শহরের যাত্রী না পেলে জংসনে যাত্রী সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার। ইমামবাজারের লোকেরাও বেইমান। তারা এখন ওই সাটল্ ট্রেণের সুবিধা পেয়ে ওতেই ছুটছে। বলে পয়সা দিয়ে কথাই বা শুনব কেন আর গরু-ছাগলের মত ঠাসাঠাসি করেই বা যাব কেন? এতেও সে চালিয়ে যাচ্ছিল গাড়ী। দমে নাই। কিন্তু হঠাৎ আজ চার দিন আগে এস-ডি-ও তাকে বললে—শূয়ার-কি-বাচ্চা! শুধু তাই

নয়। আচমকা পিঠের উপর বসিয়ে দিলে হাতের লিক্‌লিকে বেতখানা। একবার, দু'বার, তিন বারের বার নরসিংহ খপ করে ধরে ফেলেছিল বেতখানা। বড় বড় চোখ দুটো ধ্বক-ধ্বক করে জ্বলে উঠেছিল--ছত্রি রাজপুতের ছেলে সে, পায়ের নখ থেকে মাথা পর্য্যন্ত সন্-সন্ করে রক্ত চলতে আরম্ভ করেছিল, কান দুটো গরম হয়ে উঠেছিল আগুনের মত। বেতখানা চেপে ধরে সে বলেছিল—মারবেন না স্যার!

ঘটনাটা ঘটেছিল এই।

সেদিন ইমামবাজারেই নরসিংয়ের ট্যাক্সি সদর পর্য্যন্ত পুরো ভাড়া হয়ে গিয়েছিল। একটা মামলার সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে যাচ্ছিল বাদী। গাড়ীর পুরো ভাড়ায় নরসিং নিয়েছিল আট জনের ভাড়া। গাড়ীতে প্যাসেঞ্জার নেওয়ার বিধি পাঁচ জন। নরসিং সাধারণত সকালের ট্রিপে নেয় সাত জন। তার পাশে দু'জন, পিছনের সিটে চার জন, তাদের পায়ের তলায় এক জন। রাত্রের ট্রিপে তারও বেশী হয় অবশ্য। সদর শহরে ঢুকবার আগেই ভাড়া আদায় করে নিয়ে প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দেয়। বুধাবাবুর বাস, ট্যাক্সিও তাই করে। যাক্ সে কথা। আট জনের ভাড়া পেয়ে নরসিংয়ের গাড়ী ছাড়ার তাড়া ছিল না। বাদীরও সাক্ষীদের ডেকে একত্রিত করতে অল্প দেরী হয়েছিল। গাড়ী যখন জংসনে পৌঁছুল, তখন বুধাবাবুর বাস, ট্যাক্সি সবই প্রায় ছেড়ে গিয়েছে। মাত্র একখানা বাস তখনও দাঁড়িয়েছিল—প্যাসেঞ্জার জোটে সেখানা ছাড়বে, না হলে এখানেই থেকে যাবে। নরসিং জংসনে না দাঁড়িয়েই সটান বেরিয়ে গেল। জংসনের বাজার থেকে বের হয়েই দু'ধারে অনুর্ব্বর প্রান্তর—মধ্যে দিয়ে সেই রোড, মেটাল্ড রোডের উপর সামনেই ধুলোর মেঘ যেন মাটি থেকে আকাশ পর্য্যন্ত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। নরসিংয়ের কাছে এটা অসহ্য। প্রথমতঃ—সকলের পিছনে যাওয়ার কথা ভাবতে গেলেই তার মেজাজ বিগড়ে যায়, দ্বিতীয়তঃ—ধুলো। দুটোই সে বরদাস্ত করতে পারে না। চৌদ্দ-পনেরোখানা আকণ্ঠ-বোঝাই ঢাউস বাস সামনে—খান তিন-চার ট্যাক্সি আছে তার আগে।

তার উপর ঠিক তার সামনে কয়েকখানা গরুর গাড়ী। গরুর গাড়ী অবশ্য একেবারে রাস্তার ধার ঘেঁসে চলে, রাস্তাটার মাঝখানটা পাকা, দু'ধার কাঁচা। একখানা গাড়ী কিন্তু মাঝখান দিয়ে চলছিল। গাড়োয়ানটা ছোকরা, গরু দুটোরও বয়স কাঁচা, চেহারাও বেশ তাজা। ছোকরা গরু দুটোকে ছুটিয়ে চীৎকার করছিল—এই ছুটেছে আরবী ঘোড়া! পিছনের হর্ণ শুনেও সে ত্রস্ত হল না—নিজেদের অর্থাৎ গরুর গাড়ীর সারির সকলকে অতিক্রম করে আগে এসে তবে পাশ কাটিয়ে রাস্তা ছেড়ে দিল।

নরসিং পায়ের কাছ থেকে গোল কুণ্ডলী-পাকিয়ে-বাঁধা খানিকটা দড়ি তুলে নিয়ে গম্ভীরভাবেই বললে—নিতাই! বলেই সে দড়ির কুণ্ডলীটা রামের হাতে দিলে। রাম অভ্যাস মত ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়েছিল, নিতাই বসেছিল বাঁ-দিকের মাডগার্ডে। রাম দড়িটা এগিয়ে দিলে নিতাইয়ের হাতে। নিতাইকে কিন্তু কিছু বলতে হল না, চট করে দড়ির কুণ্ডলীটা খুলে নিয়েই ঘোরাতে আরম্ভ করলে দড়িটা। গরুর গাড়ীখানার কাছ ঘেঁসে নরসিংয়ের ট্যাক্সি পার হবার সময় গতি ঈষৎ মন্থর হয়ে গেল; নিতাইয়ের হাতের দড়িটা পাক খেতে খেতে ঠিক সময়টিতে সোজা আছাড় খেয়ে পড়ল ছোকরা-গাড়োয়ানটার পিঠে। ডগায় গিঁট-দেওয়া মজবুত-পাকের সওয়া ইঞ্চি মোটা দড়ি; নিতাই প্রায় ছ'ফুট লম্বা জোয়ান; ছাতির মাপ ছত্রিশ ইঞ্চি, তার হাতের জোরে ওই দড়িটা সপ্ শব্দ করে পড়ল পিঠে। গাড়োয়ান ছোকরা চীৎকার করে উঠল—বাবা!

তার চেয়েও কিন্তু জোরে কঠিন আক্রোশভরা-কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল নরসিং—এ্যাও শূয়ার কি বাচ্চা!

বলতে বলতে ট্যাক্সি হু-হু করে বেরিয়ে গেল। এর পর সামনে বাস। পঞ্চাশ-ষাট গজ অন্তর চলেছে; ওরা রাস্তা ছেড়ে দেবে না। পাশের ধুলো-ভরা কাঁচা অংশটার উপর দিয়ে পাশ-কাটিয়ে-যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। ষ্টীয়ারিং ঘুরিয়ে এক বার ডান দিক এক বার বাঁ দিক দেখে নিল সে। মাডগার্ডের উপর থেকে নিতাই বললে—রাইট সাইড।

হাড়ির ছেলে নিতাই অনেক ইংরিজী কথা শিখেছে। তা ছাড়া গাড়ী চালানোর ব্যাপারে নিতাইয়ের বিচার-বুদ্ধি খুব পাকা। ষ্টীয়ারিং ঘুরিয়ে নরসিং ডান পাশের কাঁচা দিকটায় নিয়ে এল গাড়ী। টপ-গীয়ারে এনে চেপে ধরলে এ্যাক্সিলারেটার। ধুলোর রাশি ঠেলে উড়িয়ে গাড়ী বাস অতিক্রম করে চলল। চারখানা বাস অতিক্রম করে চলল। চারখানা বাস অতিক্রম করে কিন্তু আবার তাকে মাঝখানে আসতে হল, রাস্তা সংকীর্ণ হয়েছে এবং উঁচু বাঁধের মত চলেছে। দু'পাশের উষর প্রান্তর, শেয়াকুলের গুল্ম-সঙ্কুল বিস্তীর্ণ পতিত জমি। বালিতে মাটিতে জমে পাথরের মত শক্ত, বর্ষার সময় ছাড়া ঘাস পর্যান্ত গজায় না। প্রায় মাইল দেড়েক চলে গিয়েছে এ প্রান্তর। উপায় নাই। নরসিং দু'বার সামনের বাসের পিছনে খুব কাছে গিয়ে হর্ণ দিলে। কিন্তু বুধাবাবুর বাস-ড্রাইভার সে গ্রাহ্যও করলে না। ফুট দুয়েক যদি বাঁয়ে সরে যায়, তবে অনায়াসে নরসিং পার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে তারা দেবে না। উল্টে গাড়ীর স্পীড কমিয়ে খানিকটা বেশী ধোঁয়া ছেড়ে দিলে। নরসিং পিছনের দিকে চেয়ে যাত্রীদের বললে—চুপ করে বসবে সবাই, কোন ভয় নাই। নিতাই, রাম—হুঁসিয়ার! বলেই সে গাড়ীখানার মুখ আরও ডান দিকে ঘুরিয়ে রাস্তা থেকে পাশের প্রান্তরমুখী ঢালের মুখে ছেড়ে দিলে। ফুটব্রেক হ্যাণ্ডব্রেক কষবার জন্য উদ্যত থেকে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। ঢেউয়ে-দোল-খাওয়া নৌকার মত দুলতে দুলতে গাড়ীখানা নেমে পড়ল প্রান্তরে। তার পর আবার এক বার সে গাড়ীখানাকে ছাড়লে। যথা সম্ভব শেয়াকুলের গুল্মগুলোকে এড়িয়ে শক্ত সমতল প্রান্তরের উপর দিয়ে মসৃণ গতিতে গাড়ী ছুটল।

নিতাই উৎসাহে আনন্দে বলে উঠল, বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা—কেয়াবাৎ। রাম বাঁ-দিকে রাস্তার উপর চলমান বাসগুলোকে অতিক্রম করতে করতে বলতে লাগল, চলো তুফান মেল!

নরসিংয়ের মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিয়েছে। সমস্ত বাসগুলোকে পেরিয়ে সে একবার পিছন দিকে তাকিয়ে বললে—শা (সা)—লা!

এর পর সামনে দু'খানা 'কার'। একখানা—বুধাবাবুর, অন্যখানা হরেন সাহার। ট্যাক্সির স্পীড আরও বাড়িয়ে দিল নরসিং। সামনে এখন প্রায় সিকি মাইল পতিত ডাঙ্গা রয়েছে। সিকি মাইল অতিক্রম করতে হল না, খানিকটা যেতেই সে গাড়ী দু'খানাও পিছনে পড়ল। ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের পাকা শড়কের চেয়ে সমতল প্রান্তরে গাড়ী অনেক বেশী অনায়াস গতিতে চলতে পারছে!

নিতাই বললে, এমনি রাস্তা হয় শালা!

নরসিং গম্ভীরভাবে বললে, ভগবানের তৈরী আর মানুষের তৈরী বুঝলি! তফাৎ অনেক! বলতে বলতে সে ফের টপ-গীয়ার দিয়ে গাড়ীখানার মুখ রাস্তার বাঁধের দিকে ঘুরিয়ে দিলে। সুকৌশলে সে তুলে নিলে গাড়ীখানাকে রাস্তার উপর। তার পর চলতে লাগল আমিরী চালে। অর্থাৎ পিছনের গাড়ীর উদ্দেশে ধুলো উড়াতে আরম্ভ করলে। পিছনের গাড়ীখানা বার কয়েক হর্ণ দিলে। উত্তরে নরসিং ধোঁয়ার রাশি ছাড়লে।

হঠাৎ নিতাই ত্রস্ত হয়ে উঠল।—এই, এই সিংজী! সিংজী!

সামনের দিকে নিস্পৃহ অলস দৃষ্টিতে চেয়েছিল নরসিং—কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ না করেই সে বললে—কি?

রামও এই সময়ে চঞ্চল হয়ে উঠল, দাদাবাবু! দাদাবাবু!

—কি রে? নরসিং একটু রুষ্ট না হয়ে পারলে না।

—এস-ডি-ও সায়েব!

—কে? চমকে উঠল নরসিং।

—এস-ডি-ও সায়েব! পেছুকার গাড়ীতে!

গাড়ীর পাশে মুখ বাড়িয়ে চকিতের মত পিছনের গাড়ীটা দেখে নিলে নরসিং। এস-ডি-ও'র তকমা-পাগড়ী-আঁটা চাপরাসী গাড়ী থেকে বেরিয়ে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে গম্ভীর আওয়াজে হাঁকছে, এই! এই! এই! খাড়া করো! গাড়ী! এই!

গাড়ীতে ভিতরে সায়েবী-পোষাক-পরা কেউ বসে আছে। নাকে রুমাল

চাপা দিয়েছে। এবার চঞ্চল হয়ে উঠল নরসিং। এবং যা করলে সেও ভেবে-চিন্তে করলে না, করব বলেও করলে না। গাড়ী তার রোখাই উচিত ছিল, কিন্তু সে করলে তার বিপরীত। পূর্ণবেগে গাড়ী চালিয়ে দিলে। গাড়ীর স্পীডোমিটার খারাপ হয়ে গিয়ে কাঁটাটা সরে না, গাড়ীর গতির বেগে কাঁটাটা শুধু ঠক-ঠক করে নড়তে লাগল। পঁচিশ-ত্রিশ মাইল বেগে চলছিল গাড়ীখানা, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু পিছনের গাড়ীখানাও মোটরকার। তার উপর গাড়ীখানা নরসিংয়ের গাড়ীর তুলনায় নতুন। নরসিংয়ের অবশ্য দুর্দান্ত সাহস, যন্ত্রপাতির উপর তেমনি আয়ত্তশক্তি, তার উপর তাগিদটা ভয়ে পালাবার। সে আগেই এসে ঢুকল শহরে। শহরের মুখে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল একটা ছোট পথে। তবু নরসিং ধরা পড়ল শহর থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে। দুপুর বেলায় বে-টাইমে সে খালি গাড়ী নিয়েই যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু শহরের মোড়ে মোড়ে পুলিশ। ধরা পড়ল।

তার পরই ওই কাণ্ড।

নরসিং বেত ধরতেই এস-ডি-ও বেত আর চালালেন না। ওভার-লোডের জন্য বিপজ্জনক গতিতে গাড়ী হাঁকাবার অপরাধে এরেষ্ট করলেন। অবশ্য জামীন সঙ্গে সঙ্গেই হল। মামলাতেও হল অল্প জরিমানা। কিন্তু হাতে সাধ মিটিয়ে না মারতে পেয়ে ক্ষোভে নরসিংহকে মারলেন ভাতে। নানা অজুহাতে তার ট্যাক্সির লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হল। ইচ্ছে ছিল, ড্রাইভিং লাইসেন্সখানাও বাতিল করার, কিন্তু সে হয় নি। মোটর-অভিজ্ঞ বড় সাহেব-ইঞ্জিনীয়ারের মুক্ত-কলমে-লেখা প্রশংসাপত্র ছিল নরসিংয়ের।

তাই নরসিং চলেছে—ইমামবাজার সদর সার্ভিস লাইনের রাস্তা ছেড়ে এই ইমামবাজার-রামনগর ঘাটের পথে। এ পথেও সার্ভিসের লাইসেন্স মিলবে না।

বুধাবাবু এ্যাণ্ড রেল কোম্পানীর মনোপলি সার্ভিস—এটা একচেটিয়া অধিকার।

নরসিংহ সে উদ্দেশ্যেও চলছে না। তার উদ্দেশ্য সে বলেও নাই। নিতাই এবং রামকেও বলে নাই। বলেছে—বাড়ী যাচ্ছি।

রামনগরের ঘাট পেরিয়ে ওপারে মাঠান—অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্র-প্রধান অঞ্চলে তার বাড়ী। ধুলো-ভরা মাঠের পথ। গরু চলে, মানুষ চলে—গরুর গাড়ী চলে।

হঠাৎ নিতাই বললে—আস্তে সিংজী, আস্তে।

—আস্তে?

—সোনাডাঙ্গার বাঁকে ধুলো উড়ছে। গরুর গাড়ী বোধ হয়।

—হুঁ! নরসিং গাড়ীখানাকে ছুটাতে চাইছিল নিজের মনের গতির সঙ্গে সমান বেগে। নরসিং গাড়ীর বেগ সংযত করলে। গাড়ীই বটে।

সোনাডাঙ্গার বাঁক ঘুরে গাড়ী আবার পড়ল উন্মুক্ত শস্যক্ষেত্রের মধ্যে। সামনে তিন মাইল দূরে অভয়াপুর—ডান দিকে চার-পাঁচ মাইল পূবে ভাসতোর, পুনাশী, কামারপাড়া; বাঁয়ে পাঁচ মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে গ্রাম-বনরেখা। গাড়ী ছুটছে। পাশের গ্রামের গাছ-পালা প্রায় স্থিরই আছে, মধ্যবর্ত্তী ফসল-কাটা ধূসর মাঠখানা যেন বৃত্তাকারে ঘুরছে। সামনের গ্রাম অভয়াপুর এগিয়ে আসছে। নদীর এপারে অভয়াপুর, ওপারে রামনগর।

গাড়ী চড়াইয়ে উঠেছিল। এবার ঢাল আরম্ভ হল। বুঝা যায় না ঠিক, মনে হয় সমতল মাঠ। কিন্তু নরসিং জানে এবং গাড়ীর চাকার টানে বুঝতে পারছে। ক্ষেতও ক্রমশ শ্যামল হয়ে আসছে। সামনে দেখা যাচ্ছে রবিশস্য-ভরা মাঠ। কলাই, গম, সরষে। তিলের জমিগুলি গাঢ় সবুজ। তরকারীর গাছ সব লতাতে শুরু করেছে। দু-চারটে জমিতে বাড়ন্ত লতার ফুল ফুটেছে। এই হল নদীর মাঠ। ভারী জোরাল মাটি। বীজ পড়লে এড়ায় না অর্থাৎ ব্যর্থ হয় না এ মাটিতে। তবুও বন্যা কখনও এতটা ওঠে না।

অভয়াপুরের ভিতর রাস্তা অতি সংকীর্ণ। বাঁকগুলোও তেমনি বিচিত্র এবং আকস্মিক। এই গ্রামেই বুধাবাবু এ্যাণ্ড রেল-কোম্পানীর বাসের

এ-প্রান্তের আড্ডা। ইউ পি স্কুলঘরের সামনের খোলা জায়গায় বাসটা দাঁড়িয়ে আছে। এর পরেই একটা 'ত'-কারের মত বাঁক। বাঁক ঘুরে ত্রিশ গজ গি আবার একটা এমনি বাঁক। তারপরই নদীর ঢাল। কাঁচা পথ। এখানে পা করলেও টেকে না। নদী ধুয়ে নিয়ে যায়। মাটি চাপিয়ে দিয়ে যায়। ন ধুলো-ভরা পথ। প্রায় দু'ফুট ধুলো জমে আছে, তুলোর চেয়েও নর: নরসিং ছেড়ে দিল গাড়ীকে। ইঞ্জিন বন্ধ। ঢালের মুখে নেমে চলেছে গাড় দু'পাশে ঘন শরবন এবং নানা আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হল। গাড়ী গড় চলেছে। সামনে দেখা যাচ্ছে নদী। হাঁটুর চেয়েও কম জল। বিস্ত বালুকাময় গর্ভ চিক্ চিক্ করছে। ওপারে দেখা যাচ্ছে—প্রকাণ্ড বড় পরিত্য সিল্ক-ফ্যাক্টরী। নদীর ওধার পাকা, বাঁধানো। বাঁধিয়েছিল সেকালে কুঠিয়ালের রামনগরের ওপারে সাঁকোড়া-চন্দ্রহাট, তার পরই পড়ল দোসরা জেলা। জে মুরশিদাবাদ। ওই জেলাতেই নরসিংয়ের ঘর।

—হাঁ—হাঁ সিংজী! নিতাই সতর্ক করে দিলে।

গাড়ী ঢালের মুখে জোরে নামছে। সামনেই নদীগর্ভ। নদীর ঘাট ন দেখে নামা উচিত নয়।

ফুটব্রেকে চাপ দিতে দিতে হাণ্ডব্রেকে শুধু হাত দিয়ে নরসিং ঈষৎ হাসলে গ্রামের কথায় তার ভাবীকালের কল্পনা মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল—এক অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

গাড়ী থেমে এল।

নরসিং বললে, কি জানি—গাড়ী থেকে ইট দু'খানা বার করে সামনে চাকায় লাগিয়ে দে! সে নেমে পড়ল গাড়ী থেকে।

জিলা মুরশিদাবাদ—গ্রাম 'গিরবরজা'। ছত্রির গ্রাম। নরসিং চলেছে—ওঃ গ্রামের মুখে।

দুই

জেলা মুরশিদাবাদের এই অংশটা নরম কালো মাটির দেশ। কাঁকর নাই, পাথর নাই; বালি যা আছে, তাও অত্যন্ত মিহি আর ঝিক্-মিক্ করে গুঁড়ো রূপোর মত; চোখ-জুড়ানো কালো মেয়ের অঙ্গ-লাবণ্যের মত মিশে আছে মাটির সর্ব্বাঙ্গে। জল পড়বামাত্র ওই বালির গুণে মাটি এলিয়ে পড়ে ঘসা-চন্দনের মত। আবার ওই বালির গুণেই বাতাসের স্পর্শ এবং রোদের উত্তাপ সিক্ত-মাটির কাদাভাব অত্যন্ত সত্বর কাটিয়ে মাটিকে সরস ঝুর-ঝুরে করে তোলে। ওই মাটির সমতল মাঠ। বর্ষার সময় জলে এক বার ভরলে আর জল মরতে চায় না। গঙ্গার ধারে বিল-খাল তখন ভরে ওঠে, সেই সব জল-ভরা বিলের চাপে মাঠের জল মরে না। বন্যাও হয় না অথচ জলও মরে না। মাটিতে অফুরন্ত উর্ব্বরতা, কাজেই ধান এখানে অমর। সরকারী সায়েব-সুবোরা মাঝে মাঝে আসে। তারা বলে, এতেও যখন তোমাদের লক্ষ্মী নাই, তখন আর তোমাদের হবে না। এমন ধান-ফলানো মাটি বাংলাদেশে আর নাই, বাখরগঞ্জ আর বর্দ্ধমানের খানিকটা জায়গা ছাড়া। বাখরগঞ্জ কোথায় সে কথা এখানকার চাষী-ভূমিজ জানে না, খোঁজ করার মত কৌতূহলও তাদের হয় না। তবে বর্দ্ধমান তাদের পাশেই। এই গঙ্গার ধারের এলাকার নিচের দিকটাই খানিকটা বর্দ্ধমানের মধ্যে পড়েছে। সাহেব-সুবোর কথা মিথ্যে নয়, সায়েবরা কি মিথ্যে কথা বলে! খাঁটি সত্য কথা। প্রচুর ধান হয়। হাতি-ঠেলা ধান অর্থাৎ গরু-মহিষে গাড়ী ঠেলে এত ধান তুলতে পারে না, হাতি হলে তবে ঠিক হয়। শুধু কি ধান? কলাই, গম, সরষে, মসনে, তিসি, আলু, পেঁয়াজ, আখ—কোন্ ফসলটাই বা না হয়! কিন্তু তবু যে কেন তাদের লক্ষ্মী নাই, সে কথাটা তারা জানে না। সায়েবরা বলে, তোরা হচ্ছিস কুঁড়ের সর্দ্দার। সায়েবদের এই

কথাটি লোকে মানে না। তারা দেহের এক পিঠ মাটিকে, অন্য পিঠ মেঘ আর রোদকে দিয়ে খাটে। লক্ষ্মী ওদের ঘরের মেয়ের মত; জন্মান, দিনে-দিনে বাড়েন, কচি মুখের হাসিতে আলো করে রাখেন দেশটা, তার পর যেই তাঁর ঘরকন্নার কাজে লাগবার বয়স হয়, অমনি চলে যান বিবাহিতা মেয়ের মত। কন্যার মতই ঘরে তাঁর অচলা হয়ে বাস করবার অধিকার নাই। লক্ষ্মী-ফলানো দেশের মধ্যে লক্ষ্মীহীন ছন্নছাড়া গ্রাম সব। ছত্রির গ্রাম গির্‌বরজাও লক্ষ্মীহীন ছন্নছাড়ার গ্রাম।

'গির্‌বরজা' বলে মুখে, লিখবার সময় লেখে কিন্তু 'গিরিব্রজ'। গ্রামের জমিদারের সেরেস্তার কাগজে সেই কোন্ আমল থেকে লেখা হয়ে আসছে। নবাবী আমলের ফারসী 'থাকবন্দী'তে চিঠাতেও লেখা আছে গিরিব্রজ। ছত্রিরা বলে, পরশুরাম যখন নিঃক্ষত্রিয় করতে লাগল, সেই সময় গিরিব্রজ রাজ্যের এক অল্পবয়সী ক্ষত্রিয় মনসবদার রাজার অনাথা কন্যাকে নিয়ে রাজ্য ছেড়ে 'পক্ষীর' দেশ এই বাঙ্গাল মুলুকে এসে এইখানে বাস করেন। 'ক্ষত্রিয়' এই পরিচয় ছড়িয়ে পড়লে কোন দিন সে কথা অমর পরশুরামের কানে পৌছুতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি পরিচয় দেন—জাতিতে তিনি 'ছত্রি'। এই সব বিবরণ লেখা দুটো তামার পাত আছে। ফারসীতে লেখা। একটা হল, যখন মনসবদার রাজকন্যাকে নিয়ে এখানে পালিয়ে আসেন, সেই পুরানো আমলের। অন্যখানা হল মহারাজ মানসিংহের দেওয়া। মহারাজ মানসিংহ নাকি খাতির করে গোটা গ্রামখানাকেই তাদের মৌরসী বন্দোবস্ত দিয়ে গিয়েছেন। সেই বন্দোবস্তের বলে আজ গোটা গির্‌বরজা মৌজাটাই মোকররী মৌরসী হয়ে রয়েছে। নবাবেরা সে মৌরসী বন্দোবস্ত কাটিতে পারে নাই—ইংরেজ সরকারও না। এই তামার পাতটায় মহারাজ মানসিং শীলমোহর দস্তখত দিয়ে গিয়েছেন। এখনও তাদের ঘরে পুরানো তলোয়ার, শড়কী, খাঁটি গণ্ডারের চামড়ার ঢাল আছে। কত বার পুলিশ এসে তাদের ঘর-তল্লাসীর সময় কতক-কতক নিয়েও গিয়েছে, তবুও কতক এখনও আছে কাঠের মাচানের মধ্যে, অন্ধকূপের মত গুপ্ত চোর-কুঠরীতে;

মজা পুকুরের মাটি কাটতে গিয়েও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। গাদা-বন্দুকও ছিল। সেগুলো লুকানো আছে, কিন্তু তার একটাও গোটা নেই। ভাঙা-ভাঙা টুকরো এখানে-ওখানে পড়ে আছে। ছেলেবেলায় একটা নল নিয়ে নরসিং খেলা করেছে।

সেটেলমেণ্টের সময় এসেছিল এক কানুনগো। অনেক দিন আগে। নরসিং তখন ছেলেমানুষ। সে কানুনগো ওই তামার পাতখানার ফটোগ্রাফ তুলে নিয়েছিল। মুরুব্বি ছত্রিদের কাছে পুরানো আমলের গল্প শুনত প্রতি দিন সন্ধ্যায়। তার পর কানুনগো লিখেছিল একখানা কেতাব। সেই বইয়ের একখানা কানুনগো পাঠিয়ে দিয়েছিল গিরবরজায় ছত্রিদের নামে। সে এক তাজ্জব কাহিনী বানিয়েছে। সে কাহিনী পড়ে গিরবরজার মুরুব্বিদের কি রাগ! কেতাবখানা আগুনে দিতে হুকুম হয়েছিল। নরসিং ছিল কাছে দাঁড়িয়ে—তাকেই হুকুম হয়েছিল। কিন্তু ছেলেমানুষ নরসিং তখন পাঠশালায় পড়ত, কেতাব-কাগজের উপর তখন তার ভারী ঝোঁক। বইখানাকে আগুনে না দিয়ে সে সেখানা নিজের দপ্তরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। সে বয়সে নরসিং বইখানা পড়ে সব বুঝতে পারে নাই; পরে বড় হয়ে সে কাহিনী নরসিং কয়েক বার পড়েছে। মধ্যে মধ্যে কয়েক জায়গা এখনও তার কাছে একেবারে দুর্বোধ্য। হিজরী-শকাব্দার কচকচি, তামার পাতের মাপ ইঞ্চি-ফুট, ফারসী লেখার ছবি—এমনি সব ব্যাপার আছে। এগুলো বাদ দিয়ে বাকীটা তার অদ্ভুত ভাল লেগেছে। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন চন্-চন্ করে ওঠে। কানুনগোর উপরে রাগও হয়। সে লিখেছে—"মুসলমানেরা যখন প্রথম আসে বাংলাদেশে—পাঠান রাজত্বে—হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহ অনেক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। মুসলমান পুরুষেরা হিন্দুর কন্যা বিবাহ করতেন, অনেক স্থলে জোর করে কন্যা হরণ করে আনতেন, অনেক স্থলে রাজনৈতিক কারণে হিন্দু-রাজারা কন্যা দান করতেন—এ সব প্রমাণ ইতিহাসে আছে। হিন্দু-পুরুষেরা অনেক স্থলে মুসলমান-কন্যা বিবাহ করতেন—এ প্রমাণও আছে। রাজা যদু, কালাপাহাড়ের কাহিনী

ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এ সব ক্ষেত্রে হিন্দু-পুরুষ সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন। তাঁরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এক সময় হিন্দু-পুরুষেরা মুসলমান-কন্যাকে বিবাহ করেও হিন্দু-সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হতেন না, তাঁরা হিন্দুই থাকতেন—এর প্রমাণও পাওয়া যায়। অর্থাৎ সমাজ মুসলমান-সংশ্রবকে এমন কঠোরভাবে বর্জ্জন করার নীতি প্রথম প্রথম গ্রহণ করেন নাই। সে সময় অনেক অভিজাত মুসলমান পুত্র-কন্যার সঙ্গে তদানিন্তন অভিজাত হিন্দু পুত্র-কন্যার বিবাহ হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে মুসলমান কন্যা হিন্দুর ঘরে বধূ হিসাবে এসে হিন্দু বধূরূপেই পরিগণিত হয়েছেন, যেমন হিন্দু-কন্যা মুসলমান স্বামীর ঘরে গিয়ে মুসলমান বধূ হিসাবে গৃহীত হয়েছেন বা হয়ে থাকেন। গিরবর্রজার রায়-বংশকে প্রদত্ত পাঠান আমলের তামার পাতের সনন্দ এর একটি বিশিষ্ট প্রমাণ। গিরিধারী সিংহকে সনন্দ দিয়েছেন এক পাঠান করদ নবাব বা জায়গীরদার মহম্মদ খলিল উল্লা খাঁ। "দস্যুবৃত্তিধারী বর্ব্বর শত্রু আব্দুল্লা খাঁর আক্রমণে মনসবদার গিরিধারী সিংহ তুমি যে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছ, তাহার জন্য তোমার উপর সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে যখন প্রধান সেনাপতি হত, তখন গিরিধারী সৈন্য-পরিচালনা করিয়া অধিকৃত-প্রায় দুর্গ হইতে শত্রুদের বিতাড়িত করিয়াছ; এবং পলায়িত শত্রুদলকে অনুসরণ করিয়া আব্দুল্লা খাঁকে নিহত করিয়াছ, তাহার দুর্গ দখল করিয়াছ; এই জন্য তোমাকে আমি বর্ক-আন্দাজ অর্থাৎ বজ্রের ন্যায় দ্রুতগামী বীর, এই খেতাব দান করিলাম। এবং রায় অর্থাৎ রাজা এই খেতাবও দান করিলাম। তুমি আব্দুল্লা খাঁর যে কন্যাকে বন্দিনী করিয়াছ, তাহাকে আমার বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছ, সে কসুর আমি মাফ করিতেছি। তোমাকে অভয় দিয়া এই সনন্দ পাঠাইলাম, তোমার লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। দরবারে হাজির হইয়া তুমি তোমার খেলাৎ গ্রহণ করিবে।" ফলকের অপর পৃষ্ঠে খোদিত আছে—"মনসবদার বর্ক-আন্দাজ গিরিধারী সিংহ-রায় এবং দৌলতোন্নেসা ওরফে ব্রজবালার বিবাহে গিরিধারী রায়ের নব-নির্ম্মিত

বাসভবনের চতুর্দ্দিকে এক মৌজা জমি জায়গীর প্রদত্ত হইল। দরবারে এই মৌজার কর বার্ষিক পঞ্চ তঙ্কা হিসাবে ধার্য্য রহিল।” কানুনগো লিখেছেন—পরশুরামের ভয়ে রাজকন্যাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রবাদের সঙ্গে এই আব্দুল্লা খাঁর কন্যা দৌলতোন্নেসাকে নিয়ে গিরিধারী সিংহের আত্মগোপন করে থাকার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে। গিরিধারীর ‘গিরি’ এবং দৌলতোন্নেসা ওরফে ব্রজবালার ‘ব্রজ’ থেকেই গ্রামের গিরিব্রজ নামের উৎপত্তি। গ্রামের পত্তনও এই লুক্কায়িত থাকার কাল থেকে।

নরসিংয়ের খুব ভাল লাগে এই কাহিনী। খানিকটা খুঁত-খুঁত করে—অবশ্য, ওই দৌলতোন্নেসা ওরফে ব্রজবালা-সংবাদে; কিন্তু সে যখন কল্পনা করে দৌলতোন্নেসার রূপ, তখন ওই স্বল্প তিক্ততাটুকুও আর থাকে না। সদর শহরের জজসাহেবের কথা তার মনে পড়ে। জজবাহাদুর মেমসাহেব বিয়ে করেছেন। শাড়ী পরে মেমসাহেব, জজসাহেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। পরিষ্কার বাংলা কথা বলে। ভাল ভাল উকীলদের সে গল্প করতে শুনেছে; মেমসাহেব পাঁউরুটি-মাংস খায় না, ভাঁত-ডাল-মাছ খায়। জজসাহেবের দু’টি ছেলেমেয়েকে দেখেছে—ঠিক বাঙালীর ছেলেমেয়ের মত ধারা-ধরণ। ছেলের পৈতেও হবে, নরসিং শুনেছে। নরসিং একথাও জানে যে, জজসাহেব মেম বিয়ে করেছে বলে লোকে তাকে ঘৃণা করে না, হিংসা করে। পূর্ব্বপুরুষ বর্ক-আন্দাজ গিরিধারী সিংহ-রায়ের কথা কল্পনা করতে তার মনে হয়—সে কালের লোকও তাকে এই জজসাহেবের মত হিংসা করত দৌলতোন্নেসার স্বামী হিসেবে। বর্ক-আন্দাজ গিরিধারী সিংহ-রায় সম্বন্ধে সে যখন কল্পনা করে, তখন তার মনে হয়, তার চেহারা আর গিরিধারী রায়ের চেহারা ঠিক এক রকমই ছিল। সে নিজে মাথায় প্রায় সাড়ে ছ’ফুটের উপর। এর উপর সে যদি দামী পাথর, মুক্তো, পালক বসিয়ে রেশমী মুরেঠা বাঁধে, গায়ে পরে ইয়া লম্বা শেরওয়ানী—কাপড়ের বদলে সে যদি পরে চুস্ত পায়জামা, কোমরে ঝুলিয়ে দেয় বাঁকা তলোয়ার,

আর যদি পিছিয়ে যায় সেই আমলে, তবে তার গিরিধারী সিংহ-রায় হতে বাধা কি ?

গভীর রাত্রে মশালের আলো জ্বালিয়ে ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে হাতে রক্ত-মাখা নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে চলেছে সে। ঘোড়া ছুটেছে ঘাড় বাঁকিয়ে ছার্ত্তিকের চালে ঝড়ের মত। পিছনে তার হাজার সওয়ার। মাঠের মাটি ধুলো হয়ে আকাশে উঠছে, কিন্তু অন্ধকারে দেখা যায় না। সামনে কয়েক রশি দূরে প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে তার মালিক নবাব খলিলুল্লা খাঁ বাহাদুরের দুষমণ আব্দুল্লা খাঁ এবং তার লোক-জন। ওরা নিজেদের এলাকায় পৌঁছে কেল্লার মধ্যে ঢুকে ফটক বন্ধ করবার আগেই তাদের ধরতে হবে। তার কালো ঘোড়া ছুটে চলে—পাশের গাছ-পালা পিছনের দিকে চলে—মাঠ ঘোরে চক্রাকারে, চলন্ত মটরের পাশের গাছ ও মাঠের মত। নরসিংয়ের শরীরের ভিতর এক বার রক্ত যেন টগ্‌-বগ্‌ করে ফুটতে থাকে। কল্পনায় নরসিং ঝাঁপিয়ে পড়ে পলাতক শত্রুর উপর। চীৎকার, হাজার সওয়ারের উল্লাস! মুণ্ড খসে পড়ে তলোয়ারের আঘাতে, রক্তে মাটি ভেসে যায়, সোজা তুলে ধরে বলে—খবরদার! মেয়েদের ইজ্জৎ সবার আগে! খবরদার!

"ভাঙো অন্দর-মহলের দরজা। ভাঙো তোষাখানার কপাট।" সব ভেঙে পড়ে। হাজার সওয়ার ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। গিরিধারীরূপী নরসিংহ নাঙ্গা তলোয়ার তোলে।

সে নিজে গিয়ে প্রবেশ করে অন্দর-মহলে। ত্রস্ত পলায়নপর দাসী-বাঁদীর দল শুধু। সে বলে—ভয় নাই।

হঠাৎ তার নজরে পড়ে—অপূর্ব্ব-সুন্দরী কিশোরী মেয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে ধুলোর উপর। প্রথম দৃষ্টিতেই সে বুঝতে পারে শাপলা ফুলের বনের মধ্যে 'শতদল' অর্থাৎ পদ্মকলি এটি।

সে বসে যায় শিয়রে, মুরেঠা খুলে হাওয়া করে, হাঁকে, জল—জল—পানি। জলদি! কিশোরী চোখ খুলে চায়। সকরুণ সে দৃষ্টি। গিরিধারীরূপী

নরসিংহ বলে, কোন ভয় নাই আপনার। তার পর সে হুকুম করে, ডুলি, ডুলি! জলদি ডুলি নিয়ে আয়! জলদি!

ধন-রত্ন সঙ্গে দিয়ে হাজার সওয়ারদের অধিকাংশকে পাঠিয়ে দিল আগে নবাব খলিলুল্লার দরবারে। কয়েক জন বিশ্বাসী অনুচর নিয়ে দোলায় দৌলতোন্নেসাকে চাপিয়ে সে শেষে রওনা হয়ে পালিয়ে এল এইখানে। গঙ্গার ধারের ঘন-জঙ্গলে-ভরা স্থান। বাঘ-সাপে ভরা জঙ্গল।

কল্পনা নরসিংয়ের যতই রঙীন হোক, তাতে রঙের প্রাচুর্য্য যতই থাক, বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিক গবেষণার গঙ্গাজলে তাকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে রঙের আধিক্য মুছে দিয়েও মোটামুটি রেখা-বিন্যাস একই থাকে।

গিরিধারী সিং দৌলতোন্নেসা এবং লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ নিয়ে এসে—গঙ্গা পার হয়ে এ পারে এসে—এই উর্ব্বর ভূমিখণ্ডে গিরিব্রজ গ্রামের পত্তন করেছিল। ঘর-দুয়ার তৈয়ারী হল, পাঁচিলের ঘেরের পর পাঁচিলের ঘের, তার মধ্যে এক-এক চত্বরে বড়-বড় মজবুত ফটক। মোটা কাঠের দরজার উপর ঘন-ঘন লোহার গুল বসানো হল, যেন কুড়ুলে ঘা বসাতে না পারে। ফটকের মাথায় লোক দাঁড়াবার মত জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে বর্শা চালিয়ে যেন আক্রমণকারীকে বাধা দেওয়া যায়। বন্ধু-বান্ধব বিশ্বস্ত লোকেদের বাড়ী তৈরী হল আশে-পাশে। [illegible] তৈরী হল—আজকালকার তুলনায় অপ্রশস্ত রাস্তা। মানুষ চলবে, মানুষের কাঁধে পাল্কী-ডুলি চলবে, ঘোড়া চলবে, গরু চলবে, আর চলবে বয়েল গাড়ী। এর জন্য আর বেশী চওড়া রাস্তার দরকার কি? গ্রামের প্রান্তে এসে বাস করলে শ্রমজীবী নানা জাতি। বাগ্দী, বাউড়ী, মাল, ডোম, হাড়ি, মুচি। তারা ছত্রিদের বাড়ীতে কাজ করত, ঘোড়ার পরিচর্য্যা করত, পাল্কী বহন করত। প্রয়োজন হলে ছত্রিদের পিছনে লাঠি-শড়কী নিয়ে বের হত।

গিরিধারীই শুধু সিংহ-রায়—বাকি যারা ছত্রি, তারা শুধু সিংহ। সিংহ-রায়দের ঘিরে সিংহ-ছত্রিরা বসে ঘিউ-রোটি খেত, শরীরের তদ্বির করত, বাব্‌রী

চুলের যত্ন করত, গোঁপ পাকাত, দাড়ীতে গালপাট্টা বানাত। গঙ্গার ধারের বন থেকে তখন প্রায়ই বাঘ ছিটকে আসত, তারা দল বেঁধে হৈ-হৈ করে বাঘ মারতে বার হত। বাঘ আসতে দেরি হলে, তারা নিজেরাই যেত গঙ্গার ধারের ঘন-জঙ্গলে বাঘের সন্ধানে। সে এক সমারোহের বাঘ-শিকার। বাঘ না পেলে বুনো শূয়ার মারত; খরগোস শিকার ছিল প্রায় নিত্য-কর্ম্ম; পাখী শিকারও করত; কিন্তু তার জন্যে সিংহ-রায় এবং সিংহেরা নিজেদের হাতিয়ার ধরত না। তার জন্য ছিল তাদের পোষা, শিক্ষিত, ছোট জাতের বাজপাখী; এ দেশে এ জাতের বাজপাখীর নামই হল 'শিক্‌রে'। নরসিংহ 'শিক্‌রে' পাখী দেখেছে, 'শিক্‌রে'র শিকারও দেখেছে। ছত্রিদের মধ্যে বা সাধারণ গৃহস্থদের মধ্যে আজকাল 'শিক্‌রে' পোষার রেওয়াজ উঠে গিয়েছে বটে, কিন্তু মুসলমান ফকিরদের এক শ্রেণী এখনও 'শিক্‌রে' পোষে। পায়ে শিক্‌ল-বাঁধা 'শিক্‌রে' চামড়ার দস্তানা-পরা-হাতের উপর বসিয়ে নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায় তারা। সে আমলে ছত্রিদের প্রতি জনে 'শিক্‌রে' পুষত। শিকার, পাশা, দাবা, কুস্তি, শড়কী-তলোয়ার খেলে, তলোয়ারে-শড়কীতে শান দিয়ে যে সময় থাকত, সে সময়টা কম নয়, তখন তারা গোঁপে তা' দিত আর গল্প-গুজব করত। মধ্যে মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু কৃষিজীবীর সঙ্গে ঝগড়া বাধাত—গল্পের নেকড়ে যেমনভাবে ঝগড়া বাধিয়েছিল মেষশাবকের সঙ্গে—ঠিক তেমনভাবে। তার পর বাধত দাঙ্গা। চাষীদের ঘর চড়াও করে, পুরুষদের মেরে-কেটে সোনা, রূপা, টাকা, বাসন লুঠে নিয়ে আসত। তার সঙ্গে আনত তাদের যুবতী কিশোরী মেয়েদের। ধান, চাল, যব, গমের গোলা ভেঙ্গে লুঠ করে গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে আসত। ফসল উঠবার সময় আশে-পাশের গ্রামের মাঠ থেকে ফসল-কেটে-নেওয়ার রেওয়াজও ছিল। শুধু কৃষিজীবী নয়, আশে-পাশের জমিদারেরাও সন্ত্রস্ত থাকত ছত্রিদের ভয়ে নিয়ত। তাদের বাড়ীতে লুঠ-তরাজ করতে ছত্রিদের দ্বিধা ছিল না, ভয়ও ছিল না।

তাদের এই বৃত্তির আভাস আছে ওই দ্বিতীয় তামার পাতে। কাঞ্চনগো

লিখেছে—এখানা মহারাজ মানসিংহের দেওয়া সনন্দ নয়, এখানা দিয়েছিলেন মহারাজ তোডরমল। ছত্রি মুরুব্বিদের এও একটা আপত্তির কারণ। তারা চিরকাল জেনে এসেছে এখানা দিয়ে গেছেন মহাবীর মানসিংহ—অম্বর-স্তানের রাণা। মানসিংহের সনন্দে আর মহারাজ তোডরমলের সনন্দে!

কানুনগো সনদখানির একখানা ছবি ছেপে লিখেছে—এই সনন্দে মহারাজ তোডরমল লিখেছেন—"পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে গিরিব্রজের সিংহ-রায়েরা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে, সেই হেতু তাহাদের সম্পত্তি বাহাল রাখা হইল। অন্যথায় এই অঞ্চলে তাহারা দস্যুতার অত্যাচারে যে সমস্ত অপরাধ দীর্ঘকাল ধরিয়া পুরুষানুক্রমে করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে তাহাদের উপর শাস্তি-বিধান করাই উচিত। যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য তাহাদের পূর্ব্ব-দস্যুতার অপরাধ মার্জ্জনা করা হইল। এবং ভবিষ্যতে সদ্ভাবে জীবন-যাপনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় গিরিব্রজ মৌজার সমগ্র পতিত ভূমি হাসিলের জন্য বাদশাহ সরকার হইতে হাজার তঙ্কা সাহায্য দেওয়া হইল। স্থানীয় তহশীলদার এই পতিত হাসিলের নিয়মিত তদ্বির করিবেন। এবং সিংহ-রায়েরা স্থানীয় ফৌজদার ও বাঙলার সুবাদারের নিকট ভবিষ্যতে সদ্ভাবে থাকিবার জন্য দায়ী রহিল। সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া গিরিব্রজ মৌজার উপর নূতন কায়েম মৌরসী স্বত্ত্ব সিংহ-রায় ও সিংহদের মঞ্জুর করিয়া বার্ষিক কর পাঁচ তঙ্কার পরিবর্ত্তে পঞ্চাশ তঙ্কা ধার্য্য করা হইল।"

নরসিংয়ের মনে হয়, এটা নেহাতই অসম্ভব কথা। মনে মনে কল্পনাও করা যায় না। এও কি কখনও হয়?

এই চোখ-জুড়ানো মোলায়েম উর্ব্বর মাটির এই সুসমতল সুন্দর শোভন বিস্তীর্ণ চাষের মাঠ, এও কোন দিন জঙ্গলে-ভরা, ঘাসে-আগাছায় কদর্য পতিত হয়ে পড়েছিল! বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু কানুনগো বাবুটির উপর তার অনেক শ্রদ্ধা। ওই দুর্বোধ্য ফারসী লেখা সে দেখবামাত্র পড়েছে—সে

নিজে যেমন বাংলা চিঠি পড়ে, তেমনি সহজে পড়েছে। কাগজে ছাপার অক্ষরে ছেপেছে। তা ছাড়া ইদানীং নরসিং নানা ধরনের বইয়ের সঙ্গে দু'চারখানা ইতিহাসও পড়েছে। ইতিহাসের মত অদ্ভুত আর কিছু নাই। সে পড়েছে, যে ইংরেজ সায়েবরা আজকাল মোটর তৈরী করেছে, এরোপ্লেন তৈরী করেছে, কলে যারা সূচ তৈরী করে, তারা নাকি পাঁচশো-সাতশো বৎসর আগে জানোয়ারের ছাল পরে বেড়াত, কাঁচা মাংস আগুনে ঝলসে নিয়ে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতো। এত দূরে যেতে হবে কেন, সে চোখে দেখেছে—বামরু মাঝি—সাঁওতালের ছেলে, পাদ্রীদের ইস্কুলে পড়ে কোট-পেণ্টালুন পরে হাকিম হয়েছে। এও হয় তো তেমনি একটা তাজ্জব ব্যাপার।

নরসিং কল্পনা করতে চেষ্টা করে। গিরবরজার চারি পাশের মাঠ গঙ্গার ধারের জমির মত জঙ্গলে ভরা, ছোট-বড় গাছের তলায় কাঁটা-ঝোপ—অন্তহীন জট-পাকানো দড়ির জালের মত লতার জাল মাটিতে, মাটি দেখা যায় না—শুধু ঝরা পাতার রাশি—গ্রীষ্মকালে পা দিলে খর্-খর্ করে, বর্ষায় পা দিলে জ্যাব্-জ্যাব্ করে—তলা থেকে কষের মত জল ওঠে; ভন্-ভন্ করে মাছি-মশা। সেই সমস্ত কেটে ফেলতে দলে-দলে লোক লেগেছে। ঠক্-ঠাক্, ঠক্-ঠক্ শব্দ উঠছে, মড়্-মড়্ শব্দ করে মাটির উপর আছড়ে পড়ছে বড়-বড় গাছ। তার পর মাটি কেটে সমান করে চারি পাশে আলের বাঁধন দিয়ে তৈরী হচ্ছে জমি। ওই বাগ্দী, বাউড়ী, ডোম, হাড়ি, মুচি এদের পুরুষেরা মাটি কাটছে ঝপা-ঝপ্ —সেই মাটি ঝুড়িতে তুলে ওদের মেয়েরা গান গাইতে গাইতে ফেলে আসছে আলের দড়ির দাগে-দাগে।

দেখতে দেখতে সুসমতল বিস্তীর্ণ গিরবরজার সোনা-ফলানো মাঠ গড়ে উঠল। বড়-বড় বয়েল জুড়ে হাল নিয়ে এল সিংহদের কৃষাণেরা—ওই সব বাগ্দী-বাউড়ীদের দল। দেখতে দেখতে সবুজ ফসলের মাঠ ভরে উঠল। অগ্রহায়ণ আসতেই সে সবুজ ফসল হল সোনার ফসল। রাশি-রাশি ধান,

ভারে-ভারে কলাই, ছালায়-ছালায় গম, বোঝা-বোঝা যব, শলি-শলি সরষে, হাঁড়ি-হাঁড়ি গুড় এসে উঠল ছত্রিদের খামারে-খামারে।

গিরবরজার ছত্রিরা লক্ষ্মী পেতে প্রণাম করলে; বললে—মা গো, আলা হয়ে ঘরে বাস কর, অধর্ম্মের হাত থেকে রক্ষা কর; অধর্ম্ম করলে জানি তুমি থাকবে না। ধর্ম্মে মতি দাও!

শিকারের ঝোঁক কমে এল ছত্রিদের। তাদের সে সময়ই বা কোথায়? ভোরে উঠে বলদগুলি খেতে পেয়েছে কি না, খেয়ে পেট ভরল কি না দেখতে হয়। মাঠে গিয়ে আলের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বর্ষার সময় দেখতে হয় রোয়ার কাজ, ভাদ্র-আশ্বিনে নিড়েন, আশ্বিনে-কার্ত্তিকে দেখতে হয় জমির জল, অগ্রহায়ণ থেকে শুরু হয় এক দিকে ধান কাটার কাজ, অন্য দিকে রবি-ফসলের চাষের কাজ। শিকার করবার সময় কোথায়?

'শিক্‌রে' পাখীগুলোর কতক মরে গেল, কারও কারও পাখী উড়ে গেল অবহেলায়। ছ'পাঁচ জনের অবশিষ্ট রইল—সেগুলো টিকটিকি-গিরগিটী ধরে খেত; সুযোগ পেলে লোকের ঘরের পায়রার বাচ্চা অথবা গৃহ-পালিত হাঁস মারত। গুল্‌তি-মারা ধনুকগুলো হনুমান-বাঁদর তাড়াবার কাজে লাগল। শড়কী-তলোয়ারগুলি যত্ন করে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা হত। পর্ব্বে-পার্ব্বণে বের করে কোমরে বাঁধত ছত্রিরা।

জোয়ান ছেলেদের পাঠানো হত মুরশিদাবাদ নবাব দরবারে, ফৌজি-কাজের জন্য। অনেকের ছিল বারমেসে কাজ, অনেকে বাড়ীতেই থাকত, ডাক পড়লে যেতে হত। অনেকে বাড়িতেই চাষ-বাষ নিয়ে থাকত।

এই সময়ে গিরবরজা গ্রামের উন্নতি হয়েছিল চরম। যে পুরানো শিব-মন্দিরগুলো এখনও ভাঙা-ভগ্ন অবস্থায় দেখা যায়—সেগুলি তৈরী হয়েছিল সেই সময়।

সিংহ-রায়েরা প্রথম শিব-প্রতিষ্ঠা করে। তাদের দেখাদেখি একে-একে প্রায় সকল অবস্থাপন্ন ঘরের প্রত্যেকেই এক-এক শিব-প্রতিষ্ঠা করলে। ছোট-বড়

মন্দির, যার যেমন অবস্থা। শিব-চতুর্দ্দশীতে উৎসবের প্রতিযোগিতা চলতে আরম্ভ হল। সে সব গল্প আজও প্রবীণ ছত্রিদের মুখের ডগায় লেগে আছে।

সিংহ-রায় বাড়ীতে এসেছিল মুরশিদাবাদ থেকে নাম-করা বাইজী—মা ও মেয়ে। তরুণী মেয়ে চটুল হাল্কা পায়ে নাচছিল দ্রুততম গতিতে—তার যেন নেশা লেগেছিল নাচের। তবল্‌চির হাত তরুণীর পায়ের সঙ্গে সমান তাল রেখে চলতে পারছিল না। হেসে প্রৌঢ়া মা টেনে নিলে তবলা-বাঁয়া। নাচের সঙ্গে সঙ্গত চলছিল। হঠাৎ এক সময় মৃদু হেসে সিংহ-রায়দের কর্ত্তা তারিফ দিয়ে উঠল, বা-বাইজী-বাঃ! অমনি প্রৌঢ়া বাইজী মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে গেল। ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারেনি; পরে প্রকাশ পেলে। বাইজীর হাতেও তাল কেটেছিল। সমজদার সিংহ-রায় ছাড়া সেটুকু কারও বোধগম্য হয় নাই। বাইজী দম্ভভরে হেসে টেনে নিয়েছিল তবলা, তাই অতি সূক্ষ্ম চুকের জন্য মৃদু হেসে ব্যঙ্গভরে বাহবা দিলে সিংহ-রায়। সেই অপমানের ক্ষোভে বাইজী মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছিল।

খাওয়া-দাওয়ার প্রতিযোগিতায় সেও হ'ত সমারোহের ব্যাপার। এক বাড়িতে চারটে করে মিঠাই দিয়ে এক বার অন্য সকল বাড়ীর অমর্য্যাদা করেছিল। নিয়ম ছিল জোড়া মিঠাইয়ের। এক বাড়ী যখন সে নিয়ম ভাঙ্গলে, তখন অন্য বাড়ী রাগে ফুলে উঠল। পরের বার দেখা গেল আটটা, বারোটা, ষোলটা মিঠাই পাতে পড়তে আরম্ভ হ'ল। তার পরের বার সিংহ-রায়েরা সংখ্যা করলে, যে যত খেতে পারে। তার পর'বারে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হল আটটা, আর ছেলেদের চারটে, কিন্তু সে মিঠাই এল মুরশিদাবাদ থেকে। তার পর এল কাঁদীর মনোহরা।

তার পর শোভা এবং সজ্জার প্রতিযোগিতা। এক জন পঞ্চাশ মশাল জ্বাললে অন্য জনে জ্বালত একশো মশাল। সে কালে নিয়ম ছিল, এক বাড়ীর কর্ত্তা যেত অন্য বাড়ীতে তত্ত্ব করতে। যাবার সময় সঙ্গে থাকত মশালচী

পাইক। এ কর্ত্তা যদি দু'জন পাইক, এক জন মশালচী নিয়ে যেতেন, তবে অন্য কর্ত্তা যেতেন দুই মশালচী চার পাইক সঙ্গে।

নরসিং চলেছিল সেই সব পুরানো কথা ভাবতে ভাবতে। মুরশিদাবাদ এলাকার নরম উর্ব্বর মাটির মাঠ। মাঠের মধ্য দিয়ে কাঁচা রাস্তা; গরুর গাড়ী চলে, গরু চলে, মধ্যে মধ্যে দু'একখানা ডুলি জেনানা-সওয়ারী নিয়ে, কখনও কখনও একটা-দুটো ঘোড়া। বড় ভাল-জাতের ঘোড়া নয়; ছ্যাকরা-গাড়ীর ঘোড়ার জাতের দেশী ঘোড়া, পিঠে তামাক-মসলা-বোঝাই নিয়ে চলে—পিছনে চলে হিন্দুস্থানী ব্যবসাদার, গরুর মত পাচন-লাঠি পিটে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। কচিৎ কোন লাজ-লজ্জাহীন ছাত্র বা মুসলমান চাষী এমনি জাতের ঘোড়ার পিঠেই চেপে পা দুটো গুটিয়ে মাটি থেকে বাঁচিয়ে চলে। ঘোড়ার পায়ের ছিটানো ধুলোয় দাড়ী-গোঁফ-চুল ধূসর হয়ে যায়। মাঠের রাখালেরা দেখে হি-হি করে হাসে। সেই এক-হাঁটু নরম ধুলো-ভরা মাঠের রাস্তার উপর দিয়ে মন্থর গমনে চলেছে নরসিংয়ের মোটরখানি। গাড়ীখানার আপাদমস্তক ধুলোয় ভরে গিয়েছে। নরসিং, নিতাই, রামের সর্ব্বাঙ্গ ধুলোয় ধূসর। নরসিংয়ের গোঁফের গায় ধুলো লেগেছে—ঠিক কদম ফুলের কেশরের ডগায় রেণুর মত।

রামের অত্যন্ত হাসি আসছে—দাদাবাবুর গোঁফের এই কদম ফুল ঢং দেখে। কিন্তু ভয়ে সে হাসতে পারছে না। নিতাই মুখ ফিরিয়ে বসে আছে।

নরসিং সামনে দৃষ্টি স্থির রেখে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধুলোর ভেতর কোথায় আছে গর্ত্ত, তার ঠিক কি? তার উপর চলন্ত সাপের মত আঁকা-বাঁকা পথ। রাম অথবা নিতাইয়ের দিকে তার দৃষ্টিও নাই, মানসিক সচেতনতাও নাই। সিংহ-রায় বংশের ছেলে সে, আজ মোটর-ট্যাক্সি চালায়। ক্ষণিকের জন্য আক্ষেপ জেগে ওঠে। পর ক্ষণেই হাসে। দিল্লীর বাদশাদের বংশধররা রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত হয়েছিল, তারা সেখানে নাকি জুতোর দোকান করত। আজ রাজা, কাল ফকির। কালের গতিকই এই।

—সিংজী! নিতাই ডাকলে।

—হুঁ

—রেডিয়েটারের জলটা পাল্‌টালে হত। বেজায় তেতে উঠেছে।

খেয়াল হল নরসিংয়ের, রেডিয়েটারের জলে সোঁ-সোঁ ডাক ধরেছে,মুখ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে অল্প-অল্প। গাড়ী রুখলে নরসিং। নিতাই গিয়ে ঢাকনীটাতে হাত দিয়েই তুলে নিয়ে বললে—বাপ্ রে! নরসিং পায়ের কাছ থেকে খানিকটা ময়লা ন্যাকড়া তুলে ছুঁড়ে দিল। নিতাই সেইটা দিয়ে ধরে ঢাকনী খুলে ফেলতেই গরম জল টগ্-বগ্ করে ফুটে যেন উথলে উঠল—ধোঁয়া বার হল অনেকটা।

রাম একটা পেট্রোলের খালি টিন বার করে বললে, এ-হে! নদীতে জল নিস্ নাই নিতাই?

নিতাই জিভ কেটে বললে, এই যা!

নরসিং বললে, যা চলে—ওই দেখ্—মাঠে পুকুর।

পুকুরের ভাবনা এ এলাকায় নাই। ছত্রিরা পুকুরও কাটিয়ে গিয়েছে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। গিরবরজার চার দিকে এক ক্রোশের মধ্যে পুকুরের ভাবনা নাই। এক ঝুড়ি মাটি, পাঁচ গণ্ডা কড়ি।

তিন

বিস্তীর্ণ মাঠ চারি পাশে। গিরবরজার সীমানা সাধারণ মৌজার অপেক্ষা অনেক বিস্তীর্ণ। পুকুরও অনেক। জলের ভাবনা এখানে? নিতাই কখনও আসে নাই, জানে না, তাই জলের জন্যে চিন্তিত হয়েছে সে। নরসিং হাসলে। গিরবরজার সীমানা ছত্রিরা লাঠির জোরে বাড়িয়েছে। সে বিস্তীর্ণ এলাকা জলে-ফলে-ফসলে ভরে তুলেছে। সে আমলে যখন সিংহ-রায়েদের নেতৃত্বে গিরবরজার ছত্রিরা লুঠ-তরাজ চালাত অবাধে, পাশের গ্রামগুলির শস্যক্ষেত্র থেকে পাকা

ফসল কেটে নিয়ে আসত, তখন গিরবরজার চারি পাশ থেকে মানুষের সঙ্গে গ্রামগুলিও সরে পালিয়েছিল। ছত্রিদের অত্যাচারে গড়া-গ্রাম ভেঙ্গে কৃষিজীবী অধিবাসীরা যথাসম্ভব দূরে সরে বসবাস করেছিল। পতিত গ্রামগুলির কৃষিক্ষেত্রও পতিত হয়ে আগাছার জঙ্গলে ভরে উঠে গিরবরজার পতিত সীমা-পরিধি বাড়িয়ে তুলেছিল। সে সীমানার দখল কোন দিন আর ছত্রিরা ছাড়ে নাই। মহারাজ তোডরমলের সনদ এবং শাসনের পর যখন গিরবরজার সীমানাভোর জমি তৈরী হল, তখন এই সব পতিত জমি আবার হাসিল হল। গিরবরজার সীমানা চারি দিকে এক ক্রোশেরও বেশী। মাঠের মধ্যে যে সব গাছ-পালায়-ঢাকা ছোট-ছোট গ্রামের মত দেখা যায়, ওগুলি গ্রাম নয়, ও সব পুকুর, দীঘি।

শিব-দেবতার অর্চ্চনা নিয়ে খাওয়ান-দাওয়ান, সাজ-সজ্জা-সমারোহের পাল্লা যখন চলছিল, তখনই সিংহ-রায়দের এক তরফ কাটালে এক দীঘি। নাম হল শিবসায়র। দীঘি কাটিয়ে এক হাজার আট ভার গঙ্গাজল আনিয়ে ঢাললে দীঘির মধ্যে। তখন বর্ষা নেমেছে দেশে। সেই গঙ্গাজলের উপর জমল বৃষ্টির জল, দীঘি ভরে উঠল। দীঘির পাড়ে লাগানো হল আম-কাঁঠালের চারা। মুরশিদাবাদের গঙ্গার ঘাট থেকে কয়েক ভার মাছের পোনা আনিয়ে ছেড়ে সে দিন কর্ত্তা যখন বাড়ি এলেন, তখন গিন্নী নাতিকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন।

"আয় আয় আয়, আয় চাঁদ আ-রে—
সোনার কপালে আমার টিপ দিয়ে যারে;
গাই বিয়োলে দুধ দেব,
সোনার থালায় ভাত দেব,
রুই মাছের মুড়ো দেব,
মনের সুখে খাবি;
আম-কাঁঠালের বাগান দেব,
ছাওয়ায়-ছাওয়ায় যাবি।"

কর্ত্তা শুনে হেসে বললে, চাঁদ এত দিন আসে নাই, এই বার আসবে।

গিন্নী কথাটা বুঝতে পারলে না—নাতির কপালে হাতের তালু দিয়ে আঘাত করতে করতেই ভ্রূ কুঁচকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল কর্ত্তার মুখের দিকে।

কর্ত্তা বললে, গোয়ালে গাই ছিল, বাড়ীতে সোনার থালা না থাক্‌, রূপোর থালা আছে। কিন্তু পুকুর ছিল না, মাছও ছিল না, আম-কাঁঠালের বাগানও ছিল না। তাই চাঁদা-বেটা আসত না। এ বার শিবসায়রের পাড়ে আম-কাঁঠালের চারা লাগিয়েছি, পুকুরে মাছও ছেড়েছি। এ বার বেটা ঠিক আসবে লোভে-লোভে।

সমস্ত গ্রামে রটে গেল কথাটা। অন্য ছত্রি-কর্ত্তারা মুখ বেঁকিয়ে হাসলে। গিন্নিরা বললে—ও মা! তাই তো বলি সিংহ-রায় বাড়ীর নয়া-ববুয়ার নাকের সর্দ্দি শুকোয় না কেন? আসলি চাঁদ এসে কপালে বসেছে কি না! চাঁদের ঠাণ্ডি—বহুৎ ঠাণ্ডি!

ওটা উপেক্ষা করলেও—ওই শিবসায়রের জলে শিবের স্নানের ব্যবস্থার কল্পনাটার জন্য ছত্রিরা তারিফ করলে। এ কাজটা ভাল করেছে সিংহ-রায় কর্ত্তা। দেবতার সরোবর না হলে চলবে কেন? এর পর বর্ষার শেষে—যখন পুকুরের পাড়ের চারাগুলি বেশ সতেজ-নরম পল্লব মেললে এবং পুকুরের জলে যখন ঝাঁক বেঁধে পোনাগুলি বেড়াতে লাগল, তখন তারা বললে—হাঁ, সিংহ-রায় কর্ত্তার বুদ্ধি বটে! সিংহ-রায় কর্ত্তা চার পাড়ে চার ঘাট তৈরী করলে। এক ঘাট হল ছত্রি বাড়ীর মেয়েদের জন্য। এক ঘাট ছত্রি-পুরুষদের জন্য। এক ঘাট অন্য-পুরুষের জন্য—অন্য ঘাটে নামবে গ্রামের অন্য মেয়েরা। ছত্রি-মেয়েদের ঘাট বাঁশের 'খলপার' ঘের দিয়ে বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করলে সিংহ-রায় কর্ত্তা। চারি দিকে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল।

কয়েক দিনের পর—শোনা যায় পনের দিন না যেতেই কিন্তু ওই ঘিরে-দেওয়া ঘাটের মধ্যে কয়েক ফোঁটা জলের ছিটকানির স্পর্শে একটা অঘটন ঘটে গেল। 'ছিটে জল আর মিছে কথা' নাকি অসহ্য ব্যাপার। আবার সেই ছিটে

জল যদি অশুচি অবস্থায় কেউ ছিটিয়ে দেয়—তবে রক্ষা থাকে না। তাই হয়েছিল। মালিক সিংহ-রায়-বাড়ীর ঝিউড়ী মেয়ে হৈ-হৈ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে জলের ছিটে লাগল অন্য সিংহ-রায়-বাড়ীর গিন্নীর গায়ে, গিন্নী তখন স্নান করে উঠেছেন। গিন্নী পূর্ণ-কলসীর জল ফেলে দিয়ে গা না মুছেই গম্ভীর মুখে বাড়ী ফিরে গিয়ে ছত্রি বাড়ীর চিরাচরিত প্রথায় কূয়ার জল তুলে পুনরায় স্নান করলেন। কয়েক দিন পরেই সে বাড়ীর পুকুরের পত্তন শুরু হল। মাস-খানেকের মধ্যে আর এক বাড়ীও দীঘি কাটাতে আরম্ভ করলে।

এই দীঘিই বিখ্যাত দীঘি। দীঘির মালিক নাম দিতে চেয়েছিল শম্ভু সায়র, কিন্তু আপনা থেকেই দীঘির নাম হয়ে গেল 'দাঙ্গা দীঘি'। দীঘি কাটাতে গিয়েই আরম্ভ হয়ে গেল ছত্রিদের মধ্যে গৃহ-বিবাদ। দীঘির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপ করে চারি দিকে খুঁটো পুঁততেই, সিংহ-বংশীয়দের এক তরফ এসে এক দিকের খুঁটো তুলে দিলে। দাবী করলে—এর মধ্যে দশ কাঠা জমি সিংহদের। এবং সিংহদের অংশীদার হিসেবে ওটুকু তার ভাগে পড়েছে।

সিংহ-রায়ের এ তরফ জমির মূল্য দিতে চাইলে। দাবীদার সিংহ বললে, বড়লোক সে নয়, কিন্তু মূল্য নিয়ে জমি বিক্রী করবার মত লক্ষ্মীছাড়াও সে নয়।

সিংহ-রায় তাকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করলে—তুমি বিবেচনা করে দেখ। ও দশ কাঠা নইলে পুকুরটার এ কোণটা সমান হয় না; চার কোণের বদলে পাঁচ কোণ হয়।

—সে দেখবার কথা আমার নয়। চার কোণ করতে চাও তো দীঘির আয়তন খাটাও।

—ভাল, জমি বিক্রি না কর, বদল কর। অন্য জায়গায় ভাল জমি দেব তোমাকে।

—ওর চেয়ে ভাল জমি আমার কাছে এ চাকলায় আর নাই। ওই আমার সোনা।

সে দিন স্থগিত রইল পুকুর-কাটার কাজ। মীমাংসার জন্য সন্ধ্যায় মজলিস

ডাকবার কথা হ'ল। মজলিসে দেখা গেল, পুকুর যারা কাটিয়েছে সেই ডু-তরফ সিংহ-রায়েরা জমির দাবীদার সিংহের পক্ষ অবলম্বন করছে। তৃতীয় সিংহ-রায় তাদের দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

তার পর দাঙ্গা। দু'জন বাগ্দী লাঠিয়াল খুন হ'ল, সিংহ-রায়ের ছেলের ডান হাতখানা ভেঙে ঝুলতে লাগল। সেই হাত নিয়ে ছ'মাস ভুগে সে ছেলে মারা গেল।

দেশের অবস্থা তখন অরাজক অবস্থা। ক্রোশ-কতক দূরে বছর-কয়েক আগে পলাশীর আমবাগানে তখন নবাব সিরাজউদ্দৌলা হেরে গিয়েছেন ইংরেজ-কোম্পানীর কাছে। তার পর জাফর খাঁ নবাব হলেন। তার পর নবাব হলেন কাসিম আলি খাঁ। তাঁর সঙ্গে ফের ইংরেজ-কোম্পানীর লড়াই লাগল। কাসিম আলি খাঁ গেলেন। দেশে ফৌজদার আছে, খায়, দায়, ঘুমোয়, যে ভাল নজর দিয়ে নালিশ করে তার নালিশের আর্জি দাখিল হয়, আবার বিবাদী যদি তার চেয়ে ভাল নজর দেয় তবে সে নালিশ তৎক্ষণাৎ খারিজ হয়ে যায়। যারা অবস্থায় দুর্ব্বল, তারা নালিশ জানাতে লাগল ভগবানের কাছে; যারা সবল, তাদের দাবীর মীমাংসা হতে লাগল কাজীর কলমের বদলে লাঠিয়ালের লাঠি-সড়কীর আগায়। ঠিক এমনি সময়ে সিংহরায়ের গৃহ-বিবাদ বাধল। যেন ঠিক ঋতুটিতে ঠিক ফসলের বীজ বোনা হ'ল; রাজপুত-রক্ত ক্ষেপে উঠল। সিংহ-রায়ের বিপক্ষে দাবীদার সিংহ অবস্থায় দুর্ব্বল হ'লেও সাহসে এবং দেহের শক্তিতে দুর্ব্বল ছিল না। দাঙ্গায় হেরে সে একদিন রাত্রে অশান্ত মনে অন্ধকার উঠানে ঘুরছিল। হঠাৎ ইচ্ছা হ'ল গাঁজা খাবার। চক্‌মকি ঠুকে আগুন জ্বালতে গিয়ে আগুনের ফুলকি গিয়ে পড়ল উঠানে বিছানো খড়ের উপর। খড় দপ করে জ্বলে উঠল। তাড়াতাড়ি সে খড়ের আগুন নিভিয়ে দিল বটে, কিন্তু তার লক্‌লকে শিখায় জ্বলে উঠার যে ছবি তার গাঁজার-নেশায়-আচ্ছন্ন মাথার মধ্যে জ্বলতে লাগল, সে আর নিভল না। কয়েক দিন পরেই আগুন গিয়ে লাগল সিংহ-রায়ের বাড়ীর এক কোণে। ক্ষ্যাপা লাল ঘোড়ার মত [illegible] সে আগুন,

বড়-বড় নালা লাফ দিয়ে পার হয়ে যায় যেমন লড়াইয়ের ঘোড়া—তেমনিভাবে এ ঘরের চাল থেকে ও-ঘরের চালে লাফিয়ে পড়তে লাগল। সিংহ-রায়ের বাড়ী-ঘর অর্দ্ধেকের উপর পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সিংহ-রায় বুঝলে এবং সজাগ হ'ল। সিংহের মাথার আগুনও সমান তেজে জলতে লাগল। অনেক ভেবে সিংহ তৈরী করলে তীর। লম্বা লোহার ফলার নিচে একটা গোল লোহার চাকতি লাগিয়ে তাতে আঠা দিয়ে সযত্নে লাগালে তামাক খাবার গোল টিকে। গভীর রাত্রে সেই টিকেতে আগুন লাগিয়ে মজবুদ সাঁওতালী ধনুকে জুড়ে দূর থেকে সিংহ-রায়ের বড় ঘরের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়লে সেই তীর। কিছুক্ষণ পর সিংহ-রায়ের বড় ঘরের মাথা জলে উঠল।

সিংহ-রায়ের বাড়ী পুড়েই কিন্তু আগুন নিভল না। গোটা গ্রাম পুড়ে গেল। সিংহের মাথার আগুন ধীরে ধীরে অনেক ছত্রির মাথায় জলে উঠল। গিরবরজার আগুনের খ্যাতি রটে গেল চার পাশে। মধ্যরাত্রে আপন-আপন গ্রামের প্রান্তে দাঁড়িয়ে লোকে আকাশ-আলো-করা রোশনাই দেখত।

যে সব দীঘি এই ছত্রিরা কাটিয়েছিল, তারই জল তুলে ঢেলে ঢেলে ছত্রিরা ক্লান্ত হয়ে গেল, কিন্তু তাদের আগুন কিছুতে নিভল না। গিরবরজা পুড়ে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল। আগুনের আঁচে লক্ষ্মী-ঠাকরুণ ঝলসে গেলেন; তিনি নাকি কাঁদতে কাঁদতে গ্রাম থেকে চলে গিয়েছিলেন একদিন। তিনি নাকি গিরবরজা থেকে গিয়ে উঠেছিলেন পঞ্চমতির কায়স্থ-বাড়িতে। সে নাকি অদ্ভুত কাহিনী —সকলেই জানে, পাঁচজন প্রবীণে সেই কথা আজও হয়। কিন্তু নরসিংয়ের 'দিদিয়া' ঠাকুমার মত সুন্দর করে সে কথা কেউ বলতে পারে না।

যে দিন নরসিং প্রথম এই গল্প শোনে, সে দিনের কথা আজও মনে আছে। চৈত্র মাসের সন্ধ্যাকাল। হঠাৎ পশ্চিম পাড়ায় এক সিংহ-বাড়ীতে আগুন জলে উঠল। চৈত্র মাসেই সে-বার ধূ-ধূ খরা উঠেছিল। নরসিং এবং তার ভাইবোনেরা বসে ছিল বাড়ীর সামনে রাস্তার ধারে শিরীষ গাছের তলায়। দুটো-চারটে শিরীষ ফুল ফুটতে তখন আরম্ভ হয়েছে। চামরের মত কেশরওয়ালা একটি

শিরীষ ফুল কখন খসে পড়বে, তারই প্রত্যাশায় তারা বসে ছিল। হঠাৎ শব্দ উঠল— আগুন, আগুন! সমস্ত গ্রাম কেঁপে উঠল। জোয়ান মরদেরা উঠল আপন-আপন ঘরের চালে। হাতে ভিজানো-খড়ের আঁটি, কলসী-ভরা জল। নিচে উঠানে কলসী-ভর্ত্তি জল রেখে ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে রইল। আকাশে উঠতে লাগল জলন্ত খড়ের ঝুটি। গ্রামটা ভরে গেল পোড়া খড়ের কালো ছাইয়ে। শিরীষ ফুলের গন্ধ যেন কোথায় উড়ে গেল। দেখতে দেখতে আগুন এসে লাগল নরসিংদের গোয়ালে। জলন্ত খড়ের ঝুটি সাবধানতা সত্ত্বেও সতর্ক চোখ এড়িয়ে কখন এসে পড়েছিল গোয়ালের চালে। চাল জ্বলে উঠল। ভাগ্য ভাল যে, বসত-বাড়ী আর গোয়াল-ঘরের মাঝখানে ছিল ঐ শিরীষ গাছটা।

আগুন নিভল। আগুন নিভিয়ে স্নান করে এসে পুরুষেরা বসল তামাক খেতে। মেয়েরা উঠান পরিষ্কার করে জটলা পাকিয়ে বসল। গিরবরজায় আগুন লাগলে আগুনের আঁচ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই থাকে মানুষের উত্তেজনা। আগুন নিভলে আর কিছু নাই। ম্যালেরিয়ার জ্বরের মত; জ্বর ছাড়লেই রোগীও উঠে বসল। সেই দিন কথায়-কথায় মেয়েমহলে উঠে পড়েছিল সেকালের কথা।

দিদিয়া বলেছিল—'মানুষের দশ দশা, কখনও হাতী কখনও মশা'—কখনও অবস্থা ভাল থাকে, কখনও মন্দ হয়। যখন মন্দ হয়, তখন হীরা বেচতে হয় জিরার দামে, সোনা যায় সীসার কদরে; মতির হার পুঁতির মালার মত বিকিয়ে যায়। তাতে মা-লক্ষ্মীর আসন টলে অবশ্য, কিন্তু তবুও যেতে মায়ের মন চায় না। তিনি তাকিয়ে থাকেন—মানুষের মনে আচার-বিচারের ঝিনুকের খোলার ভিতর আছে যে অমূল্য 'মতি', যা চোখে দেখা যায় না, অথচ যার আলোতে চোখ ঝলসে যায়, যা হাতে ছোঁয়া যায় না, অথচ যা মানুষের বুক ভরাট করে রাখে, সাপের মাথার মণির মত মানুষের বুকের সেই মতিকে ছুঁয়ে বসে থাকেন। সেই 'মতি' যখন মানুষের পাপের আগুনে গলে যায়, পুড়ে যায়— মতিচ্ছন্ন যখন হয় মানুষের—তখনই মা-লক্ষ্মী কাঁদতে কাঁদতে চলে যান।

গিরবরজার ছত্রিদের সেই মতিচ্ছন্ন হ'ল। মা-লক্ষ্মী থাকতে পারেন আর! তিনি চলে গেলেন। চৈত্র মাস, শুক্ল পক্ষ, ত্রয়োদশী তিথি; চাঁদনীর রাত ফুট্‌ফুট্ করছে; খামারে গম যব সরষের আঁটি থরে-থরে সাজানো, গোলায় ধান মড়্-মড়্ করছে, চালে নতুন খড় ঝল্-মল্ করছে। ফুটেছে তিল ফুল মাঠে; উঠানে ফুটেছে টগর বেলা, পথের ধারে ফুটেছে শিরীষ; বাগানে আমের গাছ ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে; গিরবরজায় মা-লক্ষ্মী মনের আনন্দে স্বপ্ন দেখছেন। হঠাৎ তিনি কেঁপে উঠলেন। এ কি হ'ল! কিসের এ আঁচ? কিসের কালিতে সব কালো হয়ে গেল? কই, সে মতির আলো কই? নিজেদের ঘরে নিজেরাই আগুন লাগিয়েছে ছত্রিরা; আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ করে হাজার জিভ মেলে, ক্ষ্যাপা লাল ঘোড়ার দঙ্গল ছুটছে, ঘাড়ে নাচছে কালো শিখার লম্বা কেশর। সয়তান তার সওয়ার। লাল হয়ে গেল আকাশ, কালো হয়ে গেল মাটি, লাল ঘোড়ার ক্ষুরের দাপটে ধুলোর মত উড়ল ধোঁয়া আর ছাই। মা-লক্ষ্মী কাঁদলেন—দিশেহারা হয়ে গেলেন; চারি দিকে আলোয় আলোময়, কিন্তু তাঁর চোখে সব অন্ধকার ঠেকল। ছত্রিদের বুকের মতি নিজেদের বুকের আগুনের আঁচে ফেটে চৌচির হয়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সেই ছাই উড়ে উড়ে তাঁর দমও যেন বন্ধ হয়ে এল, ছত্রিদের বুকের আগুনের আঁচে যেন তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ঝল্‌সে গেল। তিনি তখন চোখের জলে ভেসে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। পথে পথে ছুটে এসে দাঁড়ালেন বারেকের জন্য নদীর ঘাটে। পাঁচমতীর কায়স্থ-বাড়ীর গিন্নী ছিলেন সেখানে। চৈত্র-পূর্ণিমার লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর আটনে আল্পনা দেবেন, তারই জল নিতে এসেছিলেন নদীর ঘাটে। তিনি বললেন, আহা—মা গো! এই রাত্রে একা তুমি কোথায় যাবে? মা বললেন, আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছে। গিন্নী বললেন, ব'স মা, আমি তোমায় আঁচল দিয়ে বাতাস করি। আঁচল দিয়ে বাতাস দিলেন, যত্ন করে সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়ে দিলেন। মা বললেন, আমার কাছে কিছু চাই তো বল। গিন্নী বললেন, কি চাইব মা? দেবতাকে পেন্নাম করি, অতিথিকে সেবা করি, তেষ্টা পেলে জল দি,

খোকা-তাপাকে মিষ্টি কথা বলি, এ কি কেউ কিছু দেবে ব'লে? মা দেখলেন, গিন্নীর বুকের ভেতর আচার-বিচারের খোলা দু'টি খুলে গিয়েছে—তার মধ্যে টল্-মল্ করছে সেই 'মতি'; যে মতি রাজা হ'লেই পায় না, দেবতারা যার সন্ধানে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান—সেই মতি। তিনি গিন্নীর পিছনে পিছনে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে তাঁদের বাড়িতে ঢুকলেন। এ দিকে সে রাত্রে গির্‌বরজায় সে কি আগুন! সে যেন খাণ্ডব-দাহন হয়ে গেল। ঘরের খড় পুড়ল, দরজা-জানালা পুড়ে গেল। সোনা গলে ছাইয়ের মধ্যে হারিয়ে গেল, থালা-কাঁসা গলে গেল, বহু জনের ছেলে পুড়ল, মেয়ে পুড়ল, কাঁচা তালগাছ জ্বলে গেল দাউ দাউ করে। সকাল-বেলায় দেখা গেল, মাঠের তিল ফুলের বেগুনে রঙ কালো হয়ে গিয়েছে।

আকাশের দিকে চেয়ে নরসিংহ কাঁদছিল। তার কান্না কেউ লক্ষ্য করে নাই। দিদিয়া চুপ করলে। কিছুক্ষণ পর আবার বললে—যা থাকল অবশিষ্ট সোনা রূপো—এর পর থেকেই একে একে গিয়ে ঢুকল ওই কায়স্থদের বাড়ী। তার পর যজ্ঞি শেষ হ'ল, কোম্পানীর মালগুজারী দিলে না ছত্রিরা আপনাদের মধ্যে ঝগড়া করে। পঞ্চাশ টাকা! মাত্র পঞ্চাশটা টাকা! বাস্। সূর্য্যনারায়ণ ডুবলেন আর কোম্পানীর লোক ঘড়ি পিট্‌লে—এক দুই তিন। ছুটে গেল গির্‌বরজার জমিদারী স্বত্ব। সেও কিনলে ওই পাঁচমতীর কায়স্থরা।

দিদিয়া আবার চুপ করলে। কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললে—ও মতি গেলে আর ফেরে না। সোনা-রূপা যায়, আবার আসে, হীরা বেচে আবার কেনা যায়। কিন্তু মনের যে মতি, সে গেলে আর ফেরে না। বোধ হয় পুরুষ-বরাবরই আর ফেরে না। আজও তো ফিরল না। আজও সেই আগুন দেয় ছত্রিরা আপনাদের ঘরে! হায় রে হায়!

হায় রে হায়ই বটে। দিদিয়া ঠিকই বলেছিল।

বর্ক-আন্দাজ গিরিধারী সিংহ-রায়ের বংশ—তার জ্ঞাতি-বন্ধুর বংশধরেরা

মতিচ্ছন্ন হয়ে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে বরকন্দাজী বৃত্তি নিলে শেষে। পাইকের কাজ, চাপরাসীর কাজ, দারোয়ানের কাজ। কাজটা প্রথম অবশ্য দেশোয়ালীর ঘরে তারা নেয় নাই, নিয়েছিল, ওই রামনগরের সায়েব-কোম্পানীর রেশম-কুঠিতে। তার পর ক্রমে দেশোয়াল জমিদার ধনীর বাড়ীতে। লক্ষ্মী গেল, বৃত্তিহীন হ'ল, তবু চৈতন্য হ'ল না; মাথায় পাগড়ী বেঁধে গোঁপে তা দিয়ে পায়ে নাগরা প'রে লাঠি নিয়ে ডাক-হাঁক করে বেড়াত, আর বুক চাপড়ে বলত, "শির লেনে সেকতা—দেনে ভি সেকতা—হাম লোক ছত্রি হ্যায়।" অহঙ্কার করতে এতটুকু বাধত না। আবার নানা জাতের অন্য পাইক-বরকন্দাজদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলা-মেশা করতেও এতটুকু ঠেকত না। গ্রামের যে বাগ্দী-হাড়ি লাঠিয়ালেরা আগেকার কালে ছত্রিদের বাড়ীতেই পাইক-চাকরের কাজ করত, তাদেরই বংশধরদের সঙ্গে ছত্রিদের বংশধরেরাও কর্ম্মজীবনে মিশে প্রায় একাকার হয়ে গেল। অবশ্য বাগ্দী-হাড়িরা তাদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণামটা করত, আর জলটা ছুঁত না। কিন্তু গাঁজার কল্কে, তামাকের কল্কে চলত হাতে-হাতে।

শুধু সিংহ-রায়দের দু'বাড়ী কোন রকমে মান বাঁচিয়ে চলত। তারা কারও বাঁধা-মাইনের চাকরী করত না। তারাও অবশ্য ওই বৃত্তিই নিয়েছিল, কিন্তু তাদের ছিল ঠিকের কাজ। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় টাকা ঠিকে করে কাজ করে আসত। আরও একটা কাজ তারা করত। গিরবরজার লাল ঘোড়ার কারবার। এক কালে চাকলায় লাল ঘোড়ার খ্যাতি খুব প্রসার লাভ করেছিল। সামান্য বিরোধেই লাল-ঘোড়া-ছাড়াটা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সিংহ-রায়েদের দু'বাড়ীর অসমসাহসী কারবারীরা এক ঘোড়া ছাড়তে নিতেন পাঁচ টাকা, দু'ঘোড়ার জন্যে দশ টাকা, তিন ঘোড়ায় পনেরো, চার ঘোড়ায় কুড়ি। অর্থাৎ কারও ঘরে আগুন দিতে হ'লে ঘরের কোণ-পিছু পাঁচ টাকা ছিল পারিশ্রমিক। এক কোণে আগুন দিতে পাঁচ, দু'কোণে দশ, তিন কোণে পনেরো, চার কোণে অর্থাৎ বেড়া-আগুনের জন্য কুড়ি টাকা রেট। সিংহ-রায়েরা

আগুন দিয়েও কিন্তু ধর্ম্ম বাঁচাত; আগুন দেওয়ার পর আগুন জলে উঠবামাত্র চীৎকার করে উঠত, "উঠডে। দোডডে। লাল ঘোড়া।" অর্থাৎ উঠ্ রে, দৌড়ে আয় রে, আগুন!

এই চীৎকার করাটা হ'ল ছত্রিদের একটা বিশেষত্ব। ছত্রিদের দৃষ্টান্তে আরও অনেকে—হাড়ি-ডোম-বাগ্দীদের দু'দশ জন, সংজাতিরও দু'এক জন, মুসলমানদেরও দশ-বিশ জন লাঠির কাজ এবং লাল ঘোড়ার কারবারও করত, কিন্তু তারা সকলেই এ চীৎকারটুকু করত না। ছত্রিদের এটা ছিল ধর্ম্ম। এ চীৎকার না করলেই তারা ধর্ম্মে পতিত হ'ত। অসতর্ক ব্যক্তিকে আক্রমণ করা তাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ।

দিদিয়ার সেই আক্ষেপ সে দিন নরসিংয়ের বুকের মধ্যে শেলের মত বিঁধেছিল। সেই কবে কোন্ ছেলেবেলায় চৈত্র মাসের চাঁদনীর রাতে শোনা কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে নরসিংয়ের। দিদিয়ার চোখ দিয়ে জল পড়েছিল—চাঁদের আলোয় গালের উপর সে জলের দাগ চক্-চক্ করে উঠছিল মধ্যে মধ্যে; নরসিংয়ের মনে হয়; সে যেন এই একটু আগে কাঁদতে দেখেছে তাকে। দিদিয়া তাকে বলেছিল—ভাইয়া নরসিং, তুই যেন এ কাজ করিস না। লিখা-পড়ি শিখবি, মানুষের মত মানুষ হবি। কেমন?

নরসিং কথা বলে উত্তর দিতে পারে নাই, উপুড় হয়ে শুয়ে সকলকে লুকিয়ে সে কেঁদেছিল, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল—হাঁ। সে তাই করবে।

পরের দিন সে কুস্তীর এবং লাঠির আখড়ায় যায় নাই। তার জেঠামশাই—এ অঞ্চলের বিখ্যাত শূরবীর মাধব সিংহ এসে ডাকলে—নরসিং! আখড়ামে কেঁও নেহি গিয়া রে? তবিয়ৎ কুছ খারাপ হুয়া?

মাধব সিং কোন মতেই বাংলা বলত না। ছত্রিত্ব-গৌরবে সে বলত মেঠো ভুল হিন্দী। ভুলই হোক আর মেঠোই হোক, তাতে তার লজ্জা ছিল না। হিন্দী হ'লেই হ'ল। তবে দু'দশটা আদব-কায়দার ভাষা তার জানা ছিল। সে কখনও বলত না—আপকা ঘর কাঁহা? বলত—জনাবকে দৌলতখানা কাঁহা?

নিজের ঘরকে বলত গরীবখানা। জেঠা মাধব সিংকে মনে হ'লে আজও নরসিংয়ের বুক ভয়ে কেঁপে ওঠে। দুর্দ্দান্ত মানুষ, বিশাল চেহারা, তার উপর মধ্যে মধ্যে জেঠার মাথা গরম হ'ত। তালু কামিয়ে তার উপর ঘৃতকুমারীর শাঁস চাপাত। চোখ হয়ে উঠত রাঙা জবাফুলের মত। প্রথম কয়েক দিন থম ধরে থাকত। কথা কম বলত। কোন কোন বার অল্পেই যেত, সুস্থ হয়ে উঠত। কোন কোন বার একেবারে ক্ষেপে উঠত। মনে আছে নরসিংয়ের—কোমরে কেবল মাত্র কৌপীন এঁটে প্রকাণ্ড লাঠিগাছটা নিয়ে রাস্তায়-রাস্তায় পাঁয়তাড়া ভেঁজে বেড়াত, আর হাঁকত—আও রে কোন্ হায় মর্দ্দানা! আও রে! তার পরই হা-রা-রা হাঁকে লাঠি ঘুরিয়ে সামনের বাড়ীর চালের উপর লাঠির আঘাত করত। সামনে কোন বাড়ী-ঘর না পেলে পথের ধারে গাছগুলির উপর চালাত তার লাঠি। আর অট্টহাসি হাসত—হা-হা-হা-হা।

জেঠার প্রশ্নের উত্তরে কোন কথা নরসিংয়ের মুখ দিয়ে ফুটল না, সে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তার কপালে বুকে হাত দিয়ে জেঠা বলেছিল—বরফ কা মাফিক হিম হায়! আঁ? আরে, তব কেঁও নেহি গিরা? এও বাতাও!

নরসিং এবার মৃদু কণ্ঠে বলেছিল—পড়ছিলাম।

—কেয়া? ইস্ ওয়াক্ত পড় রহা? আঁ? লিখা পঢ়ি? কেঁও? তু কা গমস্তা হও গে? উল্লু কাঁহাকা!

মাধব সিং আচমকা তাকে দুই হাতে আলগোছে তুলে সজোরে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়েছিল। বাড়ী-ঘর খুঁজে ক'খানা বই-কাগজ যা সে সামনে পেয়েছিল, ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু নরসিংয়ের ভাগ্য ভাল যে, সেগুলো তার বই নয়।

সেই দিন রাত্রেই নরসিং ঘর থেকে পালিয়েছিল। পালিয়ে এসেছিল এই ইমামবাজারে। ইমামবাজারের পাশে আকুলি গ্রামে এক ঘর ছত্রি আছে—এই আকুলি গ্রাম হ'ল তার মামার বাড়ী। মামার বাড়ীতে এসে সে উঠেছিল। সেই তার জীবনে প্রথম মামার বাড়ীতে পদার্পণ। গিরবরজার ছত্রিরা বিয়ে

করে বউ নিয়ে আসে—সে বউ আর কখনও গির্‌বরজার সীমানা থেকে বাইরে যেতে পায় না। এই তাদের সেই পুরানো কাল থেকে নিয়ম। কালে কালে অবস্থার পরিবর্ত্তনে ছত্রিদের অনেক ব্যবস্থার ওলোট-পালট হয়েছে, কিন্তু মেয়েদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। পুকুর কাটানোর কল্যাণে মেয়েদের বাড়ীর পাতকুয়োর তোলা জলে স্নানের পরিবর্ত্তে পুকুরঘাটে স্নানের রেওয়াজ হয়েছে, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এখন মেয়েরা বাসনও মাজে, ঘুঁটেও দেয়, গ্রামের পথে বেরিয়ে এবাড়ী-ওবাড়ী থেকে ওপাড়া পর্য্যন্তও যায়, এমন কি বাগ্দীপাড়ায় শাক-মাছ কিনতেও যায়; কিন্তু তার বেশী নয়, গ্রামের সীমানার বাইরে তাদের বেরুবার হুকুম নাই। নরসিংয়ের মায়েরও সেই নিয়মে কখনও বাপের বাড়ী আসা ঘটে নাই, তবে সে শুনেছিল, রামনগরে রেশমের কুঠি আছে, কুঠির চিমনী দেখা যায় দু'ক্রোশ দূর থেকে; সেই রামনগরের নদী পার হয়ে ওপারে শড়ক চলে গিয়েছে ইমামবাজার পর্য্যন্ত; ইমামবাজার ঢুকবার মুখেই আকুলিয়া গ্রাম। আকুলিয়ার মোড়েই সরকারী ডাক-বাংলা, ডাক-বাংলার পরেই আছে পুরানো একটা নীলকুঠির ভাঙা বাড়ী, সেই ভাঙা বাড়ীর পাশেই আকুলিয়ার ছত্রিদের বাড়ী। ধরণী রায়—তার মামা।

আজও স্পষ্ট মনে আছে নরসিংয়ের। দুপুরবেলা সে এসে দাঁড়িয়েছিল মামার বাড়ীর দরজায়। বগলে পুঁটুলির মধ্যে ছিল দু'খানা কাপড় আর তার বই ক'খানা। ইমামবাজারে বড় ইংরাজী ইস্কুল আছে। সেই স্কুলে সে পড়বে, এই সঙ্কল্প নিয়ে বাড়ী থেকে সে বেরিয়েছিল। তার মামার ছেলে-পুলে নাই, মামা তাকে খুব ভালবাসে। কত বার এসেছে তাদের বাড়ী।

মামা বাড়ীতে ছিল না। মামী উনোনশালে বসে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিল। নরসিং তাতে বিস্মিত হয় নাই—গির্‌বরজাতেও মেয়েরা তামাক খেত। মামী তাকে দেখে লজ্জিত হয়ে পাশে হুঁকোটা নামিয়ে প্রশ্ন করেছিল—কে গো তুমি?

মামী কখনও গির্‌বরজায় যায় নাই, নরসিংকে চেনবার কথা নয়।

নরসিং বলেছিল, আমার বাড়ী গিরবরজায়। আমি নরসিং। বাবু ধরণী রায় আমার মামা।

বসন্তকালের ত্ব'পহর বেলা। সকালবেলাটা ঠাণ্ডা থাকলেও ত্বপুর-রোদ বেশ চন্‌চনে হয়ে উঠেছে। তার উপর ইঞ্জিনটা হয়েছে গরম। রেডিয়েটারের খোলা মুখ থেকে এখনও ধোঁয়া বার হচ্ছে। নদীর বালি ঠেলে যখন উপরে উঠেছিল, তখনই আর একবার ঠাণ্ডা জল দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নদীর ওপার থেকেই নরসিংয়ের মন কেমন হয়ে গিয়েছে। পুরানো আমলের গল্পের ঘোর ধরে গিয়েছে যেন। ইমামবাজারে প্রথম বাবুদের সখের থিয়েটার দেখে তার মনে যেমন ঘোর ধরেছিল—তেমনি ঘোর। জল নেওয়ার কথা আর তার মনেই হয় নাই। রামটা ছেলেমানুষ, তার উপর একেবারে বুদ্ধিহীন। নেহাৎ সে তার সম্বন্ধী, আর অবস্থা বড়ই খারাপ হয়েছে ওদের, তার উপর স্ত্রী মরবার সময় হাতে ধরে তাকে বলে গিয়েছে 'রামকে দেখো', তাই সে রামকে রেখেছে। বেহুঁস ছোক্‌রা! *দোষ নিতাইয়ের। নিতাইয়ের ভুল হওয়া উচিত হয় নাই। পুকুরে গিয়ে এতক্ষণ ধরে তারা করছে কি? পুকুর খুঁড়ে জলে তুলছে না কি?

পিছনে একখানা গরুর গাড়ীর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একটা একটানা ক্যাঁ শব্দ—উঠে থেমে যাচ্ছে শব্দটা, একটি নির্দ্দিষ্ট সময় পরেই আবার সেই একটানা শব্দ আরম্ভ হচ্ছে—ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁ। ত্বপুরবেলা মাঠের মধ্যে দূর থেকে শব্দটা শুনলে মন কেমন ঝিমিয়ে আসে। নরসিং পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলে একটা টাপর-দেওয়া গাড়ী আসছে। যাত্রী চলেছে। নরসিং ব্যস্ত হয়ে উঠল। গাড়ীখানা এসে আটকে যাবে। মাঠ দিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলে নরসিং পড়বে ঝঞ্ঝাটে। ধুলো খেতে হবে খানিকটা। হর্ন দিয়ে—তেমন গোঁয়ার গাড়োয়ান হ'লে ধমক দিয়ে, গালি-গালাজ করে মাঠে নামিয়ে পথ খোলসা করে নিতে হবে। নরসিং হর্ন দিতে আরম্ভ করলে, নিতাই এবং রামকে সে সংকেত

জানালে। হর্ন দেওয়ার ভঙ্গীর মধ্যে তার অসহিষ্ণুতা সুপরিস্ফুট। ক্রমশ হর্নের শব্দ উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে আরম্ভ হ'ল।

—এই নিতাই! হারামজাদা শূয়ার-কি বাচ্চা—! ওরে—উল্লু—ক রা—মা—!

রামা—আকারের লম্বা টানটা তার শেষ হ'ল না, পিছনে একটা হুড়মুড় শব্দে সে চমকে উঠল। চকিত হয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে সে দেখলে, পিছনের গরুর গাড়ীটা মাঠের পথের পাশের মাটির বাঁধের উপর থেকে উল্টে পড়ে গিয়েছে। একটা গরু দড়ি ছিঁড়ে মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে, অন্যটা উল্টে-যাওয়া গাড়ীটার চাপে মাটির উপর মুখ থুবড়ে পড়েছে। গাড়োয়ানটা বোধ হয় আগেই লাফ দিয়ে পড়েছিল এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সে বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে ত্রস্ত-চকিত স্বরে একবার বলছে—এই যা, মল' মল'! আর একবার পলায়নপর গরুটাকে হেঁকে বলছে—হ'-হ'-হ'! এই—হ'-হ'!

লাফ দিয়ে নেমে এল নরসিং। প্রথমেই গাড়োয়ানটার হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে—হ'-হ' করবি পরে। গাড়ী তোল্ আগে। পকেট থেকে ছুরি বার করে চাপা-পড়া গরুটার দড়ির বাঁধন কেটে দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে গাড়ীর জোয়ালটাকে তুলে ধরলে। গরুটা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। নরসিং ধমক দিয়ে গাড়ায়ানটাকে বললে—সোওয়ারীর কি হ'ল দেখ্! সোওয়ারী ছিল গাড়ীতে?

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলে নরসিং—মানুষ দেখা যায় না, শুধু তামাকের বোঝা। পিছন দিকে এসে সে উঁকি মারলে। তামাকের বোঝার নিচে থেকে কাপড়ের খানিকটা বেরিয়ে আছে দেখা যাচ্ছে।

তামাকের বোঝা ঠেলে টেনে বার করলে নরসিং। এক জন নয়, দু'জন। এক জন প্রৌঢ় আর একটি বিধবা যুবতী মেয়ে। তামাকের বোঝা চাপা পড়ে দু'জনেই হাঁপাচ্ছে, আঘাতও অল্প-স্বল্প লেগেছে, টাপরের বাখারীর খোঁচায় মেয়েটির কপাল কেটে গিয়েছে। প্রৌঢ়ের কাঁধে খোঁচা লেগেছে।

জল চাই। নিতাই ও রামের জন্য নরসিং মাঠের দিকে দৃষ্টি ফেরালে। ওই দু'জনে নবাবী চালে আসছে! নরসিং হাঁকলে—জলদি। এ—ই! জলদি।

•

চার

মেয়েটির রূপ আছে, সুন্দরী মেয়ে! সব চেয়ে সুন্দর তার গায়ের রঙ আর চুল। গায়ের রঙ তার যত ফরসা, চুলের রঙ তত ঘন কালো। দুপুরের রৌদ্রে তার মুখখানি সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে উঠেছে, শুভ্র স্বচ্ছ ত্বকের নিচে রক্তোচ্ছ্বাস যেন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। রাঙা টকটকে মুখের মধ্যে চোখের পাতাগুলি এবং ভ্রূ দু'টিও ঘন কালো; ছোট কপালটিকে ঘিরে ঘন কালো রুক্ষ চুলের রাশি ফেঁপে-ফুলে রয়েছে, তাতেই মেয়েটিকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে। তেমনি তাকে মানিয়েছে সাদা থান-কাপড়ে; নিরাভরণ বৈধব্যেই যেন তাকে সব চেয়ে ভাল দেখায়। মেয়েটি অল্পেই উঠে বসল। উঠে গায়ের কাপড়-চোপড় সম্বৃত ক'রে মাথায় অল্প ঘোমটা টেনে দিয়ে নিতান্ত নিরাসক্তের মত বসে রইল। সঙ্গী প্রৌঢ়ের জন্য কোন আকুলতাই তার দেখা গেল না। সে উঠে বসতেই নরসিং প্রৌঢ়ের কাছে এল। নিতাই তার মুখে জল দিচ্ছিল। লোকটি মাটির উপর তখনও পড়ে ছিল। চোখ দিয়ে অনর্গল জল পড়ছে আর ক্রমাগত কাশছে লোকটি। নাকে, মুখে, চোখে তামাকের গুঁড়ো ঢুকেছে বেচারার। কালো বেঁটে মোটা লোক, কাপড়-চোপড় পরার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারা যায়, এদেশী মানুষ নয়। নরসিং এক-নজরেই চিনলে—লোকটি হয় ভকত-টকত অর্থাৎ মাড়োয়ারী, নয় তো সাহু-টাহু অর্থাৎ হিন্দুস্থানি বেনিয়া কেউ হবে; তামাকের ব্যবসা করে। লোক সে হরেক রকমের দেখেছে তার গাড়ীর কল্যাণে। নিতাইয়ের হাত থেকে জলের টিনটা নিয়ে বেশ খানিকটা জল দিয়ে তার মুখ ধুইয়ে দিয়ে বললে—উঠুন—উঠে বসুন।

লোকটি কোন সাড়াও দিলে না, তেমনিভাবে পড়ে রইল। নরসিং আবার বললে—উঠুন। শুনছেন?

নিতাই বললে—ভুঁটে প্যাটে মার এক খোঁচা, এখুনি কোঁক করে কোলা ব্যাঙের মতন লাফিয়ে উঠে বসবে। না হয় তো কাতুকুতু দাও। ন্যাকামী করে পড়ে আছে বেটা।

রাম হি-হি করে হাসতে শুরু করে দিলে। মেয়েটি মুখে কাপড় দিয়ে ঘুরে বসল। নরসিং লোকটির হাত ধরে টেনে তুলে বেশ যত্ন করে বসিয়ে দিলে, বললে, লাগে নাই তো বেশী, এমন করছেন কেন? উঠে বসুন।

উঠে বসেই লোকটি হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।—অ রে বাপ রে বাপ, হামরা জান চলা গেয়া রে বাবা, মর গেইলো রে বাবা! হায় ভগোয়ান!

নরসিংয়ের ইচ্ছা হ'ল একটি চড় কষিয়ে দেয় লোকটির গালের উপর। এই দুপুর রৌদ্রে নিজের গাড়ী ফেলে লোকটার ন্যাকামী শোনা তার কাছে অসহ্য বোধ হচ্ছিল ক্রমশ। তবুও ভদ্রতা রক্ষার জন্যই সে চুপ করে রইল, হাজার হ'লেও গাড়ী উল্টে তামাকের বোঝা চাপা পড়ে খানিকটা চোট খেয়েছে লোকটা।

পরক্ষণেই কিন্তু লোকটা উঠে দাঁড়াল, গাড়োয়ানটার দিকে হাত বাড়িয়ে এক মুহূর্তে কান্না থামিয়ে গর্জ্জন করে উঠল—হারামজাদে উল্লুকে বাচ্চে—তুম হারামজাদে হামারা জান মার দেতা! তার পর আর সাধারণ গালি-গালাজে তার কুলিয়ে উঠল না, আরম্ভ করলে অশ্রাব্য, অশ্লীল গালাগাল। তার পর আরম্ভ করলে শাসন—তোরা খাল উতার লেবে হামি, হাড্ডি তোড় দিবে; ফাটকমে ভেজবে হামি শালাকো।

তার পরই অকস্মাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল আরও উগ্র এবং উচ্চ কণ্ঠে—আরে হারামজাদী কুত্তী বে-সরমী কাঁহাকা, তু হাসছিস? কেনে হাসছিস? কাহে? কাহে? বলতে বলতে সে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে।

মুহূর্ত্তে পাংশু হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ, ত্রস্তভাবে সে পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

নরসিং আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, খপ করে সে পিছন থেকে লোকটির হাত ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে টেনে আটকে দিয়ে বলে উঠল—এই য়ো!

সে ঝাঁকানি এবং ধমক খেয়ে লোকটি চমকে উঠল—এর জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না; নরসিংয়ের মুখের দিকে সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। নরসিং বললে, কি রকম লোক মশাই আপনি? এই একেবারে হাউ-মাউ করে কেঁদে সারা, আর এই একেবারে গাড়োয়ানের ওপর বীর-বিক্রম, এই মেয়েলোককে মারতে ছুটছেন! আপনার মাথা-টাথা খারাপ নাকি!

নিতাই বলে উঠল—পিঠের চামড়া তুলবার, হাড় ভাঙবার আর আইন নাই, বুঝলেন! সে তুমি যে হবে সেই হও—রাজাই হও আর মহারাজাই হও। আর মেয়েলোকের গায়ে হাত তুললে তোমাকেই যেতে হবে ফাটকে, হ্যাঁ।

নরসিংয়ের রাগ খানিকটা বেড়ে গেল, অকারণে যেন বেড়ে গেল, সে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললে—গাড়োয়ান তোমাকে ইচ্ছে করে ফেলে দেয় নাই। আর মেয়েটিই বা কি দোষ করলে তোমার কাছে?

রাম হি-হি করে হেসে উঠল, মেয়েটির সে মুখ-ঘুরিয়ে-হাসি সে দেখেছিল, বললে—পচা কুমড়োর মত ওই ভুঁড়ি-নাচ দেখলে কেউ না হেসে থাকতে পারে? হাসির বেগ সামলাতে না পেরে সে এবার বসে পড়ল।

নরসিং এবার তাকেও ধমক দিয়ে উঠল—রাম!

লোকটি এতক্ষণে কথা বললে। শান্ত ধীর অথচ গম্ভীর স্বরে বললে, হামারা হাঁত ছোড় দিজিয়ে। তার সে কথা বলার ভঙ্গিতে ও কণ্ঠস্বরে নরসিং আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কে বলবে যে, এই লোকটাই কয়েক মুহূর্ত্ত আগে সঙের মত হাত-পা ছুঁড়ে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত চীৎকার করছিল!

লোকটি আবার বললে, আপনি হামার জান বাঁচাইয়েছেন। আপনাকে সাথ্ হামি তকরার করবে না। লেকেন হাঁত ছোড়িয়ে দিন।

নরসিংয়ের হাত আলগা হয়ে গেল আপনা থেকে। লোকটি টেনে নিলে নিজের হাত।

লোকটি বললে—গাড়োয়ানের বাত শুনেন তো হামার পাশ। বিচার করেন তো। আঙুল বাড়িয়ে গাড়োয়ানটাকে দেখিয়ে সে বললে, উকে হামি বারণ করলাম দফে দফে, বারণ করলাম—মাঠকে ভেতর মৎ যাও, গাড়ী খাড়া রাখো মোটরকে পিছে। মোটর চলা যায়গা তো গাড়ী চালাও। নেহি শুনা হামারা বাৎ। বোলা কি—ধুলা হোগা। আওর উসকা এক বাৎ—'দেখেন তো, দেখেন তো, মাঠের ভিতর কেমন মজা করে যাব। দেখেন তো।' ফিন হাম মানা কিয়া। মেরে বাৎ নেহি শুনা। হটসে গাড়ী ঘুমা দিয়া মাঠকে উধার—গরু চঢ় গিয়া নালাকে বাঁধ পর। আপ হর্ন দিয়া; ডরকে মারে গরু মার দিয়া লাফ্! বাস্, উলট্ গিয়া গাড়ী। কথা শেষ করে সে নরসিংয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তার পর বললে—আব আপ বোলিয়ে তো উসকো কসুর হায় কি নেহি?

নরসিং, রাম, নিতাই তিন জনকেই স্তব্ধ হয়ে থাকতে হ'ল এবার। গাড়োয়ানের অপরাধ এর পর স্বীকার না করে উপায় কি?

লোকটি এবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসলে—তুচ্ছতায়, ঘৃণায় সে হাসি মর্ম্মান্তিক। এবং সে হাসিও সাধারণ লোকে হাসতে পারে না। হেসে সে বললে—আউর ওই মেইয়া লোকটির বাৎ শুনবেন? উসকে হামি কিনে আনছি মশা। আড়াই শও রূপেয়া দিয়া ওকরা বাপকে।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল তিন জনে।

লোকটি বললে—মাইয়া লোকটার পুকুর-ঘাটসে পাকড়কে লিয়ে গিয়েছিল চার আদমী—দোঠো মুসলমান, এক আদমী বগ্‌দী, এক আদমী হাড়ি। কেস হুয়া। উ চার আদমীকে জেল হো গেয়া। লেকেন কেসমে বাপকে দেনা হো গেয়া। গাঁওমে পতিত হুয়া। হাম দিয়া আড়াই শও রূপেয়া উসকে বাপকো। উ বেটিকো দিয়া হামার সাথ—হামারা বাড়ীমে ঝিকে কাম করবে। আবার সে একটু থামলে, তার পর প্রশ্ন করলে, বোলিয়ে তো—ওকরা হাসনে কা একতিয়ার হায়?

নরসিং অবাক হয়ে গেল। সে শুধু ফিরে তাকালে ওই মেয়েটির দিকে। মেয়েটি যেন পাথর হয়ে গিয়েছে। মাটির দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, মাথার ঘোমটা কখন দুপুরের বাতাসে উড়ে খসে পড়েছে, কিন্তু সে বোধও তার নাই।

লোকটি আবার হাসলে। তার পর বললে—ই গাড়ী কিসকা হায়? আপ তো ডেরাইবর হায়।

নরসিং এ প্রশ্নে একটু সচেতন হয়ে উঠল এবং ওই প্রশ্নে একটু বিরক্তও হ'ল। গাড়ী কিসকা হায়? সে গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে—হাঁ, ড্রাইভ আমি নিজেই করি। লেকেন গাড়ী হামারা হায়।

নিতাই পরিষ্কার করে দিলে কথাটা—ট্যাক্সি হায়। সিংজীই মালিক হায়, নিজেই ড্রাইভ করতা হায়।

—ট্যাক্সি?

—হাঁ—হাঁ—ভাড়াকে মোটরগাড়ী।

হাসলে লোকটি—জানতা হায় হাম। লেকেন ইধার কাঁহা যায়গা ট্যাক্সি?

নরসিং গম্ভীরভাবেই বললে—বাড়ী যাতা হায়, গিরবরজা গাঁও জানতা আপ?

—হাঁ হাঁ।

—ওহি হামরা গাঁও।

—হাঁ, আমি শুনিয়েছি কি ছত্রি লোগের এক লেড়কা ইমামবাজারমে ট্যাক্সি কিয়া হায়। হামারা নাম আপ নেহি শুনা? শুখনরাম সাহু, শহর শ্যামপুরমে হামারা গদী। তামাকু চাউলকে কারবার। গিরবরজামে হামারা তিন-চার খরিদ্দার খাতক হায়।

নামটা নরসিংয়ের পরিচিত, লোকটা মস্ত বড় ব্যবসাদার। কিন্তু ওই উদ্ধত ভঙ্গী নরসিংয়ের ভাল লাগল না। সে বললে—না। কই, আপনার

নাম আমি শুনি নাই কখনও। সঙ্গে সঙ্গে সে মোটরের দিকে অগ্রসর হল। বললে—নিতাই, জল দে রেডিয়েটারে। বেলা অনেক হয়ে গেল।

—আরে শুনো—শুনো—কি নাম তুমার ?

নরসিং কথার উত্তর দিলে না। নিতাই কিন্তু ফিরে লোকটির দিকে না তাকিয়ে পারলে না।

—শ্যামপুর পৌছা দেগা হামা লোগনকে ?

হেসে নিতাই বললে—কত ভাড়া দেবেন ?

—তুমলোক বোলো—কেতনা লেগা।

আবার নরসিং বললে—লোকটাকে জব্দ করবার জন্যেই—পঞ্চাশ টাকা।

—পচাশ ? ভ্রূকুঞ্চিত করে লোকটি বললে—পনরো মাইল রাস্তা যানেকা লিয়ে পচাশ রুপেয়া ?

নরসিং বললে—গাড়োয়ানটাকে পাশের গাঁয়ে পাঠিয়ে একখানা গরুর গাড়ী দেখ। নে রে নিতাই, মার্ হ্যাণ্ডেল।

—রোখো! পচাশ রুপেয়াই দেবে হামি। লোকটা অগ্রসর হয়ে এসে গাড়ীর দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়াল।

পঞ্চাশ টাকা! নিতাই নরসিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নরসিং বললে—দে দরজা খুলে।

*　　*　　*

লোকটা বিচিত্র লোক। গাড়ীতে উঠেই সিগারেট বার করলে। নরসিংকে দিয়ে বললে—লেও ভাইয়া।

নরসিং মাথা নেড়ে বললে—না থাক্।

লোকটা পিছনের সিট থেকে উঠে নরসিংয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বললে—কেয়া ভাই—হামার পরে গোসা করিয়েছে তুমহি ? না—কেয়া ? কি কসুর করলাম ভাইয়া ?

নিতাই বুঝেছিল ব্যাপারটা—সে বলে উঠল—কি আপনি তুমি তুমি করছেন বলুন তো? ট্যাক্সি চালাই বলে আমরা কি ছোটলোক না কি?

—আরে রাম-রাম-রাম! রাম কহো ভাইয়া। ইসকো লিয়ে গোসা কিয়া! আরে ভেইয়া বোলিয়ে তো—আপনা লোগসে হামারা কেতনা উমর বেশী হুয়া? আরে দেখিয়ে তো মাথা হামরা—একদম সব সাদা হোইয়ে গেলো। হামি দাদা—আপলোক ভাই। বলে সে হা-হা করে হেসে উঠল।

নিতাই এবার হেসে ফেললে, বললে—তা যদি বলেন, তবে কথা নাই।

রাম হি-হি করে হেসেই চলেছিল—সে নিতাইয়ের কানে কানে বললে—লোকটার কানের চুল দেখ মাইরী—যেন রাম ছাগলের দাড়ী! সে শুধু লক্ষ্য করছিল—লোকটার কোথায় কি হাস্যকর কুশ্রীতা আছে।

নরসিংয়ের পিঠে হাত দিয়ে শুখনরাম আবার বললে—লেও ভেইয়া—পিয়ো সিগরেট! এবার সে নরসিংয়ের মুখে গুঁজে দিলে সিগারেট।

সঙ্গে সঙ্গে নিতাই ক্ষেত্রটাকে লঘু করে তুললে বেশ একটি সরস রসিকতা করে। বললে—দাদা নয়—সাওজী আমাদের ঠাকুরদাদা! "ঠাকুরদাদা, পেয়ারা খায়।" না কি সাওজী?

সাওজী খুশী হয়ে উঠল—বহুৎ আচ্ছা—পিয়ো, তুমভি সিগরেট পিয়ো।

রাম হঠাৎ প্রচণ্ডবেগে হি-হি করে হেসে উঠল—বললে—ওই মেয়েলোকটি আমাদের ঠাকরুণ-দিদি—না কি সাওজী?

নরসিংহ আপনার অজ্ঞাতসারেই বোধ করি পিছনের দিকে ফিরে দেখলে এবার, দেখলে ওই মেয়েটিকে। মেয়েটি কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

শ্যামনগর যেতে পথে পড়ে পাঁচমতী। এই পাঁচমতীর কায়স্থবাড়ীতে এসে ঢুকেছিলেন—গিরবরজার মা-লক্ষ্মী। এখানকার কায়স্থরা এখনও সমস্ত দেশের মধ্যে নামজাদা ধনী; বনিয়াদী জমিদার। বড় বড় পাকা তিন-মহল চার-মহল বাড়ী—উঁচু-পাঁচিল-ঘেরা বাগান পুকুর, সে রাজা-রাজড়ার মত কাণ্ডকারখানা। মূল বাড়ী থেকে চার বাড়ী হয়েছিল, চার বাড়ী থেকে এখন

আরও অনেক বাড়ী হয়েছে। এখানকার কায়স্থরা শুধু জমিদারই নয়—বড় বড় লেখাপড়া-জানা লোক সব। কয়েক জন জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছে, ডেপুটি তো অনেক, কায়স্থবাড়ীর ছেলে যে ছোট কাজ করে, সে সব-রেজিষ্ট্রর। উকীল-ব্যারিষ্টারও অনেক। মা-সরস্বতীর প্রসাদে কায়স্থরা মা-লক্ষ্মীকে বেঁধে রেখেছে।

সেই কথাই তো বলত—নরসিংয়ের দিদিয়া। বলত—ওই যে মানুষের মনের মধ্যে সাপের মাথার মাণিকের মত মতি, মানুষ মূর্খ হলে ওই মূর্খামী গোবরের মত মতিকে ঢাকা দেয়, চাপা দেয়। গোবরের তলায় চাপা-পড়া মাণিক হারিয়ে যেমন সব অন্ধকার দেখে, মূর্খ হলে মূর্খামীর ময়লায় আচ্ছন্ন মতিতে মানুষও তেমনি তখন পৃথিবীতে পথ দেখতে পায় না।

লেখা-পড়া শিখবে বলেই নরসিং ঘর থেকে পালিয়ে মামার দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু নরসিংয়ের ভাগ্য। সে কি করবে?

চেষ্টার সে ত্রুটি করে নাই। মামার বাড়ীর ভাত খেতে তার নূনের দরকার হত না, এক এক গ্রাস ভাত মুখে তুলত আর মামীর এক-একটি কথার হুল এসে বিঁধত—তার ফলে চোখের জল গড়িয়ে মিশত গিয়ে ভাতের সঙ্গে। সেও সে সহ্য করেছিল। তবে তার মামা ধরণী রায় বড় ভাল লোক ছিল। সে ছিল ওখানকার ডাকবাংলার রক্ষক। ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড থেকে মাইনে পেত মাসে বারো টাকা। মামা তাকে ইমামবাজারের ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়েছিল।

মামী জিজ্ঞাসা করেছিল—ভাগ্নেকে তো ভর্ত্তি করে দিয়ে আসা হল—মাস মাস মাইনে কে জোগাবেন শুনি?

তখন সন্ধ্যাবেলা, মামার গাঁজার মৌতাত ধরে এসেছে, চোখ বন্ধ করে মামা ভুড়ুৎ ভড়ুৎ করে হুঁকোয় টান দিচ্ছিল। মামার কানে কথাটা গেলই না বোধ হয়।

মামী এসে মামার মুখের কাছে চীৎকার করে উঠল—কথা কানে যাচ্ছে না নাকি?

মামা চোখ খুলে বললে এবার—কি? চিল্লাচ্ছিস কেনে তু?

—চিল্লাছিস কেনে? সাধে চিল্লাই—বলি ভাগ্নের মাইনে কে দেবে?

মামা খুব গম্ভীরভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত মামীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। মামী বললে—তাকিয়ে আছে দেখ্, যেন আমাকে ভস্ম করে দেবে।

মামা উঠে দাঁড়াল। মামী সরে এল খানিকটা।

গোঁপে তা দিয়ে মামা বললে—হাম দেগা। আমি বাবু ধরণীধর রায়, আমার ভাগ্নে, আমি মাইনে দেব।

—বাবু ফরণী ফর রায়! বাবু! মাইনে মাসে বারো টাকা। বারো রূপেয়াকে বাবু!

মামা সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে গিয়ে মামীর ঘাড়ে ধরে বেশ ঘা-কতক বসিয়ে দিলে। আমি বারো রূপেয়াকে বাবু? বারো রূপেয়াকে বাবু হ্যায় হাম? তার পর তাকে ঠেলে ঘর থেকে বাইরে বার করে দিলে—নিকালো! নিকালো! আভি নিকালো!

দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল নরসিং; তার মনে হয়েছিল—সমস্ত অপরাধ তার। ছি-ছি-ছি! কেন সে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল! সমস্ত রাত্রি সে সেদিন কেঁদেছিল। মামী অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসেছিল অন্য দরজা দিয়ে।

মাসে ত্রিশ দিনের মধ্যে বিশ দিন অন্তর এই ধরনের কিছু-না-কিছু ঘটত। এ ধরনের যা-কিছু, সে অবশ্য ঘটত সন্ধ্যার পরে। সকাল বেলাতেই মাথায় পাগড়ী বেঁধে লাঠি নিয়ে গোঁফে তা দিয়ে মামা বেরিয়ে যেত—ডাকবাংলার বারান্দায় বসে শনের দড়ি পাকাত—সামনে খোলা জায়গায় তার গরুগুলি ঘাস খেয়ে ঘুরে বেড়াত। এগারটায় মামা বাড়ী ফিরত। নরসিং তার আগেই ইস্কুলে বেরিয়ে যেত। মামার অনুপস্থিতিতে মামী শোধ তুলত তার উপর। নরসিং আসবার পর থেকেই তার শরীর খারাপ হয়ে পড়ল। সকালে যথানিয়মে উঠে কাজ-কর্ম্ম সারত আর নিজের অদৃষ্টকে গাল পাড়ত। এইতেই নরসিংয়ের সব চেয়ে বেশী ভয় হত। আজও মামীর কথা মনে করতে গেলে তার ওই সকালের সেই [illegible]

মনে পড়ে, সে আজও শিউরে ওঠে। মামী সকালে দরজা খুলে বেরিয়েই আরম্ভ করত—ঝাঁটা মারি, ঝাঁটা মারি নিজের অদেষ্টকে। মরণ হয় তো শরীর জুড়োয়, হাড়ে বাতাস লাগে। বিধাতা মুখপোড়ার দেখা পাই তো একবার জিজ্ঞাসা করি—তোর করণটা কি ? সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে ডাকত বাউড়ী ঝিটাকে—বলি ওলো ও হারামজাদী,—ও গতরখাকী ! বলি আর আসবি কখন ? তার পর পড়ত নরসিংয়ের উপর—আর তুমি তো বাবা নবাবজাদা, বাদশাহের ভাগ্নে, তোমাকে তো কিছু বলবার জো নাই আমার ! পড় বাবা পড়, পড়ে হাকিম হবে—আমীর হবে—আঁটকুড়ো মামাকে পিণ্ডি দেবে—মামা বত্রিশটা দাঁত বার করে সোনার রথে চড়ে সগ্‌গে যাবে।

বলে হনহন করে গিয়ে গরুগুলোকে বাইরে বার করত। ফেরবার পথে আবার বলত—দিব্যি দিয়ে রাখছি তোমাকে, আমাকে যেন পিণ্ডি দিও না তুমি।

মামার গলার শব্দ শোনা যেত এই সময়, মামা ফিরত প্রাতঃকৃত্য সেরে। মামী আবার ঘুরে পড়ত মামার উপর। গাঁজার সরঞ্জাম, আয়না-চিরুণী, কাপড় বার করে দিত আর বলেই চলত—এ পোড়া দেহ পাত হলেই বাঁচি, আমার খেয়ে সুখ নাই, ঘুমিয়ে শান্তি নাই, খেটে-খেটে আমার পরমায়ু কমে গেল। দেহের সুখ-অসুখ নাই, মনের ভাল-মন্দ নাই, বারো মাস সেই বাঁদীগিরি।

মামা বলত—থাক্ থাক্, আমি নিজেই সব নিচ্ছি, তোমাকে কিছু করতে হবে না।

—না না না। এত 'ছেদ্দায়' কাজ নাই।

—না। আমার কাজ তোমাকে করতে হবে না। আমার হাত-পা আছে। আমি অক্ষম নই।

—ভাল হবে না বলছি। আমি মাথা খুঁড়ব। বলতে বলতে মামী সব জিনিস-পত্র এনে নামিয়ে দিত। মামা জিনিস-পত্রগুলোকে সরিয়ে দিয়ে বলত—

নেই লেগা হাম। নেই লেগা। বলে জিনিসগুলিকে উঠিয়ে নিয়ে যেত—যেখানে ছিল সেইখানে। মামী চীৎকার করত—যদি না নাও তো আমার মরা মুখ দেখ। তা হলে মাথা খাও।

মামা আবার জিনিসগুলি নিয়ে এসে বসত যথাস্থানে।

মামা চলে গেলেই ঘরের দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে আবার এক দফা শুয়ে পড়ত। কোন দিন মরা বাপের জন্য কাঁদত। কোন দিন নিজের মন্দ ভাগ্যের জন্য কাঁদত। কোন দিন নিজেই নিজের মাথা টিপত আর কাতরাত।—ও বাবা, ও মা! তার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নাক ডাকতে শুরু হত। ঘণ্টা দেড়েক ঘুমিয়ে মামী উঠে বসে কিছুক্ষণ হাই তুলত, আড়মোড়া ভাঙত, তার পর আরম্ভ করত ভাঁড়ার ও রান্নার কাজ। এর মধ্যেই বেজে যেত সাড়ে ন'টা, দশটা।

সভয়ে নরসিং বলত—ইস্কুলের বেলা হল মামী।

মামী বলত—তার মামী কি করবে বাবা?

নরসিং একটু ভেবে বলত—চারটি মুড়ি দাও আমাকে।

মামী বলত—মুড়ি এখন দু'দিন ভাজতে নাই, পান্তাভাত আছে, খাও তো খাও।

পরদিন নরসিং পান্তা ভাতই চাইত, কিন্তু মামী বলত—পান্তা ক'টা যদি তোমাকেই দোব, তবে ঝিয়ের পাতে দোব কি আমি? মুড়ি দিচ্ছি, গেলো, গিলে যাও।

রাত্রে ভাত খেত মামার সঙ্গে। তখন ইচ্ছে হত রাক্ষসের মত খায় সে, কিন্তু মামীর ভয়ে ভাত সে দ্বিতীয় বার চাইতে পারত না।

দেড় মাস। দেড় মাস সে মামার বাড়ীতে ছিল। দেড় মাসের মধ্যেই নিজেই বুঝতে পারলে, সে অনেক দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। ইস্কুল দু'মাইল পথ, এই পথটা হাঁটতে সে দু'তিন বার বসত—পথের ধারের গাছতলায়। দেড় মাস পর হঠাৎ সে দিন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বেধে

গেল। মামা কেমন করে জেনে ফেলেছিল—নরসিংয়ের দিনে ভাত না পাওয়ার কথা।

মামী স্পষ্ট বলে দিলে মুখের উপর—আমি পারব না, পরের ছেলের জন্যে দশটায় ভাত রাঁধতে আমি পারব না।

মামী হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছিল যেন। সে নরসিংকে বলে উঠল—মর্—মরে আমার পেটে আয়—আমি তখন—

মামী কথা শেষ করতে পায় নাই। মামা চীৎকার করে উঠেছিল জানোয়ারের মত। নরসিংও সে চীৎকারে আঁতকে উঠেছিল। মামী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার পরই সে ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে খিল দিয়েছিল।

মামা কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে হঠাৎ উঠে নরসিংয়ের হাত ধরে বলেছিল—চল—আও হামারা সাথ।

টেনে—প্রায় টানতে টানতে নরসিংকে নিয়ে গিয়ে মামা উঠেছিল—ইমাম-বাজারের রাধাশ্যামবাবুর বাড়ী। বাবুদের কয়লার ব্যবসা আছে, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের কণ্ট্রাক্টরী করে, জমিদারীও কিছু আছে, বাবুরা বড়লোক। শুধু বড়লোকই নয়, অন্ন দানও করে বাবুরা। দু'তিনটি ছাত্র বাবুদের বাড়ীতে খেয়ে ইস্কুলে পড়ে। ধরণী রায় ডাকবাংলার অনেক দিনের কীপার; ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের ওভারসিয়ার ইঞ্জিনিয়ার তাকে ভালও বাসে এবং তাদের হুকুম নিয়ে অনেক দিন থেকেই কণ্ট্রাক্টার হিসেবে বাবুদের বাড়ীতেও যাওয়া-আসা করে, এই দাবীতে ধরণী রায় নরসিংকে নিয়ে এসে বাবুর সামনে নমস্কার করে দাঁড়াল—এই আমার ভাগ্নে। ইস্কুলে পড়ছে। ওকে চারটি করে ভাত আপনাকে দিতে হবে।

নরসিং সবিস্ময়ে চারি দিক দেখছিল। গিরবরজার বাইরে তার জীবনের পরিচয় খুব বেশী নয়, তবে পাঁচমতী বার-কয়েক গিয়েছিল—পাঁচমতীর ধন-ঐশ্বর্য্য, জাঁক-জমক সে দেখেছে; সে ধন-ঐশ্বর্য্যের কাছে এ বাড়ীর ঐশ্বর্য্য কিছু নয়, তবুও ছোট-খাটোর মধ্যে হাল্কা অথচ ঝরঝরে তকতকে ব্যবস্থা দেখে চোখ

জুড়িয়ে যায়। পাঁচমতীর বাবুদের আস্তাবলে ঘোড়া আছে, পিলখানায় হাতি আছে, একটা লম্বা বারান্দায় পাল্কী ঝুলানো আছে, সহিস মাহুত বেহারা সর্দ্দার, সে অনেক ব্যাপার! এখানে কাঠের তাকের উপর রাখা আছে চারখানা চকচকে দু'চাকার গাড়ী। দু'জন হাফপ্যাণ্ট-পরা ছোকরা ন্যাকড়া দিয়ে আরও দু'খানা গাড়ী বারান্দায় পরিষ্কার করছে। হঠাৎ ভট্-ভট্ শব্দ করে একখানা জবরদস্ত দু'চাকার গাড়ী এসে দাঁড়াল। মোটা চাকা—অনেক কলকব্জা—পিছনের দিকে একটা নল থেকে ভক-ভক করে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে এল। গাড়ী থেকে নামল—একেবারে ফিট-ফাট সায়েবী-পোষাক-পরা—এক জন অল্পবয়সী বাবু। নেমেই টুপীটা খুলে হাতে নিয়ে খট-খট করে এসে ঘরে ঢুকল।

মামা ধরণী রায় খুব সম্ভ্রমভাবে নমস্কার করে বললে—এই আমাদের মেজ হুজুর চলে এসেছেন। আর ভাবনা নাই।

বল কি রায়! আমার জন্যে কোন্ দুর্ভাবনায় তোমার ঘুম হচ্ছিল না! নাও একটা সিগারেট খাও। তারপর ধীরে সুস্থে শোনা যাবে তোমার দুর্ভাবনার কথা।—বলে মেজবাবু একটা টিন খুলে একটা সিগারেট বার করে দিলে। মেজবাবুর কথার ধরনের মত কথার ধরন নরসিং এর আগে কখনও শোনে নাই। অদ্ভুত লাগছিল তার মেজবাবুকে। কিন্তু তার চেয়েও তার মনকে আকর্ষণ করছিল ওই কলকব্জা-ওয়ালা দু-চাকার গাড়ীটা। ইচ্ছা হচ্ছিল ওটাকে সে একবার নেড়ে দেখে। একবার ছোঁয়। শুধু ছুঁয়ে দেখা।

মেজবাবুর সেই মোটর সাইকেলটা তার জীবনে এমন রঙ ধরিয়েছিল যে, সে রঙ এখনও ফিকে হ'ল না। তার বড় ইচ্ছা ছিল—ঠিক মেজবাবুর মত চোখে একটা নীল চশমা এঁটে ঐ গাড়ীটাতে চেপে পায়ের চাপে সেই পা-দানীর মত হ্যাণ্ডেলটাকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ীটাকে ছেড়ে দেয়। উড়ে চলে গাড়ীটাতে চেপে। তার মনে হ'ত গাড়ীটা রাস্তার উপর দিয়ে চলে না—শূন্যলোক দিয়ে উড়ে যায়। রাস্তার বাঁকের মুখে প্রায় কাত হয়ে, প্রায় মাটি

ছুঁয়ে চলে যায় সকলের দৃষ্টির বাইরে। সে আর তার হ'ল না। কোথায় যে চলে গেল গাড়ীখানা, তার পাত্তা আর নরসিং পায় নাই। মেজবাবুর মৃত্যুর পর গাড়ীখানা কিনেছিল তার এক বন্ধু সার্কেল-ডেপুটি। সে বদলী হয়ে চলে গেল। তারপরও খোঁজ করেছিল, নরসিং—কিনবার জন্যে অবশ্য নয়, এমনি খোঁজ করেছিল ওই শখে—ওই মায়ায় খোঁজ করেছিল। জেনেছিল সার্কেল-ডেপুটি গাড়ীখানাকে বিক্রী করেছে একজন আবগারীর সায়েবকে।

মেজবাবুর জিনিস—জিনিসটাকে রাখবার জন্য সবাই অনুরোধ করেছিল বড়বাবুকে। কিন্তু বড়বাবু সে লোকই নয়। হিসেব-নিকেশ লাভ-লোকসান না দেখে বড়বাবু কিছু করে না। কিন্তু সব হিসেব বাঁকা। সহজ নিয়মে হিসেব বড়বাবু করে না।

মেজবাবুর ছিল দরাজ মেজাজ; মামা ধরণী রায়ের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলে—বেশ তো, এ আর এমন কি কথা! থাকবে তোমার ভাগ্নে। পড়ুক।

বড়বাবু চুরুট টানছিল—এতক্ষণে বললে—তোমাদের ওভারসিয়ারবাবু কবে আসবেন হে? খরচপত্র করে পাথরকুচিগুলো জমা করলাম, আর সেগুলো এক কথায়—'নেব না' বলে দিলেন তিনি। ওভারসিয়ারবাবু এলে তুমি বলবে তাঁকে, বুঝলে!

তেরশো ছাব্বিশ সাল বাইশে ফাল্গুন—ওই দিনটা মনে আছে নরসিংয়ের; ইমামবাজারে রাধাশ্যামবাবুর বাড়ীতে সে ঢুকেছিল।

*　　　*　　　*

নিতাই তাকে সজাগ ক'রে দিলে। সিংজী!

—হুঁ।

ধূলোর নিচে বেজায় 'গচকা'—আরও স্পীড কমিয়ে দ্যান। তা ছাড়া—আশে-পাশে সে তাকিয়ে দেখলে। দেখে বললে—মাঠ দিয়ে ভাও ন বরং।

গচকাও বাঁচবে আর গাড়ীগুলাকেও 'পাস' করে যাওয়া হবে। শালা গাড়ীর 'রহট' লেগে গিয়েছে রে বাবা!

গাড়ীর স্পীড কমানো সত্যই দরকার, পুরু ধূলোর নিচে কোথায় খানা-খন্দর আছে বুঝবার উপায় নাই। এ রাস্তায় উঠেই সে কথা নরসিংহের মনে হয়েছিল। কিন্তু অন্যমনস্কতার মধ্যে কখন কথাটা সে ভুলে গিয়েছে। তা' ছাড়া গাড়ীতে প্যাসেঞ্জার চড়লেই কেমন একটা জোরে যাবার তাগিদ আপনা থেকেই মনের মধ্যে এসে পড়ে। প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে বসলেই তার তাঁবেদারী করতে হয়, 'রোখো' বললেই রুখতে হবে, 'জলদি কর' বললেই স্পীড বাড়াতে হবে। তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে পারলেই খালাস—টাকাটাও পকেটে এসে যায়। ওই পাঁচমতীর কায়স্থবাবুদের দালানগুলোর চিলেকোঠার মাথাগুলি দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, সেই অন্যমনস্কতার মধ্যে কখন যে এই তাগিদটা তার হুঁশিয়ারী-বোধকে ছাপিয়ে উঠেছে সে তার খেয়াল ছিল না। গাড়ীটা বড় ঝাঁকানি খাচ্ছে, 'বডিটা' দুলছে, স্প্রিংয়ে মধ্যে মধ্যে শব্দ উঠছে। তা ছাড়া সামনে চলেছে সারিবন্দী গরুর গাড়ী। সামনে আসছে আবার একটা নদীর ঘাট। এই ছোট গ্রাম্য রাস্তাটা ওই নদীর ঘাটে নবাবী আমলের পুরানো বড় শড়কের সঙ্গে মিশেছে। নদীর ঘাটটায় মস্ত একটা বাজার। বড় বড় গাছের ছায়ার তলায় গরুর গাড়ীগুলি রেখে যাত্রীরা ওখানে খাওয়া-দাওয়া করে।

নদী পার হয়ে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে শ্যামনগর, শ্যামনগর থেকে শহর মুরশিদাবাদ। এপার থেকে রাস্তাটা চলে গিয়েছে মুরশিদাবাদ জেলা পার হয়ে বর্দ্ধমান। নরসিং যে রাস্তাটায় আসছে এটা আসছে রামনগরের ঘাট থেকে। মধ্যে মধ্যে আশ-পাশ থেকে দু-চারটে গ্রামের পথ এসে মিলেছে। সারিবন্দী মানুষ চলেছে, অধিকাংশই হাটুরের দল—কাঁধে ভার নিয়ে—মাথায় বোঝা নিয়ে চলেছে—পাঁচমতীর হাটে সারিবন্দী গাড়ী চলেছে—কতক গাড়ীতে চলেছে মাল—কলাই, পেঁয়াজ, সরষে, আলু; দেশান্তরে নিয়ে চলেছে—বিক্রী

করে ধান কিনে আনবে। কতক গাড়ীতে চলেছে যাত্রী। মামলা-মকদ্দমার যাত্রীই বেশী, শ্যামপুর আদালত, মুরশিদাবাদ আদালত চলেছে সব। এ ছাড়াও যাত্রী আছে বইকি। মানুষের কাজের কি অন্ত আছে!

রাস্তাটার চেহারা হয়েছে অদ্ভুত। বিস্তীর্ণ মাঠের চারিদিক পরিষ্কার—শুধু মাঝখানে একটা ধূলার বিরাট কুণ্ডলী চলে গিয়েছে—রেলের ইঞ্জিনের পিছনের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত।

নরসিং সজাগ হয়ে উঠল এবার।

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে এবার যেন মানুষের রাজ্য এল। মানুষ চলছে, পায়ে পায়ে ধূলো উড়ছে, হোক গরুর গাড়ী—গাড়ী চলছে—গরুর খুরে, গাড়ীর চাকায় ধূলো উড়ছে—শুধু উড়ছে নয়—চলছে; উড়ে চলেছে—গাড়ীর টাপরে—চাকায়—গরুর খুরে—মানুষের গায়ে লেগে চলেছে, এখান থেকে ওখান।

নিতাই বললে—ডাইনে ওই দেখুন—ওই জায়গাটায় ধানের গাড়ী যাবার পথ ছিল—কাটা রয়েছে—পগার। ওইখানে—

—হুঁ।

পিছনে তাকিয়ে দেখলে নরসিং, সাহজী খুব গম্ভীর হয়ে বসে আছে। মেয়েটি কখন জেগেছে, সে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পথের ওই ধূলোর কুণ্ডলীর দিকে।

নরসিংয়ের হঠাৎ মনে হ'ল—গাড়ীর চাকায় লেগে দু-এক টুকরো মাটি যেমন চলেছে এদেশ থেকে ওদেশ—মেয়েটিও চলেছে ঠিক তেমনি ভাবে।

নরসিং গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে দিলে; ক্লাচে পা দিয়ে স্টীয়ারিং হুইলের গোল মাথাটা পাক দিয়ে ঘুরিয়ে দিলে, সামনের চাকা দুটো মোড় ফিরে—ধীরে ধীরে মাঠের ভিতরে এগিয়ে গেল। নিতাই ভাল বলেছিল—মাঠের পথ অনেক ভাল।

পাঁচ

নদীর ঘাট পার হয়ে পাঁচমতী গ্রামখানাকে পাশে রেখে রাস্তা চলেছে শ্যামনগর। এবার রাস্তা অনেক ভাল। পুরানো বাদশাহী শড়ক, দু'খানা গাড়ী পাশাপাশি চললেও দু'পাশে খানিকটা ক'রে পথ পড়ে থাকে সঙ্কীর্ণ ফুটপাথের মত। স্থানে স্থানে তিনখানা গাড়ী চলবার মত প্রশস্ত। আগে আরও প্রশস্ত ছিল। এখন দু'পাশের ধানজমি মালিকেরা পথ কেটে কেটে জমির অন্তর্গত ক'রে নিয়েছে। চাষীদের ওই একটা রোগ। সেকালে, মনে পড়ে নরসিংয়ের, এক চাষী তাদের গ্রামের ছোট পথটার পাশ কেটে রাস্তাটা এমন ছোট ক'রে দিয়েছিল যে, গরুর গাড়ী যাওয়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; চাষীকে ডেকে শাসন করেছিল তার জেঠা মাধব সিং; বলেছিল—তু শালা ছিঁচকে চোর। আধা হাত, আধা হাত হর-বরিষ কাটিয়ে লেও। নজর মে আসে না। আরে শালা মরদ হো, তুমারা কিস্মৎ হায় তো লাঠিকে জোরসে লে লেও যেতনা ইচ্ছা হোয় তুমারা—দেখে একদফে! চাষীকে দিয়ে সেই বছরই মাধব সিং সে রাস্তা ঠিক ক'রে নিয়েছিল। এখানে কে রাজা, কে গোঁসাই! ডিষ্ট্রিক-বোর্ডের ওভারসিয়ার বাইসিক্ল হাঁকিয়ে আসে যায়—চোখে তার এসব পড়ে না তা নয়; চোখে পড়ে, হাঁকডাকও করে; শেষ পর্য্যন্ত পকেটে কিছু পুরে নিয়ে যায়।

রাস্তা শ্যামনগরের দিকে যত অগ্রসর হয়েছে অবস্থাও তত ভাল হয়েছে। মেটে শড়ক হলেও রাস্তা বেশ সমতল। কিন্তু গাড়ী এবং যাত্রীর ভিড়ও বাড়ছে। মধ্যে মধ্যে ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ী আসছে শ্যামনগর থেকে। এখানে বল 'কেরাচি গাড়ী'। শ্যামনগর থেকে পাঁচমতী পর্য্যন্ত প্রতি শেয়ারে আট আনা ভাড়া। অধিকাংশই মামলা-মকদ্দমার যাত্রী। বিকেলের দিকে 'কেরাচি গাড়ীর' সংখ্যা বাড়বে। পাঁচমতী পর্য্যন্ত যাবে, রাত্রে সেখানে থাকবে, পরদিন আটটায় যাত্রী নিয়ে আবার ছুটবে শ্যামনগর।

—আব তো রাস্তা ভালো আসিয়ে গেলো, জোরসে চালাইয়ে দাও ভাইয়া।—পিছন থেকে তাগিদ দিলে শুখনরাম।

পিছন ফিরে তাকালে নরসিং।

—জোরসে—জোরসে। স্পীড বাড়াইয়ে দিন। শুখনরাম আরও গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে।

অ্যাক্সিলেটারে চাপ দিলে নরসিং। শুখনরামকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের সিটের অপর যাত্রীটিকেও দেখবার ইচ্ছা হ'ল। এ ইচ্ছা হয়। কিন্তু যাত্রী যাত্রিনী হ'লে মুখ ফিরিয়ে দেখার বিপদ আছে। সঙ্গের পুরুষেরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। লোকের রাগকে সে ভয় করে না, কিন্তু বদনামকে ভয় আছে। প্যাসেঞ্জার কমে যায়। মেয়েছেলে নিয়ে এমন ড্রাইভারের গাড়ীতে উঠতে চায় না লোকে। এ ক্ষেত্রে সামনে পিছনে গাড়ী এবং পথিক দেখবার জন্য যে আয়নাটা আছে নরসিং সেটাকে একটু ঘুরিয়ে দিয়। পিছনের রাস্তার বদলে তখন গাড়ীর ভিতরটা দেখা যায়। আয়নাটা ঘুরিয়ে দিলে সে।

নিতাই একটু হাসলে। এর গূঢ় অর্থ নিতাইয়ের কাছে অজ্ঞাত নয়।

আয়নায় মেয়েটির মুখ ভেসে উঠেছে। মেয়েটি হাসছে বলে মনে হ'ল। অতি মৃদু হাসি। আয়নার মধ্যেই মেয়েটির চোখে চোখ পড়ল, আয়নার দিকে তাকিয়েছে মেয়েটি। চোখ নামিয়ে নিলে সে। আবার তাকালে। এবার একটু ঘোমটা বাড়িয়ে দিলে। মেয়েটির মুখের হাসিটুকু আশ্চর্য্য! ঠোঁটের কোল ছাড়া আর কোথাও এতটুকু চিহ্ন নাই, চোখের কোণে না, নাকের পাশ থেকে ঠোঁটের কোণ পর্য্যন্ত বাঁকা দাগে পর্য্যন্ত না।

—বাঁয়ে—বাঁয়ে। বাঁয়া রাস্তাসে। শুখনরান হাঁকলে।

শ্যামনগরের প্রবেশমুখে রাস্তাটা তিনটে রাস্তায় বিভক্ত হয়েছে। একটা সোজা চলে গিয়েছে, একটা ডাইনে, একটা বাঁয়ে।

এ রাস্তাটার উপর মাল-বোঝাই গরুর গাড়ীর ভিড় বেশি। ধানের কারবার,

কলাই, লঙ্কা, পেঁয়াজ, আলুর আড়ৎ, জ্বালানী কাঠের আড়ৎ, দু-একটা কয়লার ডিপো। তারই মধ্যে শুখনরামের গদি। ধান, চাল, তামাকের ব্যবসা। পাকা বাড়ি। আপাদমস্তক শিক দিয়ে ঘেরা। বারান্দায় তক্তপোশের উপর তোষক এবং চাদর পেতে মালিকের বসবার জায়গা। মালিকের বসবার জায়গায় বসে আছে শুখনরামের চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলে।

শুখনরাম বললে—বাস করো, রোখো।

শুখনরাম নামল। সর্ব্বাগ্রে সে হুকুম দিলে—ছোট পেটিয়াটা আগে নামাও। তামাকের ছোট একটা পেটি। ওটাকে সে সঙ্গে নিয়েছিল। শুখন ছেলেকে বললে—একদম উপরে নিয়ে ঠিক জায়গায় রাখা হয় যেন—নিজে দেখবি।

ছেলে বললে—উ জেনানী ?

শুখন ধমকে উঠল মেয়েটাকে—এই, উতারো। এই হারামজাদী কুত্তি!

আয়নার ভিতর দিয়ে নরসিং তখনও তাকিয়ে ছিল মেয়েটির দিকে। মেয়েটিও মধ্যে মধ্যে তাকে দেখছিল ; ধমক খেয়ে চমকে উঠল সে। তারপর আত্মসম্বরণ ক'রে ধীরে ধীরে নেমে গেল।

শুখন বললে—ভিতরে নিয়ে যা। ঝি। নতুন ঝি একঠো নিয়ে এলাম।

নরসিং নেমে এসে দাঁড়াল।—ভাড়া ?

শুখন বললে—ভাড়া লেও। লেকিন বহুৎ বেলা হইয়েছে, খানাপিনা করো—আস্নান করো।

নরসিং কি ভাবলে। তারপর বললে—আমরা আজ কাল দুটো দিন এখানে থাকতে চাই। একটু জায়গা দেবেন থাকতে ?

শুখন নরসিংয়ের মুখের দিকে তাকালে, তারপর একজন কর্ম্মচারীকে সে বললে—একঠো কামরা দে দেও সিংবাবুকো।

নিতাই বললে—পুকুর কোথা খোঁজ লেন, গাড়ীখানাকে ধুতে হবে তো!

রাম হাঁ ক'রে সব দেখছে। অবাক হয়ে গিয়েছে সে। ভয়ও পেয়েছে সে। গুখনরামের ভুঁড়ি দেখে, কানের চুল দেখে সে হি-হি ক'রে হেসেছে।

* * *

সন্ধ্যার সময় নরসিং এসে বসে ছিল—সেই তে-মাথার মোড়ে। নিতাই এবং রামও সঙ্গে আছে। তে-মাথার মোড়ের পাশে একটা গাছের তলায় এক পাঁইট মদ এবং খানিকটা মাংস নিয়ে বসেছে। নরসিং গম্ভীরভাবে সমস্ত দেখছে, নিতাই মধ্যে মধ্যে মদের গেলাস পূর্ণ ক'রে এগিয়ে দিচ্ছে। নরসিং গেলাস খালি ক'রে নিতাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছে। মধ্যে মধ্যে বলছে—রাম!

রামের কাছে আছে মাংসের পাত্রটা। সে-ই মাংস পরিবেশন করছে; হাড়ীর ছেলে নিতাই মাংসটা ছুঁয়ে নেড়ে সিংজীর হাতে তুলে দিতে চায় না। বলে, আপনারা ছত্রি, বামুনের নিচেই আপনারা।

খানিকটা মাংস রাম দাদাবাবুর হাতে তুলে দিলে।

নরসিং বললে—নিতাইকে দে মাংস।

নিতাই বললে—পাকিয়েছে ভাল মাংসটা। ঝাল একটুকুন বেশি। তা—। হেসে বললে, এ মুখে ঝাল ভাল লাগে।

নরসিং কোন উত্তর দিলে না।

নিতাই তার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বললে—সিংজী!

নরসিং তার দিকে ফিরে চাইলে।

—কি ভাবছেন বলেন তো আপনি?

নরসিং আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে বাদশাহী শড়কের উপর প্রসারিত ক'রে দিলে। ছ্যাকরা গাড়ী চলেছে, টাপর-ছাওয়া গাড়ী চলেছে, মানুষের সারি চলেছে। ছ্যাকুরা গাড়ী আসছে, টাপর-ছাওয়া গাড়ী আসছে, মানুষ আসছে পায়ে হেঁটে।

মদের নেশায় নরসিংয়ের মনে খানিকটা ভাবের ছোঁয়াচ লেগেছে। তার মনে পড়ছে ছেলেবেলায় সে রোজ সকালে ভাঁড়ার-ঘরের দোরে বসে পিঁপড়ের

সারি দেখত। বাড়ির যেখানে যত পিঁপড়ে সব সারি বেঁধে এসে ঢুকত ভাঁড়ার-ঘরে, আবার বেরিয়ে যেত ছোট ছোট এক একটি দানা মুখে নিয়ে। ও ব্যাটাদের বুদ্ধি নাই, থাকলে উঠোন থেকে ভাঁড়ার-ঘর পর্য্যন্ত যদি কেউ একটা পিঁপড়ের মোটর সার্ভিস খুলত—তবে খুব ভাল সার্ভিস চলত।

নিতাই আবার ডাকলে—সিংজী! নরসিং বললে—গাড়ী গোন্ গাড়ী গোন্, যা বলছি তাই কর্।

রাম ছ্যাকরা গাড়ী গুনছে। নিতাইয়ের গণনাশক্তি মন্থর, সে গুনছে টাপর-দেওয়া গরুর গাড়ী। পথের লোক গুনবার দরকার নাই।

নিতাই একটা সিগারেট সিংজীকে দিয়ে নিজে একটা নিলে, দেশলাই জ্বালিয়ে সিংজীকে এগিয়ে দিলে আগুন, নিজে ধরালে, বাক্সটা ছুঁড়ে দিলে রামকে। তারপর হঠাৎ বললে—একটি কথা আপনাকে বলব আমি।

নরসিং তার দিকে ফিরে তাকালে।

—অভয় দিচ্ছেন তো?

নরসিং প্রসন্নভাবে একটু হাসলে।

নিতাই বললে—রাম, গরুর গাড়ীশুদ্ধ গুনবি। সিংজীর সঙ্গে ঝগড়া আছে আমার।

নরসিং আরও একটু হাসলে।

নিতাই বললে—হাসবেন না। নালিশ আছে আমার। সাংঘাতিক নালিশ। হ্যাঁ। সে বলে দিচ্ছি আমি—হ্যাঁ। 'না' বললে শুনছি না আমি।

গম্ভীর ভাবেই এবার নরসিং বললে সর্ব্বশক্তিমান প্রভুর মত—বল্। কি নালিশ তোর শুনি!

নিতাই বললে—বলব?

ব—ল্। বলছি তো।

রাম বড় হয়েছে কি-না?

নরসিং বললে—বড় হল্‌চে ওটা।

নিতাই সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করার মত ঘাড় নেড়ে বললে—একশো বার। হাকিমের মত কথা। ফ্যাক—ফ্যাক—ফ্যাক। হেসেই আছে।

নরসিং বললে—তুই ওকে মদ দেবার কথা বলছিস, কিন্তু বেলেল্লাগিরি করবে ও।

খুন ক'রে ফেলব। কি রে করবি, বেলেল্লাগিরি ?

রামা মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে জানালে, না, বেলেল্লাগিরি সে করবে না।

নিতাই চট ক'রে এক গেলাস মদ ঢেলে নরসিংহকে এগিয়ে দিয়ে বললে—দেন, পেসাদ ক'রে দেন।

নরসিং মদের গেলাসটা হাতে নিয়ে একটু ভাবলে—তারপর বললে—নে, তাই নে। মদ তো খাবিই, আজ হোক আর কাল হোক। যার তার কাছে খাবি, তার চেয়ে আমার কাছে খা। নে। মদের গেলাসে ছোট একটি চুমুক দিয়ে গেলাসটা বাড়িয়ে ধরলে। নে নে। লজ্জা নাই এতে। নে।

সলজ্জ ভাবেই রাম এগিয়ে এসে গেলাসটা হাতে নিলে এবং একটু মুখ ঘুরিয়ে গেলাসটা মুখে তুললে। কিন্তু বাধা দিয়ে নিতাই প্রায় গর্জ্জন ক'রে উঠল, এইয়ো! এই রামা! তর সইছে না উল্লুক কাঁহাকা। লেও, আগাড়ি গুরুজীকে পাঁওকে ধূলা লেও, প্রণাম কর্ বাঁদর।

লজ্জায় জিভ কাটলে রাম। এ বড়ই কসুর হয়ে গিয়েছে। সে প্রণাম করলে নরসিংহকে, পায়ের ধূলো নিলে। নরসিং বললে—খবরদার, মদ খাবি কিন্তু মাতলামি করবি না।

পাঁইট বোতল; দুজনের জায়গায় তিনজন খানেওয়ালা জুটেছে, দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল অথচ নেশা এখনও জমে নাই। সংসারটা নিতাইয়ের কাছে এখনও উদাস মনে হচ্ছে না। সেই বললে, গুরুজী! আর এক পাঁট আনি।

নরসিংয়েরও এখনও জমে নাই। মেঠো পথে গাড়ী চালিয়ে এসে শরীরের

অবসাদ এখনও যায় নাই। সে রামের দিকে তাকিয়ে তাকে ভাল ক'রে দেখে নিলে। নাঃ, রামা ঠিক আছে। ছোঁড়াটা সিদ্ধি খেয়ে হাসে, মদ খেয়ে গম্ভীর হয়েছে। হাজার হোক ছত্রির বাচ্চা!

গুরুজী!

হুঁ।—আর এক পাঁট চাই।

নিয়ে আসি। নিতাই উঠল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে নরসিং বললে, চল্ সবাই যাব। দোকানে বসে খাব। ব'স্, হিসেবটা করে নিই। রামা, তোর ঘোড়ার গাড়ী ক'খানা?

'ঘোড়ার গাড়ী? ক'খানা? রাম শঙ্কিত হ'ল, মদ খাওয়ার পর আর তার গুনতে মনে নেই।

নরসিং আবার প্রশ্ন করলে—গুনতে ভুলে গিয়েছিস বুঝি?

আটখানা পর্য্যন্ত গুনেছি।

গরুর গাড়ী?

নিতাই জবাব দিলে, সে অ্যানেক। চলছেই—চলছেই—কুড়ি পঁচিশখানা তো খুব।

এতেই নরসিংয়ের হবে। এর চেয়ে সঠিক হিসেব সে কল্পনা করতে পারে না। চার আটে বত্রিশ, কুড়ি দুগুণে চল্লিশ। বত্রিশ আর চল্লিশে—বাহাত্তোর। হুঁ। নিতাইয়ের দিকে চেয়ে নরসিং বললে—চলবে। বুঝলি রে নিতাই, চলবে।

নিতাই হাসলে পাকা সমঝদারের মত। হেসে বললে, সে আমি বুঝেছি। তেমাথায় এসে যখন গাড়ী গুনতে বলেছেন—তখুনই বুঝেছি। না বললেও বুঝে নিয়েছি। পাঁচমতি পর্য্যন্ত সারবিস?

নরসিং বললে—চল্ এবার দোকানে যাই। সহরের সার্ভিসের বাস ট্যাক্সি সব এতক্ষণ এসে গিয়েছে। ড্রাইভারেরা সব ওখানেই আসবে। চল্।

নিতাই হেসে বললে—পেরথমে আমি কি মনে করেছিলাম জানেন?

নরসিং ভাবতে‌ভাবতেই চলেছে, এ সব কথায় কোন আসক্তি নাই তার, কোন আকর্ষণ সে অনুভব করেছে না। ভাবছে সে অনেক কথা। আট মাইল পথ, যাওয়া-আসা এক ট্রিপ ষোল মাইল। এক গ্যালন তেল। ঘোড়ার গাড়ীর শেয়ার আট আনা। প্রথমে আট আনার চেয়ে বেশি ভাড়া করলে চলবে না। ন-আনাও চলতে পারে। মোটরে চড়ার ইজ্জৎ, তাড়াতাড়ি যাওয়া, আরামের জন্যে এক আনা দেবে না লোকে? পরক্ষণেই মনে হ'ল, না, দেবে না। প্যাসেঞ্জারদের অধিকাংশই কোর্ট প্যাসেঞ্জার। জমিদারের গমস্তা, মহাজনের কর্ম্মচারী, চাষী রায়ত, দেনদার গৃহস্থ। জনকতক কোর্টের কেরানীও আছে। বাড়িতে খেয়ে তারা ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে। আধ পয়সায় বিড়ি কেনে, দু-পয়সার বেগুনী ফুলুরী কিনে ঠোঙায় নিয়ে চায়ের সঙ্গে খায়। তারা কখনও এক আনা বেশি দেবে না। দেবে যখন নিরুপায় হবে, যখন ঘোড়ার গাড়ী আর থাকবে না, তখন দেবে। ঘোড়ার গাড়ীগুলোর সঙ্গে প্রথমে একবার লাগবে রেষারেষি। ওরা শেয়ারের দাম নামাবে। আট আনা থেকে সাত আনা—ছ আনা। চার আনাতেও নামতে পারে। তখন?

মনে পড়ে গেল মেজবাবুকে।

মেজবাবুই প্রথম মোটর বাস কিনে ইমামবাজার থেকে জংশন স্টেশন পর্য্যন্ত সার্ভিস খুলেছিলেন। ছোট রেলের সঙ্গে কম্পিটিশন দিয়ে বাস চালিয়েছিলেন। এই যাত্রী গণনা করার পদ্ধতি তাঁরই কাছে শিখেছিল নরসিং। পনের দিন নরসিং স্টেশনে গিয়ে প্রত্যেক ট্রেনের যাত্রীসংখ্যা গুনে আসত। রেলকোম্পানীও বাস সার্ভিসকে জব্দ করবার জন্য ভাড়া কমিয়েছিল, মেজবাবুও কমিয়ে ছিলেন। দরকার হয়, সেও ভাড়া কমাবে।

নিতাই অনেকক্ষণ থেকে কথা বলবার জন্য উসখুস করছে। সে বললে—গুরুজী!

হুঁ।

খুব সরস করে নিতাই মৃদুস্বরে বললে—পেরথমে আমি কি ভেবেছিলাম

জানেন? ভেবেছিলাম, মেয়েটার ওপর আপনার টান পড়ে গিয়েছে। সেই টানে বোধ হয় থেকে গেলেন।

নরসিং এবার চঞ্চল হয়ে উঠল। মুহূর্ত্তে তার মন ঘুরে গেল, মনে পড়ে গেল মেয়েটিকে। মেয়েটির মুখের আশ্চর্য্য হাসিটুকু চোখের উপর ভেসে উঠল। তার বিপত্নীক জীবনের উত্তাপ মুহূর্ত্তে যেন আগ্নেয়গিরির গর্ভের অবরুদ্ধ উত্তাপের মত অকস্মাৎ বৃদ্ধি পেয়ে তাকে চঞ্চল অস্থির করে তুললে। নিতাইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে সে বললে—বোতলটা দেখি।

নিতাই বললে—না কিনলে তো নাই। চলুন দোকানে চলুন।

রাম এবার এগিয়ে এল। নরসিংকে শুনিয়ে নিতাইকে সে বললে—কাল আমি ঠিক সাওজীর বাড়ীতে ঢুকে পড়ব। মেয়েটাকে বলব—রাত্তিরে দরজা খুলে চলে এস। মোটর রেডী করে রাখব। বাস্। মার পাড়ি। রামের সাহস বেড়ে গিয়েছে আজ, মাথা চনচন করছে। দাদাবাবুর জন্য সে জান দিতে পারে আজ। আস্ফালন করে সেই কথাটা সে জানিয়েও দিলে—জান যায়—সে ভি আচ্ছা।

শহরের ভেতরে এসে পড়েছে তারা। নরসিং বললে, মেলা বকিস না রাম। চুপসে চল্।

ব্যবসা আছে শহরটাতে। রবি ফসলের আড়ৎ। এ অঞ্চলের রবি ফসল এইখানে এসে জমা হয়, এখান থেকে চালান যায় দেশ-দেশান্তরে। বড় বড় গদীর সামনে অনেকটা পরিমাণে খোলা জমি, সেই খোলা জমিতে গরুর গাড়ীর ভিড় জমে গিয়েছে। গাড়ীর মুখ থেকে পিছন পর্য্যন্ত বস্তা বোঝাই। দোকানে পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বলছে।

তারা এসে পড়ল মোটর বাসের ডিপোয়। এখানেও একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। সামনে একটা সেড। সেই সেডের মধ্যে মোটর বাস রেখেছে পাঁচখানা। দুখানা ট্যাক্সি। এগুলো যায় সদর শহর পর্য্যন্ত। খুব লাভের সার্ভিস এটা। মোটরের দোকানটা নেহাৎ ছোট। আসল দোকান ওদের

শহরে। এখানে কিছু পেট্রোল মোবিল রাখে মাত্র। বাকী যা দরকার হয় আনিয়ে নেয় শহরের দোকান থেকে। বৈকালে তেমাথায় যাবার আগে সে এখানে এসে দোকানের কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে গিয়েছে। ফ্যানবেল্টিংয়ের দরকারও ছিল, তারটা পুরানো হয়েছে, সেই উপলক্ষ্য ক'রে দোকানটা দেখে গিয়েছে বেশ ভাল ক'রে। এখনও সে আবার একবার দাঁড়াল।

নিতাইয়ের মন ছুটছে মদের দোকানের দিকে। সে তাগিদ দিয়ে বললে—বাজে দোকান, কিছু মেলে না। চলুন চলুন। ওদিকে আবার দোকান বন্ধ হ'য়ে যাবে।

নরসিং অগ্রসর হ'ল।

মদের দোকানে শেষ আসরের ভিড় জমে গিয়েছে। দোকান বন্ধ হবে। নাকে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ভদ্রবেশী খরিদ্দার আসছে। অনেকে অবশ্য বেপরোয়া, ঢাকাঢাকির ধার ধারে না। গমস্তা, আমমোক্তারদের দেখলেই চেনা যায়। পকেটে ক্লিপ আঁটা পেন্সিল, কারও বা সস্তা ফাউণ্টেন পেন, কাগজে নোটবুকে মোটা পকেট, কথাবার্ত্তার মধ্যে আইনের ধারা চলছে। নরসিং খুঁজছিল জামায় কাপড়ে কালি, গ্রিজ, মোবিলের দাগ—দোকানের মদের গন্ধেও নিশ্বাস নিয়ে খুঁজছিল—মোবিল পেট্রোল মেশানো অতিপরিচিত বিচিত্র গন্ধ। ব্যাকব্রাস করা লম্বা রুক্ষ চুল, রুক্ষ কঠিন মুখ, পাকানো গোঁফ খুঁজছিল। ভিড়ের মধ্যে থেকে ঠিক খুঁজে বার করল সে পাঁচজনকে। আলাপ করবার পথ সহজ। প্রশ্ন করলে—সকালে মোটর কখন ছাড়ে বলুন তো?

সাড়ে সাতটা।

ঠিক সাড়ে সাতটা?

টাইম সাতটা পচিশ, তবে হয় সাড়ে সাতটা—পৌনে আটটা—শহরে ঘুরে প্যাসেঞ্জার নিতে সময় লাগে তো?

এখানে ফ্যানবেল্ট পাওয়া যাবে কি-না বলতে পারেন?

ফ্যানবেল্ট? সবিস্ময়ে লোকটি তাকালে তার দিকে। ফ্যানবেল্ট নিয়ে— আপনি কি?

আমি ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি এখানে। নরসিং বললে—ইমামবাজার থেকে ভাড়া নিয়ে এসেছি।

বসুন বসুন।

আপনারাও তো মোটর সার্ভিসে কাজ করেন? হাসলে নরসিং।

বসল সকলে জমিয়ে। রসিদ মিয়া, জাফর সেখ, রামেশ্বরপ্রসাদ, জীবন, তারক এরা ড্রাইভার। পাগলা, ন্যাড়া, ন্যাপলা, ফটকে, হাফিজ এরা ক্লীনার। ক্রিশ্চান জোসেফ, সে এস-ডি-ও'র ড্রাইভার। জোসেফ রজনী দাস! সব চেয়ে তার জোসেফকেই ভাল লাগল। রসিদ জাফরদের সঙ্গে জোসেফের পার্থক্য থাকারই কথা। বাস-ট্যাক্সী ড্রাইভারে আর প্রাইভেট গাড়ীর ড্রাইভারে তফাত থাকবেই। তার উপর জোসেফ এস-ডি-ও'র ড্রাইভার, চারজন এস-ডি-ও পার করলে জোসেফ। মধ্যে একজন এস-ডি-ও ড্রাইভার সঙ্গে এনেছিলেন—তখন সে ডি-এস-পির কাছে কাজ করেছিল। জোসেফ খুব ভদ্র, মিষ্টি হাসিমুখ—অথচ গম্ভীর। গেলাসের মদ সে অল্প অল্প করে খাচ্ছিল; রসিদ জাফর এদের কিন্তু একটা গেলাস বড় জোর দু-চুমুক। রসিদ তারক এরা দুজনে মদ খেলেই মারপিট করতে চায়, ওদের কয়েকটা কথা শুনেই এবং হাতকাটা খাকী সার্টের হাতা না থাকা সত্ত্বেও—আস্তিন গুটানোর ভঙ্গিতে কব্জি থেকে কনুই পর্য্যন্ত হাতের উপর হাত বুলানো দেখেই নরসিং সেটা বুঝতে পারলে। জাফর গুম হয়ে বসে আছে। পথের জনতার দিকে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ। লোক চলছে—জাফর দেখছে—কিন্তু দৃষ্টি নিরাসক্তির মধ্যেও স্পষ্ট একটা সন্ধানের লোলুপতা রয়েছে। সে খুঁজছে স্ত্রীলোক। সে কথা বুঝতে নরসিংয়ের এতটুকু বিলম্ব হ'ল না। রামেশ্বর সব চেয়ে ভয়ানক। ঠোঁটের একটা দিক অনবরত টানা ওর অভ্যাস। একটা ধারালো ছুরি দিয়ে নখ কাটছে। ওটা ও চালাতে অভ্যস্ত—

এতে নরসিংয়ের সন্দেহ রইল না। জীবনটা ক্রমাগত অশ্লীল-অশ্রাব্য কথা ব'লে চলেছে।

রামেশ্বর নরসিংকে বললে—তাসের বাজী খেলবেন? চলিয়ে না।

লোকটা শুধু ছুরিবাজ নয়—জুয়াড়ীও। নরসিং উঠে পড়ল, না। আচ্ছা, রামরাম। সেলাম।

বেরিয়ে এল সে দোকান থেকে। জোসেফ সঙ্গে এসে বললে—ভাল করেছেন। লোক ভাল নয় রামেশ্বর। আপনি বিদেশী—

হেসে নরসিং বললে—বিদেশী নই। গিরবরজার সিং আমি। এখানে হাঁক দিলে আমারও বিশ আদমী বেরিয়ে আসবে।

গিরবরজা? গিরবরজার সিং আপনারা?

হাঁ। নরসিং একবার দুই হাতের তালু দিয়ে গোঁফের দুই প্রান্ত মুছে—উপরের দিকে ঠেলে দিলে।

জোসেফ বললে—আমাদের বাড়ী ছিল এক সময় গিরবরজা।

গিরবরজা বাড়ী ছিল? আশ্চর্য্য হয়ে গেল নরসিং।

আমার ঠাকুর্দ্দার বাবা এখানে এসে ক্রীশ্চান হয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল প্রাণকৃষ্ণ দাস। একটু চুপ ক'রে থেকে সে হেসে বললে—তিনি জাতে ছিলেন হাড়ি।

স্তম্ভিত হয়ে গেল নরসিং। তাদের গাঁয়ের হাড়িদের মনে পড়ে গেল। তাদের গাঁয়ের হাড়ির ছেলে এই জোসেফ।

জোসেফ সিগারেট বার করে নরসিংকে দিলে। নরসিং বাঁ হাতে জোসেফের ডান হাতখানা চেপে ধরলে। তার মনে হ'ল জোসেফ তার পরমাত্মীয়। হঠাৎ সে বললে—আচ্ছা বল দেখি—বলুন দেখি—এখান থেকে পাঁচমতী পর্য্যন্ত যদি সার্ভিস খুলি—তো চলবে কি-না?

পাঁচমতী? শ্যামনগর থেকে পাঁচমতী?

হাঁ।

হঠাৎ আপনার এ ঝোঁক হ'ল কেন? আপনাদের ইমামবাজার থেকে জংসন হ'য়ে সদর পর্য্যন্ত সার্ভিস তো খুব ভাল।

নরসিং চুপ করে রইল।

জোসেফ বললে—রাস্তা তো মোটে আট মাইল—এইটুকু পথে—। ভাবতে লাগল জোসেফ।

নরসিং দাঁড়াল থমকে। বললে, এইখান থেকে ভাঙব আমি। ভেবে দেখবেন। কাল আবার দেখা করব।

জোসেফ প্রশ্ন করলে—রয়েছেন কোথায়?

শুখনরাম সাহুর গদীতে।

শুখনরাম সাহু?

হাঁ।

জোসেফ একটু চুপ করে রইল—তারপর বললে, আচ্ছা, কাল কথা হবে। আচ্ছা, নমস্কার।

রাম বললে—দেখুন কোথা থেকে আপন লোক বেরিয়ে গেল।

নরসিং আবার ভাবনার মধ্যে ডুবে গিয়েছে।

নিতাইও যেন কিছু ভাবতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ সে প্রশ্ন করলে—হাড়ির ছেলে?

উত্তর দিলে না নরসিং।

আট মাইল পথ মাত্র। সার্ভিসে অসুবিধা আছে। আট মাইল পথ লোকে হাঁটতে পারে, ঘোড়া গরু একটানে চলতে পারে। পথ যত দূর হয়—তত ওরা অপারগ হয়—কলের কদর তত বাড়ে। আট মাইল পথে ঘোড়ার গাড়ীর লাগে দেড় ঘণ্টা। নটার সময় পাঁচমতী ছাড়লে সাড়ে দশটায় শ্যামনগর। মোটরে আধ ঘণ্টা। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ী যদি ভাড়া চার আনায় নামায় তবে চার আনা পয়সার জন্যই লোকে ওই দেড় ঘণ্টা আগেই যাবে। তার চোখের উপর ভেসে উঠল বাদশাহী শড়ক। কত দূর চলে গিয়েছে। এই শড়কে

বর্দ্ধমান জেলার দিকে গেলে রেললাইন পাওয়া যায় তিরিশ মাইল দূরে। কত যাত্রী, কত গাড়ী, কত মাল আসছে—যাচ্ছে। বিরাম নাই। তার যদি কলমের জোর থাকত তবে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডকে কলমের খোঁচায় ঘায়েল ক'রে—এ রাস্তা মেরামত করতে বাধ্য করত। আর থাকত যদি টাকা, চারখানা বাস কিনবার পয়সা—তবে শ্যামনগর থেকে পাঁচমতী হয়ে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সার্ভিস খুলত। সার্ভিস খুলবার কত লাইন পড়ে আছে। পথ নাই। রেলকোম্পানী মাঠের মধ্য দিয়ে পথ তৈরী করে লাইন নিয়ে গিয়েছে হরিদ্বার পর্য্যন্ত, দিল্লী লাহোর পেশোয়ার পর্য্যন্ত, বোম্বাই পর্য্যন্ত, মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত; সবশেষে হঠাৎ ভূগোলে পড়া কুমারীকা অন্তরীপ—রামেশ্বর তীর্থের কথা মনে পড়ল—রামেশ্বর পর্য্যন্ত রেললাইন নিয়ে গিয়েছে। হাজারে হাজারে লাখে লাখে লোক চলেছে। পথ থাকলে, টাকা থাকলে সে খুলত অমনি সার্ভিস শ্যামনগর থেকে কলকাতা। কলকাতা থেকে বোম্বাই।

নিতাই বললে—সিংজী! এ লোকটা কিন্তু খুব চালবাজ বটে। হাড়ি থেকে খ্রীষ্টান হয়েছে কি-না, চালটা খুব মেরে গেল।

নরসিং বললে—না। ছোকরা লোক ভাল। ওর কাছে অনেক কাজ পাওয়া যাবে।

নিতাই বললে—বলুক মশায় ও। খুলে দেন সারবিস্ আপনি। হ্যাঁ।

নরসিং বললে—হ্যাঁ, সার্ভিস আমি খুলব। যা থাকে কপালে।

কপাল আপনার ভালই। ভেবে দেখেন আপনি। রোজকার-পাতি বন্ধ ক'রে বাড়ী যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পথে ভাড়া মিলে গেল। বিশ-মাইল পথ বড় জোর—ভাড়া পঞ্চাশ টাকা এসে গেল। এ আপনার মা-লক্ষ্মী ডেকে এনে আপনাকে লাইন দেখিয়ে দিলেন।

কথাটা নরসিংয়ের মনে ধরল। নিতাই খুব ভাল বলেছে। কথাটা সে এমন ভাবে ভেবে দেখে নাই। ওখানকার এস-ডি-ও'র উপর নিষ্ফল ক্ষোভে সে স্থির করেছিল, আর সে এই ছোট কাজ করবে না। ছোট কাজ, যে কাজে

এমনি ভাবে লাঞ্ছিত হতে হয় সে ছোট কাজ ছাড়া আর কি? সে ভেবেছিল, গাড়ীখানা বেচে দিয়ে পূর্ব্বের মজুত আর এই গাড়ীর টাকা নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে জমি কিনবে কিছু, আর করবে মহাজনী। সুদের ব্যবসা। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়েছিল তার দিদিয়াকে। মা মরে গিয়েছে, জেঠারা মরেছে, দিদিয়া বুড়ী আজও বেঁচে আছে, তাকে মোটর গাড়ীটা দেখাবে, তাকে একবার চড়াবে গাড়ীতে—এই বলেই সে গাড়ীখানা নিয়ে চলেছিল গিরবরজা; আরও দেখাতে ইচ্ছে ছিল তার ক্ষ্যাপা মাধবজেঠাকে, গ্রামের লোককেও দেখাতে ইচ্ছে ছিল। মোটরখানাই তো তার কীর্ত্তি! তাদের বিস্ময়বিস্ফারিত চোখ কল্পনা ক'রে সে মনে মনে খুশি হয়েছিল।

পথে হঠাৎ ওই শুখনরামের গাড়ী উল্টে গেল। শুখনরামকে অক্ষমতার লজ্জায় লজ্জিত করবার জন্যই সে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া হেঁকেছিল। শুখনরাম তাই দিয়ে তাকে নিয়ে এল। পথে আসতে আসতে তার চোখ খুলে গেল।

লক্ষ্মীমন্ত শুখনরাম। সেই মেয়েটি। ঠোঁটের কোলে তার সেই আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম হাসি। ওই হয়তো তার ভাগ্যলক্ষ্মী। ছেলেবেলায় দিদিয়ার কাছে গল্পে সে ভাগ্যলক্ষ্মীর কথা শুনেছে। রাজার ভাগ্যলক্ষ্মী সর্ব্বাঙ্গে তাঁর মণি-মুক্তার আভরণ ঝলমল করছে, পরনে তাঁর সোনার সূতায় বোনা কাপড়, বিপদে সম্পদে রাজাকে এসে দেখা দিতেন। সে মোটর চালায়, সকাল ইস্তক রাত্রি পর্য্যন্ত দুনিয়া তার চারপাশে পাক খায়, গরমে হাঁটু থেকে পা পর্য্যন্ত ঝলসে যায়, পেট্রোলের গন্ধে কলিজা ভরে যায়, শীতের দিনের দরজা জানালা বন্ধ কেরোসিনের ধোঁয়ায় ভরা চোর-কুঠরীর মত, তার ভাগ্যলক্ষ্মী যদি ওই মেয়েটি হয়—তবে সেও তার জোর নসীব বলতে হবে। খুলবে সে সার্ভিস। শ্যামনগর-পাঁচমতী ট্যাক্সী সার্ভিস। তারপর দেখা যাবে। ছোট নদীটা পার হয়ে বাদশাহী সড়ক ধরে—

বাজারের এ পথটা শেষ হ'ল একটা চৌমাথায়। বাঁ দিকে তাদের পথ।

ঐ পথটা অন্ধকার। কাঠের আড়তে, কয়লার ডিপোতে কেরোসিনের ডিবিয়া জ্বলছে, দোকানে হ্যারিকেন।

নরসিং বললে—বাতি কিনে নে নিতাই। ছুটো।

ছয়

মদের নেশার উপর কল্পনার উত্তেজনায় নরসিংয়ের ঘুম এল না। চিন্তার আগুন মাথার মধ্যে যেন আজ রাবণের চিতার মত অ-স্তমিত এবং অনির্ব্বাণ হয়ে উঠেছে।

রাম এবং নিতাই দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

মদ খেয়ে নিতাইয়ের অবস্থাটা হয়—পুকুর থেকে বেরিয়ে নদীতে-পড়া মাছের মত; সব আড়ষ্টতা কেটে গিয়ে সে অতিমাত্রায় সহজ এবং সুস্থ হয়ে ওঠে। ক্ষুধা খোলে, তৃপ্তির সঙ্গে খায়, তারপরই বিছানাটি পেড়ে একটি বিড়ি ধরিয়ে "কালী দুর্গা শিবো হরি, জয়ো জয়ো মুকুন্দ মুরারি, জয় বাবা বুড়ো শিব, জয়ো মাতা মঙ্গলচণ্ডী" বলে শুয়ে পড়ে। মিনিটখানেক পরেই মৃদু নাসিকা-ধ্বনির আভাস পাওয়া যায় তার শ্বাস-প্রশ্বাসে। আরও মিনিট খানেক পরে সশব্দ হয়ে ওঠে রীতিমত। ট্যাক্সি নিয়ে ভাড়ায় গিয়ে অনেক সময় অনেক রাত্রিই পথে কাটাতে হয়, সেখানে গাছতলায় শিকড়ে মাথা দিয়ে মাটির উপরে শুয়েও ঠিক এমনি ঘুম ঘুমায় সে। মদ না পেলেই সে আরামের বিছানায় শুয়েও চার প্রহর রাত্রির অন্তত আড়াই প্রহর জেগে থাকে, পাশ ফেরে আর মৃদুস্বরে ডাকে—ঘুমুলেন নাকি সিংজী? রামা রে!

রামাটা সাধারণতই ঘুমকাতুরে। আজ কিন্তু প্রথমটা সে অন্য রকম শুরু করেছিল। নেশায় বকতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু অত্যন্ত অকস্মাৎ লজ্জাবতী লতা যেমন স্পর্শ পেলে প্রায় মুহূর্ত্তের মধ্যে এলিয়ে যায়, ভেঙে প'ড়ে—তেমনি

ভাবে ঘুমিয়ে পড়ল। বকছিল, সহসা এক সময় কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চুপ করলে; তারপর দু'চারটি কথা বললে মৃদুস্বরে, তারপরই চুপ ক'রে গিয়েছে। হাঁ ক'রে ঘুমুচ্ছে।

দুটো বাতির একটা জ্বলছে। প্রায় আধখানা পুড়ে এসেছে।

মদের নেশায় বড় বড় চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে, স্থিরদৃষ্টিতে চোখ চেয়ে নরসিং বসে আছে। তাদেরই গ্রামের হাড়ির ছেলে ওই জোসেফ। আজ কে বলতে পারে সে কথা! লোকটার কথাবার্ত্তা চালচলন রীতিমত ভদ্রলোকের মত। আর সে হ'ল গিরবরজার সিংহবাড়ির ছেলে। তার পূর্ব্বপুরুষ ওই ওদের ছায়া মাড়াতে ঘৃণা করত। তাঁদের উচ্ছিষ্ট ওরা প্রসাদ বলে খেত। ওরা সিংহবাড়ির নোংরা ময়লা পরিষ্কার করত। ভাবতে ভাবতে নরসিং রীতিমত হিংস্র হয়ে উঠল। এই ঘরের মধ্যে সে হিংস্রতা বিচিত্র রূপে তার মনে আত্মপ্রকাশ করলে। হঠাৎ তার মনে হ'ল—হাঁ করে রামা ঘুমুচ্ছে, ওর গলাটা টিপে ধরলে কি হয়? তার জীবনের একটা পোষ্য, তার স্ত্রীর ভাই। স্ত্রী মরে গিয়েছে ওর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কি?

তার স্ত্রী ছিল তার মামীর ভাইঝি!

মামীকে প্রথমজীবনে সে ভয় করত, তারপর তার উপর নরসিংয়ের বিজাতীয় আক্রোশ জন্মেছিল। খানিকটা সেই আক্রোশের বশেই সে মামীর ভাইঝিকে বিয়ে করেছিল।

বাবুদের বাড়িতে ভাতের বন্দোবস্ত ক'রে তাকে তার মামা ইমামবাজারে রেখে এল। ওদিকে তার মামী গোপনে লোক পাঠিয়ে নিয়ে এল তার ভাইঝিকে। তার এই রোগা শরীরে সে আর একা পারছে না, একজন সাহায্য করবার লোক চাই, সেবা করবার লোক চাই।

বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মামীর উপর খানিকটা আক্রোশ, খানিকটা বাবুদের বাড়ীর মেজবাবুর দৃষ্টান্তে তার মনে অঙ্কুরিত হয়ে উঠল অত্যন্ত ক্রূর একটি বাসনা।

মেজবাবু ছিল ঝড়। তাকে সে যত ভালবাসে, তত ঘৃণা করে, তত ভয় করে। মেজবাবুর কথা মনে হ'লেই সে মনে মনে বলে—সেলাম হুজুর। সঙ্গে সঙ্গেই অকারণে রাম অথবা নিতাইকে কঠিন আক্রোশে গাল দিয়ে ওঠে, শূয়ার কি বাচ্চা কোথাকার!

নিতাই বলে, কি? রাম ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে মুখের দিকে। নরসিং গভীর মনোযোগ দেয় হাতের কাগজের উপর। কখনও বা নিতাইকে উত্তর দেয়, কিছু না।

মেজবাবু ছিল ঝড়।

বছর দেড়েক পরে হঠাৎ একদিন এল সেই মোটর বাইকে চেপে। ইমামবাজারে নতুন ক'রে কয়লার ডিপো খোলা হবে; কয়লার ব্যবসার ভার মেজবাবুর উপর; কয়লার ব্যবসা বাড়ানো হবে। কলকাতা আপিস থেকে ব্যবস্থা ক'রে দু'তিন গাড়ী কয়লাও পাঠানো হয়ে গিয়েছে। 'বিলটি' অর্থাৎ রেল-রসিদ সঙ্গে নিয়ে এসেছে মেজবাবু। মেজবাবু মোটর বাইক থেকে নেমে মাথার টুপিটা এমন কায়দা করে ছুঁড়ে দিলে যে, চাকার মত পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে টেবিলটার উপরেই চুপ করে গিয়ে বসে গেল। তারপর হাঁকলে, গাড়ীটা ওঠা রে।

সন্ধ্যাবেলা নরসিংয়ের ডাক পড়ল। ইজিচেয়ারে মেজবাবু বসে আছে। এক হাতে বিলিতী মদের গ্লাস অন্য হাতে সিগারেট্, মদের গ্লাসটা বাঁ হাতে ছিল। আজও নরসিং যখন মদ খায় তখন বাঁ হাতে ধরে মদের গ্লাস, ডান হাতে থাকে সিগারেট। বড়বাবু তাকিয়ার উপর বুক দিয়ে শুয়েছিল; তার গ্লাসটা সামনে নামানো ছিল। আশ্চর্য্য; দু ভাই একসঙ্গে বসে মদ খেত।

মেজবাবু বললে, তোকে আর পড়তে হবে না। কয়লার ডিপোতে] থাকবি তুই। বুঝলি?

সেদিনও নরসিং মনে মনে পড়ার স্বপ্ন দেখত। লেখাপড়া যেমন ক'রে হোক শিখবে, মানুষ হবে। দিদিয়া যে বলত, মানুষের মনের :মধ্যে অজগরের

মাথার মণির মত যে 'মতি'—গজমতির চেয়েও যা দুর্লভ, যা হারিয়ে গিরবরজায় সিংহদের এই দুর্দ্দশা, তাকেই সে ফিরিয়ে আনবে। যে 'মতি' অন্ধকারের মধ্যে চাঁদের মত আলো দিয়ে পথ দেখায়, যে 'মতি' হাতে থাকলে জল দু'ভাগ হয়ে পথ দেয়, দিদিয়া বলছে সে 'মতি' ফিরে পাওয়া যায়—লেখাপড়া শিখে মানুষ হ'লে। লেখাপড়াটা অবশ্য তার কাছে অত্যন্ত কঠিন ঠেকছে, এখনও পর্য্যন্ত কিছুতেই বইগুলোর ভিতরের জিনিসগুলি আয়ত্তে আনতে পারছে না। প'ড়ে বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না বলে প্রাণপণে চীৎকার ক'রে সে মুখস্থ করতে চায়। তার পড়ার চীৎকারে পাড়ার লোকে বিরক্ত হয়; অনেকে তিরস্কার করে, সে তা অম্লানবদনে সহ্য করে। কিন্তু আজকের মুখস্থ কাল ভুলে যায়, এই তার দুঃখ। তবু সে আশা ছাড়ে নাই। দেড় বৎসর বাবুদের বাড়িতে রয়েছে, এর মধ্যে ছ'মাস অন্তর তিনটে পরীক্ষা হয়েছে, কোনটাতেই সে পাস করতে পারে নি। চতুর্থ বারের পরীক্ষায় পাস করবার জন্য এবার সে উঠে-পড়ে লেগেছে। ভেবেছিল মেজবাবু এলে তাকে সে ধরবে, তিনি বলে দেবেন তাঁদের ইংরাজী-নবীশ কেরানীবাবুকে—সে লেখাপড়ার একটু আধটু বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু মেজবাবুর মুখে উল্টো কথা—পড়া ছেড়ে চাকরী করার কথা শুনে তার বুকের ভিতরটা চমকে উঠল।

মেজবাবু গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বললে—বুঝলি? এক চুমুকে গ্লাসের প্রায় অর্দ্ধেকটা শেষ হয়ে গেল। সেদিনের ছবি স্পষ্ট ভাসছে নরসিংয়ের চোখের উপর। চুমুক দিয়ে মেজবাবু মুখ দিয়ে খানিকটা নিশ্বাস ছাড়লে; বিস্বাদের কটুতা এবং গন্ধের উগ্রতা খানিকটা বেরিয়ে যায় এতে।

বড়বাবু বললে—একটু একটু সিপ কর। এভাবে ঢক ঢক ক'রে খেয়ো না।

মেজবাবু সিগারেটে টান দিয়ে বললে—সাপের ছুঁচো খাওয়ার মত একটু একটু ক'রে গেলা ও আমার পোষায় না।

বড়বাবু হেসে বললে—সাপে ইঁদুর খায়, ছুঁচো খায় না।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মেজবাবু বললে—এক্সকিউজ্ মি। ওটা আমার

ইচ্ছাকৃত ভুল। ইঁদুরের গায়ের গন্ধ নাই। এ বস্তুটার গন্ধের সঙ্গে মিল রাখবার জন্যে ছুঁচো বলেছি। এবং সাপে যখন একবার কোন জিনিষ ধরে তখন নাকি ওগরাতে পারে না। ছুঁচো হ'লেও খেতে হয়। এও তাই। ওয়াইন্—উয়োম্যান্—

বড়বাবু বাধা দিয়ে বললে—স্টপ। চোখের ইঙ্গিতে বড়বাবু নরসিংকে দেখিয়ে দিলে।

আই সি। নরসিংয়ের দিকে তাকিয়ে মেজবাবু গ্লাসে চুমুক দিয়ে বাকীটা শেষ ক'রে বললে—এখানে নতুন ক'রে কয়লার ডিপো হচ্ছে, সেই ডিপোতে তোর চাকরী হ'ল। বুঝলি?

নরসিংয়ের হৃদ্স্পন্দন আবার সভয়ে দ্রুতগতি চলতে আরম্ভ করলে।

আবার মেজবাবু বললে—বুঝেছিস?

সহজ কথা, তবু নরসিং নির্ব্বোধের মত প্রশ্ন করলে—আজ্ঞে? ঐ ভঙ্গির মধ্যেই নিহিত ছিল তার অতি দুর্বল এবং ভীত চিত্তের অস্বীকারের ভাব।

মেজবাবু কিন্তু এটা ভাবতে পারে না, তার কথা কেউ, অন্তত তার অনুগৃহীতের মধ্যে কেউ, অস্বীকার করতে পারে এটা তার কল্পনারও অতীত। সে এটাকে সম্মতি ধরে নিয়েই বললে—হ্যাঁ। কাল সকালেই যাবি আমার সঙ্গে। কাজকর্ম্ম আমি বুঝিয়ে দেব। প্রথম কিছুদিন আরও একজন ওয়াকিবহাল লোক থাকবে, সে ডিপো চালু ক'রে দেবে। ভয় নাই তোর।

নরসিং এবার সাহস সঞ্চয় ক'রে বললে—পড়ার কি হবে?

পড়া? মেজবাবুর কপাল ভ্রূ খানিকটা কুঁচকে উঠল, ঠোঁটের এক পাশ ঈষৎ বেঁকে খানিকটা ধারাল হাসি বেরিয়ে এল।

বড়বাবু প্রশ্ন করলে—তুই পড়বি? তিনটে পরীক্ষার একটাতেও তুই পাশ করতে পারিস নি। তোকে পড়ার জন্যে ভাত—

হাতের ইসারা ক'রে বড়বাবুকে থামিয়ে দিয়ে মেজবাবু বললে—দেখ,

বাঁদরকে শেখালে সে কসরৎ ক'রে বাজী দেখাতে পারে, কিন্তু গাধাকে ঠেঙিয়ে মারলেও মোট বওয়া ছাড়া গাধাকে দিয়ে আর কিছু হয় না।

নরসিংয়ের মনে হ'ল, জেঠা মাধব সিংয়ের লাঠির চেয়েও মেজবাবুর কথা ভয়ানক।

মেজবাবু বললে—লেখাপড়ায় তুই গাধা। ও তোর হবে না। শেষ পর্য্যন্ত চাপরাশীগিরি করবি। মোট বইতে হবে তোকে। তার চেয়ে ডিপোর কাজ শেখ্। এর পর গলার স্বর পালটে গেল মেজবাবুর, বললে—যা, যা বললাম তাই করতে হবে।

অসহায়ের মত নরসিং চলে এল।

উপায় ছিল না। গির্‌বরজায় বাড়িতে শুধু জেঠা মাধব সিং নয় বাবা পর্য্যন্ত তার মুখ দেখবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। ধরণী রায় হতে পারে তার মামা, কিন্তু মানে অনেক ছোট। বাড়ি থেকে পালিয়ে সে তার বাড়ি ভাত খায় পোষ্য হয়, তারপর সে বাবুদের বাড়ি বিনা মেহনতে নিমক খায়, দেনো ভাত খায়; তার মুখ কি দেখতে হয়—না, আছে?

নরসিং শুনেছে মাধব সিং বলে—মর্ গেয়া, উ বাচ্চাঠো মর্ গেয়া।

বাবা চুপ ক'রে থাকে।

গির্‌বরজার সিংহ-বাড়ীর অমূল্য ধন 'মতি' ফিরিয়ে আনতে এসে মাঝপথে যাদুকরের মন্ত্রের চোটে সে জানোয়ার ব'নে গেল।

তবু মেজবাবুকে সেলাম। হাজার সেলাম। দুনিয়ায় রোজকারের পথ মেজবাবুই খুলে দিয়েছে। ডিপোর চাকরী—বেশ চাকরী। মণ—আধ মণ—দশ সের—পাঁচ সের—আড়াই সের বাটখারা নিয়ে কারবার। কয়লা বিক্রী করা—খসড়া খাতা লেখা—মজুরটাকে দিয়ে চালনায় কয়লা চেলে নিয়ে ধুলো গুঁড়ো বার ক'রে রাখা—আর বসে থাকা। পাঁচ আনা মণ দাম। মণ-কম্বা এক সের মারতে পারলে একটা আধলা বেরিয়ে আসে। সমস্ত রোজকারটাই গোড়ায় উদ্যোগ ক'রে করত নিতাইয়ের বাবা। ভাগ দিতে চাইলেও নিত না নরসিং।

তারপর—কেমন ক'রে কবে থেকে যে সে নিতে আরম্ভ করলে—সে নরসিংয়ের মনে নাই। পেতলের বাটিতে তেল তো তেল—ঘি রাখলেও কিছুদিন পর সবুজ রঙের কলঙ্ক জন্মায়, পেতলের বাটি থেকেই জন্মায়—কিন্তু ঘিয়েও লাগে। কয়লার ডিপোটা পেতলের বাটির চেয়েও খারাপ, লোহার বাটি। কয়লার ডিপোর পাশে কয়লা ছিটকে পড়ত, কুড়িয়ে সংগ্রহ করতে আসত ছোট জাতের গরীবগুণার মেয়েরা। গিরবরজার এ জাতের মেয়েদের সঙ্গে এখানকার এদের কোন তফাৎ নাই। ওখানে আগে সিংহেরা রাত্রে মদ খেয়ে ঝোঁক চাপলে চ'লে যেত ওদের পাড়ায়। দরজায় লাথি মেরে ডাক দিত। ঘুমন্ত দম্পতির ঘুম ভেঙে যেত; দরজা ভাঙার ভয়ে বেরিয়ে আসত পুরুষটি—এবং দূরে অন্ধকারে কোন স্থানে সিংহমশায়ের নির্গমন-সময়ের অপেক্ষা করত। ঘুমিয়ে যেত সেইখানেই। কখনও আলো ফুটলে ঘুম ভাঙত, কখনও রাত্রেই ঘুম ভাঙত স্ত্রীর আহ্বানে। এখন আর অবশ্য সে দিন নাই। তবুও রেয়াজটা আছে—দু পক্ষই অভ্যাস ভুলতে পারে নাই; সিংহ-বাড়ির জোয়ান ছেলেরা শিস দিয়ে বেড়াবার অজুহাতে ওদের নাড়া দিয়ে আসে, মেয়েদেরও দেখা যায় গাছের আড়ালে, গলির মুখে। মাঠে মেয়েরা কাঠ ভাঙতে যায়, সিংহ-বাড়ির ছেলেরা ভাবুকের মত মাঠের ধারে বসে থাকে। এখানেও ঠিক তাই। আগে এখানকার বাবুরাও সিংহদের মত দরজায় লাথি মারত। চাপরাশীরা এসে খবর দিয়ে নিয়ে যেত বাবুদের বা'র-বাড়িতে। এখনও চাপরাশীদের এ সব কাজ করতে হয়। এখানকার মেয়েরাও এখন গোপনে গাছতলায়, গলির মুখে দেখা করে। স্টেশনে, ডিপোয়, বাজারে নানা কাজের ছুতায় যায়—তার প্রধান উদ্দেশ্য এইটা।

নিতাইয়ের বাপ নোটন, সে ওদের সঙ্গে রসিকতা করত। প্রথম প্রথম ভাল লাগত না নরসিংয়ের। তার পর ক্রমে ক্রমে বেশ লাগতে লাগল।

একদিন ভট্ ভট্ শব্দ ক'রে ফটফটিয়ায় চেপে এল মেজবাবু। কাল

রাত্রে বাড়ি এসেছে। হিসাবপত্র ঠিক ক'রে, ডিপো যতখানি পরিষ্কার করা চলে পরিষ্কার ক'রে নরসিং বসে ছিল। সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

মেজবাবু নামল। নেমেই বললে, বাঃ!

খুশি হ'ল নরসিং। পরিষ্কার করার ফল পেলে সে হাতে হাতে।

মেজবাবু বললে, ওটা কে রে নোটনা? বেশ দেখতে তো! বাঃ।

নোটন বললে, কুঞ্জ ডোমের বেটার বউ।

ডাক্ ওটাকে।

হেসে নোটন বললে, আজ্ঞে, ওটা ভারী ভীতু। নতুন বউ।

মেজবাবু এবার পিছন ফিরে কয়লার দিকে ফিরল, বেশ ভাল ক'রে চারিপাশ ঘুরে দেখল। তার পর হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার হাত খপ ক'রে ধরে বললে, পুলিসে দে এটাকে। কয়লা চুরি করছে। টেনে মেয়েটাকে নিয়ে সে ডিপোর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মেয়েটার সঙ্গে ছিল আরও দুটো মেয়ে, তারা হাসতে লাগল। নোটনও হাসতে আরম্ভ করলে। মেয়ে দুটো বললে, বাবুর কাছে আজ ফি জনায় এক টাকা ক'রে লোব। হ্যাঁ।

নরসিং প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেল, তারপর অকস্মাৎ মনে হ'ল—পায়ের ডগা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কি যেন সন্‌সন্ ক'রে চলছে। কান দুটো গরম হয়ে উঠছে, চোখ দপদপ করছে। বুকের ভিতরটা টিপটিপ করছে না, কিন্তু যেন দুলছে। নিশ্বাস ঘন হয়ে উঠেছে, বৈশাখী সন্ধ্যার বাতাসের মত।

বেরিয়ে এল মেজবাবু।

নোট-কেস থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে নরসিংয়ের হাতে দিয়ে বললে, নে। নোটনকে দিলে একখানা পাঁচ টাকার নোট।

নোটন মৃদুস্বরে বললে, সঙ্গের মেয়ে দুটো বলছে, দু টাকা লেবে।

দুটো টাকা ফেলে দিয়ে মেজবাবু ফটফটিয়ার প্যাডেলে ধাক্কা দিয়ে চড়ে বসল। দেখতে দেখতে উড়ে চলে গেল যেন। নরসিংহের মাথার মধ্যে, সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্বলে উঠল মুহূর্ত্তে। মেয়েটা চলে গেল। নরসিংয়ের স্তম্ভিত

ভাবটা কেটে গেল। সে আফশোষ করে ঘরে ঢুকতেই পায়ে কিছু একটা ঠেকল; সেটা মেজবাবুর কাঁধে ঝুলানো থাকে, গরম চা ঠাণ্ডা হয় না, ঠাণ্ডা জল গরম হয় না বাইরের উত্তাপে; কিন্তু ওটা থেকে গন্ধ উঠছে অন্য জিনিসের। বিলাতী মদের।

নরসিং খপ ক'রে সেটাকে খুলে ঢক ঢক ক'রে মুখে ঢেলে দিলে।

সেদিন নরসিংয়ের চিরদিন মনে থাকবে। চিরদিন!

নরসিং দাঁতে দাঁতে ঘষে প্রায় চীৎকার ক'রে গর্জ্জন ক'রে উঠল—শূয়ারকি বাচ্চা! হারামজাদা!

রাম নিতাই অঘোরে ঘুমুচ্ছে; রামটা গোঙাচ্ছে, নিতাইটার কষ বেয়ে বীভৎসভাবে লালা গড়াচ্ছে। নরসিং চঞ্চল হয়ে খানিকটা নড়ে চড়ে বসল। তারপর উঠে ঘরের কোণে বোতল দুটো ছিল, বোতল দুটো নেড়ে চেড়ে দেখলে। একেবারে খালি; এক ফোঁটাও প'ড়ে নাই। গ্লাসের জল খানিকটা সে বোতলে ঢেলে তাই খানিকটা খেলে।

মামীর ভাগ্নীটাকে এর আগে সে অনেকবার দেখছে। ওই রামার মতই দেখতে ছিল সে। কিন্তু সে ছিল যেন কাদায় গড়া মানুষ। যত ভীরু তত ছিল তার সহ্যগুণ। হঠাৎ এইবার তার চোখে সে যেন নতুন চেহারা নিয়ে দাঁড়াল।

মামীর উপর আক্রোশে, মেজবাবুর দৃষ্টান্তে সে মনে মনে···

আবার সে চেঁচিয়ে গর্জ্জে উঠল—রামা, শূয়ারকি বাচ্চা!

উঠে দাঁড়িয়ে নিতাইয়ের পিঠে লাথি মারলে। নিতাই একটা শব্দ করলে শুধু একবার; অর্থহীনভাবে চোখ মেলে একবার তাকালে; তারপর পাশ ফিরে শুলে।

নরসিং বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

শুখনরামের গদীর সামনে পাকা ইঁদারা; একেবারে লোহার হুক দিয়ে আঁটা শেকলে ঝুলানো বালতী রয়েছে ইঁদারার পাড়ের উপর। বালতীটা

ফেলে দিলে ইঁদারার জলে। সশব্দে গিয়ে পড়ল বালতীটা। সবল বাহুর টানে বালতীটা টেনে তুলে, বালতীর জল সে হড়-হড় ক'রে মাথায় ঢাললে।

জান্‌কী জান্‌কী, আমার পাপ তুই ক্ষমা করিস। জান্‌কী, তার সোনার জান্‌কী!

খানিকক্ষণ সে পায়চারী ক'রে ফিরল রাস্তার উপর। তারপর সে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল। বাতিটা নিভে গিয়েছে, ঘর অন্ধকার। অন্ধকারেই ঠাওর ক'রে সে এসে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর আবার সে উঠল। দেশলাই জ্বেলে নতুন বাতিটা দেখে নিয়ে সেটাকে জ্বেলে নিলে।

যো হো গেয়া—সো হো গেয়া, যানে দো। ফিন্ শুরু করো।

শ্যামনগর-পাঁচমতিয়া সার্ভিস। আট মাইল পথ। সে কাগজ পেন্সিল বার ক'রে বসল এবার। আট মাইল পথ; সকালে এগারটা পর্য্যন্ত দুবার যাবে দুবার আসবে। রাত্রে দুবার যাওয়া, দুবার আসা। আটবার। আট আটে চৌষট্টি মাইল। গাড়ীটা পুরানো, রাস্তা খারাপ। গ্যালনে ষোল মাইল ধরাই ভালো। চৌষট্টি মাইলে চার গ্যালন তেল। আঠার আনা গ্যালন হিসাবে—সাড়ে চার টাকা। মোবিল হাফ গ্যালন—দুটাকা। টায়ার বছরে একটা হিসাবে চারটে; চার পঁচিশ—একশো। টিউব চারটে; চার আটে—বত্রিশ। এ ছাড়া বৎসরে একশো টাকা মেরামতি খরচ।

কাক-কোকিল ডাকছে। থাক্ হিসেব। হিসেব কষে দেখে কাজ করতে গেলে আর খোলা হয় না সার্ভিস। চোখে সে যে হিসেব রাস্তায় বসে দেখে এসেছে সেইটাই বড় হিসেব।

শ্যামনগর-পাঁচমতিয়া সার্ভিস। ভাড়া—সিট্-পিছু আট আনা।

সাত

পাঁচমতী বাবু পাঁচমতী, খালি মোটর ; আট আনা সিট। শুধু আট আনা। ট্যাক্সি মোটর বাবু। যাবেন বাবু, যাবেন ?

চৌরাস্তার মোড়ে রামা দাঁড়িয়ে হাঁকছিল। নরসিং গাড়ী নিয়ে গিয়েছিল—মোটর একসেসেরিজ সাপ্লাইয়ের দোকানে; তেল ভরে নিয়ে এল সে। নিতাই সঙ্গে গিয়েছিল। নরসিং এসেই ধমক দিলে।

হাঁকিস না উল্লুক।

হাঁকব না ? বিস্মিত হ'ল রাম।

না। এখনও সার্ভিসের লাইসেন্স মেলে নাই। কেস হয়ে যাবে।

তবে ?

নরসিং বললে—ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডায় নজর রাখ্। প্যাসেঞ্জার এলেই ডেকে আস্তে বল্। দেখতে দেখতে চারজন প্যাসেঞ্জার জুটে গেল। ঘোড়ার গাড়ীর শেয়ারও আট আনা, মোটরের শেয়ারও আট আনা। মোটর ছেড়ে লোকে ঘোড়ার গাড়ীতে যাবে কেন ? নরসিং ষ্টিয়ারিংয়ে বাঁ হাতটা রেখে অলসভাবে সিগারেট টানছিল। দৃষ্টি ছিল তার ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডার উপর। দিদিয়ার ভাঁড়ার-ঘরের সামনে সকালবেলায় উঠে গিয়ে সে বসত, জলখাবার খেত—মুড়ি, ছোলা ভিজে আর গুড়। তার সঙ্গে থাকত জেঠা মাধব সিংয়ের পাতের প্রসাদ একখানা রুটি। পিঁপড়ে বেড়াত ঘুরে ভাঁড়ার-ঘরের সামনে। রুটির টুকরোটা ছিঁড়ে সে ফেলে দিত। দেখতে দেখতে জুটে যেত রুটির টুকরোটার চারি প্রান্তে পিঁপড়ের ঝাঁক। রুটির টুকরোটা টেনে নিয়ে যেত গর্তের দিকে। হঠাৎ এসে যেত একদল ডেয়ো পিঁপড়ে। প্রায় লাফিয়ে পড়ত টুকরোটার উপর। ছোট পিঁপড়েগুলো চঞ্চল হয়ে প্রথমটা ছটকে পড়ত, তারপর তারা আসত আরও দলে ভারী হয়ে, এসে টানত অন্যপ্রান্ত ধরে। অবশেষে আক্রমণ করত ডেয়ো পিঁপড়েদের।

ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ানরা এরই মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ট্যাক্সিটার দিকে তাকিয়ে কি বলাবলি করছে!

নরসিংয়ের মনে পড়ে গেল পুরানো আমলের কথা। সে চোখে দেখে নাই, জেঠা মাধো সিংয়ের কাছে শুনেছে। মাধো সিংয়ের ছেলেবেলাকার কথা। তখন ওই জোসেফদের পূর্ব্বপুরুষেরা পাঁচমতী থেকে শ্যামনগর পর্য্যন্ত যাত্রী বয়ে নিয়ে যেত। ডুলি ছিল ওদের, এক ডুলি চার বেহারা; পাঁচমতী থেকে চলত শ্যামনগর, শ্যামনগর থেকে শহর মুরশিদাবাদ। মাধো সিং বলে—একদিন এল কেরাঞ্চি গাড়ী। দুই ঘোড়া, ভিতরে বসবার গদি, থপ থপ করে জোড়া ঘোড়া চলে জোর কদম: ডুলিতে লাগত দু ঘণ্টা, কেরাঞ্চি এক ঘণ্টাকে অন্দর পঁহুছ দিলে। বাস্—বাতিল হয়ে গেল ডুলি।

কেরাঞ্চির নসিবে আগুন ধরাতে সে নিয়ে এসেছে তার 'ট্যাক্সি কার'কে —তার জবরদস্ত খাঁকে। বহুৎ আরামদার গদি, মজবুত স্প্রীং; হাওয়া গাড়ী —হাওয়ার মত জোরসে ছুটতে পারে,—সে যখন এসেছে কেরাঞ্চিকে তখন যেতে হবে বইকি। হাড্ডিসার—চোখে-পিঁচুটি জানোয়ারগুলোকে দেখে তার মায়া হয়, ঘেন্নাও হয়। ছেড়ে দে, ওগুলোকে ছেড়ে দে।

একজন কেউ আসছে। হাতে চামড়ার কাগজ রাখা ব্যাগ—কি বলে যেন? অ্যাটাচি কেস! হ্যাঁ, অ্যাটাচি হাতে আসছে; পরনে সৌখীন জামা কাপড়।

নরসিং বললে—নিতাই মার্ হ্যাণ্ডেল।

আর একটু দেখবেন না?

হয়ে গিয়েছে, নে। নরসিং জানে ওই লোকটা মোটরে জরুর যাবে। কেবল একটা খোঁচ আছে। লোকটা পুরা গাড়ী ভাড়া ক'রে চাল মেরেও যেতে পারে।

কি বাবু? পাঁচমতী যাবেন? আয়েন বাবু—আয়েন। আমার ঘোড়া ভাল।

আমি হুজুর, এখুনি ছাড়ব। এ দিকে হুজুর। ভাল গাড়ী।

নরসিং গাড়ীখানা ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়াল।—মটরে যাবেন স্যার? আট আনা ভাড়া।

মোটর? ট্যাক্সি?

হ্যাঁ স্যার। আসুন স্যার। দুটো সিটের দাম দিলে সামনেটা গোটা পাবেন।

লোক বসেছে যে একজন?

আপনি একটু ভেতরে যান তো দাদা। পিছনটা চার জনেরই সিট। হ্যাঁ, চার জনের। দেখুন না সামনের সিটের চেয়ে কতখানি চাওড়া। সামনেটা যদি তিন জনের হয় তবে ওটা চার জনের কিনা আপনারাই বিচার করুন। বসুন স্যার, বসুন। গীয়ারের হাতলের মাথাটা বাঁ-হাতে চেপে ধরে সে পায়ে চাপ দিলে অ্যাকসিলারেটারের উপর। গর্জ্জন ক'রে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে নরসিংয়ের গাড়ী ছুটল। শহরের ভিতরের রাস্তা অতিক্রম ক'রে গাড়ী এসে পৌছে গেল তেমাথায়; এইখান থেকে পাঁচমতীর শড়ক শুরু। বাঁদিকে একটা মন্দির। নরসিং প্রণাম করলে—যে দেবতাই থাক, প্রণাম তোমাকে। কিছুটা দূরে একটা মসজিদের মিনারের আধখানা দেখা যাচ্ছে—সেলাম আল্লাহতয়লা-খোদাতয়লা। তোমাকেও প্রণাম। নরসিং আরম্ভ করলে নতুন কারবার, নতুন পথে পা বাড়ালে, গাড়ী ছুটালে। তোমরা মঙ্গল করো। হঠাৎ মনে পড়ল জোসেফকে। জোসেফের গির্জ্জার গড—তোমাকেও প্রণাম।

আরে উল্লুক বেকুবের দল, গরুর গাড়ীর সারি নিয়ে আমিরী চালে হুঁকা টানতে টানতে চলেছে দেখ, চলেছে আবার রাস্তার মাঝখান জুড়ে। হঠাও, হঠাও—হঠাও গাড়ী। গাড়ীর গতি মন্থর ক'রে সে হর্ন দিতে আরম্ভ করলে —ভোঁপ—ভোঁপ—ভোঁপ। তারপর দিলে ইলেকট্রিক হর্নে হাত। তীব্র চীৎকারে হর্নটা বেজে উঠল। হঠাও। হঠাও। জলদি করো। হঠ যাও।

মিতাই প্রশ্ন করলে—দড়িটা বার করব নাকি ?

না। নয়া জায়গা।

গাড়ীগুলো সরে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সরছে। গাড়ীর প্যাসেঞ্জারদেরও মোটরে চড়ার নেশা লেগেছে। নরসিংয়ের পাশের বাবুটি বললে, উল্লুকদের চাবুক মারা উচিত।

মনে পড়েছে মেজবাবুকে। মেজবাবু চাবুক চালাতেন। দুরন্ত মেজবাবু কাউকে ভয় করতেন না, কিছুকে ভয় ছিল না তাঁর।

মোটর বাস কিনে নিয়ে এলেন। সোনালী রঙের বাসখানা বাহারের বাস ছিল। কলিকাতা থেকে রহমত ড্রাইভার এল, বাস চালিয়ে এসেছিলেন মেজবাবু, রহমত ছিল পাশে বসে। প্রথম গেলেন সদর, সেখান থেকে বাস লাইসেন্স করিয়ে এনে পরের দিন বাস সার্ভিস খোলা হ'ল। সে দিন তিনটে ট্রিপের দুটো ট্রিপে বাস ট্রেন মিস্ করলে।

মেজবাবু রেগে আগুন হয়ে গেলেন। রহমত—এ কেয়া বাৎ ?

রহমত ছিল বাঙালী মুসলমান, সে বললে—কি করব হুজুর ? যাবার পথ চাই তো! গরুর গাড়ীর এলাকা আপনাদের, এক এক দফায় দশ বিশখানা গাড়ী সারবন্দী চলবে, মাঝখান চেপে চলবে। রাস্তা না ছাড়লে আমি যাই কি ক'রে ? রাস্তায় তখন মাল-বওয়া গরুর গাড়ী চলত। গাড়োয়ানেরা ছিল ইমামবাজারেরই পাশের গ্রামের পেশাদার গাড়োয়ান। তাদের স্বভাবই ছিল ওই। রাস্তা তারা কিছুতেই ছাড়বে না।

মেজবাবু বললেন—আচ্ছা, কাল থেকে আমি যাব।

পরের দিন থেকে মেজবাবু বসলেন বাঁ ধার ঘেঁষে, হাতে নিলেন চাবুক।

ফিরে এসে রহমত বললে—বাপ রে বাপ! কাম ছেড়ে দোব আমি!

নরসিং তখনও কাজ করছে কয়লার ডিপোয়। সে বললে—কি হ'ল ?

কি হ'ল ? মেজবাবু এক ধারসে চাবুক চালিয়ে গেলেন।

নরসিং হেসেছিল। রহমত মেজবাবুকে জানে না।

রহমত বললে—মেজবাবু বরাবর থাকবেন না। তখন যদি সকলে মিলে বাস আটকায়, আমার জান মেরে দেবে।

মেজবাবু না থাকে, মেজবাবুর নাম থাকবে। নরসিং আবার হেসেছিল। রহমত কিন্তু শুনলে না, বললে মেজবাবুকে। মেজবাবু হা-হা ক'রে হাসলেন। —এ কলকাতা নয় রহমত, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা এখানে দাঙ্গা করে না। যে চাবুক চালালাম তার সাঁই সাঁই শব্দ আর পিঠের জ্বালা ভুলতে লাগবে ছ'বছর। তা ছাড়া ঘণ্টায় ষাট মাইল ছুটবে তোমার গাড়ী—তার ধাক্কার ভয় নাই?

হুজুর, সামনে একখানা গরুর গাড়ী খাড়া ক'রে দিলেই তো হল। গাড়ী তো লাফিয়ে পার হওয়া যাবে না বাবু!

মুসলমানের বাচ্চা তুমি, লড়তে পারবে না?

লড়তে পারি হুজুর। কিন্তু একা আমি কি করব?

আচ্ছা। তোমার সঙ্গে জবরদস্ত লোক দোব আমি। ডাকলেন নরসিংকে। নরসিং তখন কাঁচা বাঁশের মত সোজা লম্বা হয়ে উঠছে। আর সঙ্গে দিলেন নিতাইকে। নরসিং কণ্ডাক্টার, নিতাই ক্লীনার। বললেন—এদের নিয়ে পারবে তুমি?

হ্যাঁ—হুজুর। এরা থাকলে তবু সাহস থাকবে।

মেজবাবু তাদের নিয়ে আরও ক'দিন চললেন বাসের সঙ্গে। নিতাইকে এবং নরসিংকে দু'ধারে দাঁড় করিয়ে দিলেন। হাঁক—হঠাও! হঠাও! হঠাও!

রহমত হাজার হলেও পাকা লোক। সে ঠিক বুঝতে পেরেছিল। রহমত বলত—মানুষে আর মেঘে কোন তফাত নাই রে ভাই। যে মেঘ পানি ঢালে, গলে গলে ঝরে পড়ে, সেই মেঘ হঠাৎ একসময় চড়াক্ ক'রে বিজলী হেনে দেয়। কখন যে চিড় খাবে, বিজলী হানবে—সে তাক করা সোজা নয়।

আটকালে তারা গাড়ী। সামনে গরুর গাড়ী রেখে দিয়েছিল। নরসিং আর নিতাই হাঁকলে—হঠাও।

তারা দমলে না। বললে—আয় নেমে আয়।

নরসিং এবং নিতাই নামছিল। মেজবাবু তার আগেই নামলেন। মৃদুস্বরে বললেন—ডাণ্ডা বের কর্। বলে গট গট করে এগিয়ে গেলেন। গাড়ীতে লাথি মেরে বললেন—হঠাও।

তারা গর্জে উঠল। চাবুক মারার শোধ নোব আজ। চাবুক চালানো বার করব।

মেজবাবু বাঁ হাত পকেটে পুরে, ডান হাতে চাবুক নাচিয়ে বললে—চাবুকের সঙ্গে আজ পিস্তল চালাব।

নরসিং এবং নিতাই তাঁর পাশে তখন দাঁড়িয়েছে ডাণ্ডা হাতে। মেজবাবু বললেন—বে-একতিয়ারী কাজ করলেই চাবুক খেতে হবে।

একজন বললে—কিসের বে-একতিয়ারী? রাস্তা—সরকারী রাস্তা। এতে সবারই চলবার একতিয়ার আছে।

আছে। মেজবাবু হাসলেন। তারপর বললেন—কে আগে চলবে, কে পরে চলবে তারও একটা একতিয়ার আছে।

যে বড়লোক সেই আগে চলবে—না কি?

হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন মেজবাবু—সে হাসিতে হাওয়াও চমকে ওঠে। হেসে বললে—উল্লুক একটা তুই।

লোকটা থতমত খেয়ে গেল। অন্য একজন বললে—গাল দেবেন না মশায়।

মেজবাবু বললেন—গাল কি তোকে দিই, না, মানুষকে দিই? গাল দিই মানুষের বে-আক্কেলকে—বেকুফিকে।

কেনে? কি বে-আক্কেলী কথা বলেছি?

বড়লোকের আগে যাওয়ার একতিয়ার নাই—যে সে কথা বলে সে বেকুফ, বে-আক্কেল। আগে যাবে সেই, যার সব চেয়ে জোরে যাবার তাকদ আছে। গরুর চেয়ে ঘোড়ার জরুর আগে যাওয়ার একতিয়ার আছে।

আবার ঘোড়ার চেয়েও মোটরের একতিয়ার আগে যাওয়ার! যে যত জোরে চলবে তার তত আগে যাবার একতিয়ার, যে আস্তে চলবে তাদের সরে পথ দিতে হবে জলদি-যানেওয়ালাকে। হঠাও—গাড়ী হঠাও।

আশ্চর্য্য! তারা সরিয়ে নিলে গাড়ী।

মেজবাবু গাড়ীতে চেপে বললেন—গাড়ীতে প্যাসেঞ্জার রয়েছে। কারও আছে মামলা, কারও হয়তো আপনার জনের অসুখ, ওষুদ আনতে চলেছে। আর তোমরা মাঝখানে গাড়ীর সারি চালিয়ে—'সখী আমার মনের ব্যথা তুমি বুঝলে না' বলে গান ধরে চলবে আপন মনে—তা হবে না। তোমার সখী মনের কথা বুঝল না বলে মন উদাস হয়ে থাকে তো পথের এক পাশে গাড়ী রেখে, গাছতলায় বসে মনের দুঃখে গাঁজা খাও, মদ খাও, কাঁদো হাসো নাচো—কিছু বলব না আমরা।

তারাও হেসে উঠল কথা শুনে।

মেজবাবু বললেন—না হয় তো আমার গাড়ীর আগে ছুটে চল।

একজন বললে—তা আজ্ঞে, আমাদের গাড়ী তো বেমক্কা পড়তে পারে, গরু অনেক সময় বেকায়দা হয়ে যায়।

নিশ্চয়। সে সময় আমার গাড়ী দাঁড়াবে। আমার লোকজন নেমে তোমার গাড়ী নিরাপদে পাশে সরিয়ে দিতে সাহায্য করবে। তোরাই বল্ না, আজ আট দিন এই কাণ্ড চলেছে, চাবুক আমি চালিয়েছি, কিন্তু এমন কোন গাড়ীর গাড়োয়ানের উপর আমি চাবুক চালিয়েছি? চালিয়ে থাকি, আমি কসুর মানব—মাফ চাইব।

তারা চুপ ক'রে রইল।

হঠাৎ একজন বললে—আমাদের কিন্তু একদিন গাড়ীতে চাপতে দিতে হবে।

মেজবাবু বললেন—খুব খুশি হব আমি। চাপ একদিন গাড়ীতে। তা' ছাড়া বলে দিচ্ছি আমি ড্রাইভারকে—হঠাৎ কারও কোন অসুখ হয় পথে;

গাড়ী ভেঙে যায়—মানুষকে গাড়ীতে তুলে নেবে। পৌছে দেবে ইমামবাজার বিনা ভাড়ায়।

তারা বললে—সেলাম বাবু। প্রণাম বাবু।

মেজবাবু বললেন—চলো রহমত্।

রহমত গাড়ী ছাড়বার আগে একটা সেলাম দিয়ে বললে—সেলাম হুজুর আপনাকে।

*

গাড়ী পাঁচমতী ঢুকছে।

পাঁচমতী গিরবরজার মা-লক্ষ্মীর কৃপায় ধনে দৌলতে ঝলমল করছে। বড় বড় বাড়ী, ধনী জমিদারের বাস। উকীল, মোক্তার, আদালতের আমলার বাস। শ্যামনগরের মত না হ'লেও বেশ বড় জায়গা। দু'তিন জন জমিদারের মোটর আছে, কয়েক জনের ঘোড়ার গাড়ী আছে, কয়েক বাড়িতে হাতী আছে। দোকান পশার, হাট বাজার। নিতাই বললে, বেশ জায়গা গুরুজী।

একটা চায়ের ষ্টলের সামনে গাড়ী থামালে নরসিং।—নে, আর একদফা চা খেয়ে নে। রামা, জোরে জোরে হাঁক্—শ্যামনগর খালি মোটর যাচ্ছে, আট আনা সিট।

চায়ের স্টলের দোকানদারের কাছে বসল সে।—আপনার দোকান? আপনার নামটি কি দাদা? চিমড়ে পাক-দেওয়া চেহারা লোকটির, দেখেই বুঝতে পারা যায়, চিমড়ে শরীর হ'লেও ভয়ানক শক্ত শরীর; একটা চোখ টেরা। মাথায় ঢেউ-খেলানো চুলে চেরা সিঁথি। লোকটার মেজাজও অদ্ভুত খারাপ। মনে হ'ল, সে তাকালে নিতাইয়ের দিকে, কিন্তু তাকালে সে নরসিংয়ের দিকেই। ট্যারা চোখের চাউনীর দিক্‌নির্ণয়ের হদিস জানা আছে নরসিংয়ের। রামার বোন তার স্ত্রী ছিল টেরা। মনটা কেমন হয়ে গেল নরসিংয়ের। তাকে মনে পড়ে গেল।

লোকটা বললে, আমার নাম নিয়ে তোমার কাম কি হে বাপু? চা খাবে

চা খাও। পয়সা দাও—চলে যাও, বাস্। পয়সা ফেলে মোয়া খাও আমি কি তোমার পর ?

নিতাই বললে, ও বাবা! এ যে একেবারে মিলিটারী!

রামা খি-খি ক'রে হাসতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে—লোকটার চাউনি দেখ মাইরী। হি-হি-হি-হি! চায়ে চুমুক দিয়ে বিষম খেলে—থক-থক ক'রে কেশে সারা হ'ল—তবু তার হাসির নিবৃত্তি নাই।

লোকটা উত্তর দিলে নিতাইয়ের কথার—তুম বি মিলিটারী—হাম বি মিলিটারী। তুমি বি ভালো—হাম বি ভালো। তুমি ধরো লাঠি—হামি ধরি ডাণ্ডা। তুমি বল ভাই—তো আমি বলি দাদা। বাবা, সুরেশ দাসকে পেটে মুখে এক বাত। কোই কো বান্দা নেহি হাম। এ বাবা পাঁচমতী। এতনা বড়া পাজী জায়গা আর নাই। যত ক'টি বড় লোক—উকীল—মোক্তার—সব এক এক চীজ। এক চুল এদিক ওদিক হয়েছে কি বাস্, মামলা এক নম্বর—কি মারপিট। হিঁয়া চালাকী মৎ করো। ত্রিশ বছর বয়স হ'ল—চল্লিশ নম্বর ফৌজদারী মামলার আসামী করেছে আমাকে, আমিও করেছি বিশ-ত্রিশ নম্বর। সে করেও ঠিক আছি বাবা।

নরসিংয়ের ভারী ভাল লাগে সুরেশকে।—বসুন বন্ধু বসুন। চটছেন কেন? আমরা হলাম বিদেশী লোক। এসেছি আপনার এখানে। বন্ধু বলেছি—

বাস্—বাস্। আপনি আমাকে বন্ধু বলেছেন; আমিও বলছি বন্ধু—মিতা—দোস্ত। বসুন, আরাম করুন। চা খান। সিগারেট খান। দিনে যদি থাকেন তবে আমার বাড়িতে খান। আমি জাতিতে বৈষ্ণব।

এই তো। এই তো ভাই বন্ধু। হয়ে গেল মিতালী।

সুরেশের মুখে হাসি ফুটে উঠল।—আপনারা কোথায় যাবেন ?

যাব না—এলাম।

এলেন ? মোটর নিয়ে—কার মোটর ?

মোটর আমার নিজের। ট্যাক্সি। পাঁচমতী থেকে শ্যামনগর সার্ভিস খুলবার মতলব আছে।

বলেন কি? জয় নিতাই রাধেশ্যাম। বহুৎ আচ্ছা। তা খুব চলবে আপনার। কেরাচীওয়ালারা বেশ কামায়। তবে খুব হুঁসিয়ার। এখানকার মোক্তার উকিল আমলারা বড় পাজী। একটু থেমে বলে, ভাল লোকও আছে দু'চার জন। এই যে এই যে—হরিনারাণবাবু মাষ্টার, ভাল লোক। মাষ্টার মশায়—

খদ্দর-পরা অল্প বয়সী এক ভদ্রলোক হাসিমুখে দাঁড়ালেন।—কি সংবাদ সুরেশ?

এই ইনি এসেছেন ট্যাক্সি গাড়ী নিয়ে। পাঁচমতী-শ্যামনগর সার্ভিস খুলছেন। তা আপনি তো রোজকার খদ্দের একজন।

হ্যাঁ। তা,—তা, বেশ তো।

চড়ুন গাড়ীতে। চড়ুন।

সুরেশের ট্যারা চোখ জ্বলজ্বল করছে।

শ্যামনগর। শ্যামনগর। ট্যাক্সি কার?

সুরেশ হাঁকলে, এই চলে যায়। হর্ন—হর্ন দাও হে!

ভোঁ—ভোঁ—ভোঁপ্ ভোঁপ্।

মাষ্টার মশায় ডাকলেন, ও অরবিন্দবাবু!

কি? মোটর কোথাকার মশায়?

আসুন। আসুন। ট্যাক্সি। সার্ভিস খুলেছে শ্যামনগর-পাঁচমতী।

ভাড়া?

ভাড়া ওই আট আনা সিট।

বহুৎ আচ্ছা। ফইজুর মড়া ঘোড়া আর ভাঙা গাড়ী নিয়ে আর চলছিল না বাবা। আরে নবগোপাল—প্রতুল! এদিকে—এদিকে। ট্যাক্সি——চলে এস।

হরিনারাণ বললে নরসিংকে—আপনি এক কাজ করবেন, আমাদের সব যাবার সময় বাঁধা আছে। এক এক ট্রিপের প্যাসেঞ্জারদের নাম লিখে রাখবেন, টাইম বাঁধা ক'রে নেবেন। বাস্—ঠিক সময়ে এসে আমরা চেপে বসব।

নরসিংয়ের গাড়ী আবার ছুটল শ্যামনগর।

পাঁচমতী—শ্যামনগর!

বাদশাহী শড়কের উপর পহেলা ট্রিপের দাগ এখনও মিলায় নাই। তার উপরে পড়ল দ্বিতীয় ট্রিপের রবার টায়ারের বরফি। কাটা ছকের ছাপ।

রামা এখনও হাসছে।—দাদাবাবু, লোকটার চোখ দুটো কি রকম! হি-হি-হি-হি!

নরসিংয়ের মনে পড়েছে রামার বোনকে। তার স্ত্রীকে। ভাসা পালকের মত স্বভাব রামার। নিজের বোনকে—মার পেটের বোনকে মনে পড়ে না।

নিতাই হাঁকালে—গুরুজী!

হুঁসিয়ার করছে নিতাই। অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে যেত। হাসলে নরসিং। চোখে জল এসে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল সামনেটা।

ঝাপসা হবে না? জান্‌কীকে মনে পড়ছে যে! জান্‌কী ব'লে বাড়ির লোকে ডাকত। জান্‌কী! জানকী ছিল তার নাম। চোখ দুটি ছিল ট্যারা। বারো-তের বছরের হিলহিলে লম্বা জান্‌কী হঠাৎ তার মনের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

মামী নিয়ে এসেছিল ভাইঝি আর ভাইপোকে; মামা তার বোনের ছেলেকে এনেছে যখন, তখন সেই বা আনবে না কেন? মতলব ছিল মামার ভালবাসাটা পড়ে গিয়ে তাদের উপর। নরসিং যখন বিদায় হয়েছে, তখন এইটাই বড় সুযোগ। নরসিং কিন্তু থুথু ফেলেছিল। আরে সীতারাম! মামার আছে কি, তাই নেবে? একখানা খড়ে ছাওয়া ঘর আর ক' বিঘে জমি? তার জন্যে নরসিং ঘর ছাড়ে নাই। তবু প্রথম প্রথম তার আক্রোশ হয়েছিল এদের দুজনের উপর। মধ্যে মধ্যে মামা তাকে নিমন্ত্রণ করত। সে

আসত মামার বাড়ি। আসত শুধু মামার জন্য। তা'ছাড়া তার জেঠা মাধো সিং বলেছিল—উসকে বদন্ হাম নেহি দেখেগা। পরের ঘরে ভাত ভিক্ষে ক'রে খায় ?

বাবা কোন কথাই বলত না। কিন্তু একবারও খোঁজ নেয় নাই। নরসিং বাবুদের ঘরে শুধু বইগুলোর দুর্বোধ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে মাথা কুটে মরত। তাকে উদ্ধার করতে হবে—দিদিয়ার গল্পের সেই গিরবরজার ছত্রিদের হারানো মতিকে।

সে রবিবার দিন যেত মামার বাড়ি। তখন জানকী ছোট। ট্যারা চোখে কার দিকে সে চাইত নরসিং বুঝতে পারত না। ভারী যত্ন করত তাকে। সোমবার যখন সে চলে আসত, বলত—আবার কবে আসবে ? কাদার মত স্বভাব ছিল তার। লেপটে লেগে থাকতে চাইত।

বলত—তোমার মত রামকে লিখাপড়া শিখবার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ো তুমি। তোমার পুরোনো কেতাবগুলি দিয়ো। রেখে দিব। বড় হয়ে রাম সিং পড়বে।

প্রথম প্রথম নরসিং জান্‌কীকে কিছু বলত না। সে জান্‌কীকে রূঢ় ভাষায় বলত, ভাগো হিঁয়াসে, ভাগো। কুকুরের বাচ্ছার মত পায়ের কাছে এসে লেজ নাড়তে হবে না—ভাগো।

তারপর তাকে প্রহার দিতে শুরু করলে।

সেদিন রবিবার। পরের দিন সোমবারে রথযাত্রা। ইমামবাজারে রথের মেলা।

জান্‌কী এসে হেসে বলেছিল—রথের মেলাতে আমাকে রামসিংকে কি দিবে তুমি নরসিং ভাই ?

অসহ্য মনে হয়েছিল নরসিংয়ের। সে ঠাস ক'রে এক চড় বসিয়ে দিয়েছিল—আবদার ! যাও আবদার কর গিয়ে তোমার পিসীর কাছে।

রামটা আজন্ম ওই 'গাধার মত উল্লুক'। খুব যে বোকা, তাকে নরসিং

ওই কথা বলে—'গাধাকে মাফিক উল্লু।' জান্‌কীকে মারলে সে খি-খি করে হাসত।

জান্‌কী কেঁদে উঠেছিল, চড়টা জোরেই পড়েছিল। 'নেকড়ানী' ঠিক এই সময়টিতেই ঘরে ঢুকেছিল—কোথাও গিয়েছিল। 'নেকড়ানী'—নেকড়ে বাঘিনী। 'নেকড়ানী' থমকে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাদের দিকে চেয়ে রইল; মনে হ'ল, চোখের তারা দুটো যেন সদ্য-আগুনে পোড়ানো রাঙা গুলতি-বাঁটুল—ধনুকে লাগিয়ে টান দিয়ে ধরেছে—লক্ষ্য করছে নরসিংকে। নরসিং মনে মনে মনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। জান্‌কী, রাম—তারাও পিসীকে দেখছিল। পিসীর ওই গুলতি-বাঁটুল জোড়া ধনুকের মত চাউনী এবং ভ্রূভঙ্গী দেখে তারাও ভয় পেয়েছিল—রামার খি-খি হাসি তখন বন্ধ। হনুমান। শিকারীর হাতের বাঁটুল জোড়া ধনুক দেখে গাছের মাথার হনুমানগুলোর যেমন সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হয়ে যায়—তখন তার অবস্থাটাও তেমনি। বাঁচালে জান্‌কী। পিসীর ঠোঁট নড়বার আগেই সে কাঁদতে কাঁদতে বললে—পায়ে হুঁচোট লাগল।

এবার বাঁটুল ছাড়লে মামী। নেকড়ানীর মতই দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, চোখ ছিল কোথা? চোখ? হারামজাদী—ট্যারা-চোখী?

ছুটে আসতে গিয়ে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মামী বললে, হারামজাদি নাচনেওয়ালী, এত নাচনা কিসের লাগল তোর? ছুটলি কেনে তুই? বলতে বলতে সে আক্রোশভরে এসে ধাঁ ক'রে বসিয়ে দিলে এক চড় জান্‌কীর গালে। নেকড়ানী মারলে তার থাবা।

নরসিংয়ের ইচ্ছে হয়েছিল চীৎকার ক'রে উঠতে। কিন্তু পারে নাই। আশ্চর্য্য—গোটা জীবনেই সে পারে নাই নেকড়ানীর প্রতি ভয়টাকে মুছে ফেলতে। কতবার সে ভেবেছে—কিসের ভয়? মামার খায় না সে আর। সে গিরবরজার সিংহরায় বংশের ছেলে—মামা ধরণী সিং সিংহরায়দের চেয়ে

ইজ্জতে অনেক ছোট, মামী আরও ছোট ঘরের মেয়ে। তার পায়ের ধূলো পড়লে তাদের কৃতার্থ হয়ে যাওয়ার কথা—কেন ভয় করবে সে ?

চাকরী ক'রে যে দিন সে মাইনে পেলে, সে দিন পাঁচটা টাকা নিয়ে সে গিয়েছিল মামার বাড়ি। সেদিন সে ভেবেছিল—পাঁচ টাকা দিয়ে সে প্রণাম করবে মামাকে। মামীকে সে প্রণামই করবে না। মাইনে বলবে—পঁচিশ টাকা। মামীর চোখ ছুটো বড় হয়ে উঠবে। মামী বলবে—কি বাবা ? মামী এত ছোট হ'ল ? মামাকে দিলে পাঁচ টাকা, আর মামীকে মনেই পড়ল না ?

সে বলবে—গিরবরজার সিংহরায় আমরা। আমরা ছোট জাতকে প্রণাম করি না। সে মামীর বাপ তুলে, জাত তুলে গাল দেবে। বহুৎ বহুৎ কড়া কথা শুনিয়ে দেবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—মামীকেই সে প্রণাম করলে আগে টাকা দিয়ে। চারটে টাকা দিয়ে ফেললে।

মামী খুশি হ'ল। সে বললে, ব'স বেটা। বেঁচে থাক। বহুৎ রোজগার করো। মামী বলে মনে রাখিয়ো। একঠো বেটা নাই আমার যে আখেরে আমাকে দেখবে। একঠো বেটি নাই যে জামাই আসবে একটা—সে পেটের বাচ্ছার মত যতন করবে। তুমি ছাড়া কে আছে আমার !

তারপর মামী ডাকলে—জান্‌কী ! জান্‌কী ! আরে হারামজাদী বদমাশ ! দেখ্, বেটা দেখ্। ভাইয়ের বেটীকে আনলাম কি আমার সুখ দুখ দেখবে। হারামজাদীকে করণ দেখ্। কোথায় গেল পাত্তা নেই।

মামী বকতে বকতে উঠে গেল। উঠে গিয়েছিল—নরসিংয়ের জন্যে মিঠাই কেনবার ব্যবস্থা করতে। সেই সময় বাড়ি ঢুকল জান্‌কী। বিকেল বেলা পুকুরে গা ধুয়ে এল সে—গায়ে ভিজে কাপড় সেঁটে লেগে গিয়েছে।

নরসিংয়ের বুকের ভিতরটায় হঠাৎ মোটরের ইঞ্জিন স্টার্ট নিয়েছিল। কিশোরী জান্‌কীর দেহে তখন যৌবনের রঙ ধরতে আরম্ভ করেছে। এতদিন

চোখে পড়ে নাই। আজ হঠাৎ সেটা পড়ে গেল। নরসিংয়ের হয়তো এতদিন চোখ ছিল না; চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে তার মেজবাবু। সেদিন ডিপোর ঘরের স্মৃতি মনে পড়ল। বুকের মধ্যে আগুন ধরে গেল।

মেজবাবু বলতেন—এই ঘটনার ঠিক দু দিন আগে মেজবাবু বলেছিলেন, স্বকর্ণে শুনেছিল নরসিং; মেজবাবু বলেছিলেন তাঁর এক বন্ধুকে—ঘাটে বাসন মাজছিল দুপুর বেলায়, আমি নামলুম ঘাটে পা ধুতে। এক হাত ঘোমটা দিলে—সরে দাঁড়াল এক পাশে। কুড়িটা টাকা আলগা ক'রে রুমালে বেঁধে বুক পকেটে রেখেছিলাম, ঝম ক'রে ফেলে দিলাম ঘাটে, যেন পড়ে গেল পকেট থেকে। উঠে চলে এলাম। থাকল পড়ে ঘাটের জলে। পাঁচ মিনিট পর ফের গেলাম। দেখলাম রুমাল নাই। উঠে আসবার সময় বলে এলাম, হাত ভরে দোব টাকায়। সন্ধ্যেবেলা থেকো ঘাটে।

হা-হা করে হেসেছিলেন মেজবাবু। বলেছিলেন, বিশে না হয় পঞ্চাশ, পঞ্চাশে না হয় এক শো, শয়ে না হয় হাজার। তাতেও না হয়, একটু তাকে থাকতে হবে। যখন একলা নির্জ্জনে পাবে জোরসে টেনে নাও। বাস্, চুপ হয়ে যাবে। আবার হাসি—হা-হা-হা-হা!

শয়তান! মেজবাবু শয়তান! শয়তানের সে হাসি মধ্যে মধ্যে আজও কানের পাশে বাজে।

জান্‌কী, তুই—তুই বাঁচিয়ে দিয়েছিস নরসিংকে। নইলে নরসিংয়ের দুনিয়া হয়ে যেত মেজবাবুর দুনিয়া, শয়তানের দুনিয়া।

মনের আগুনের আঁচে অধীর হয়ে মেজবাবুর ওই মন্তরের মায়ায় নরসিং তাকে টাকা দিয়ে লোভ দেখাতে চেয়েছিল। আশ্চর্য্য—ছোটবেলার কাদার মত নিরীহ বোকা মেয়ে, তার সেই ট্যারা চোখে বিজলী খেলে গেল সেদিন। নরসিং ক'টা টাকা হাতে নিয়ে লুফছিল। বাড়িতে আর কেউ ছিল না তখন। জান্‌কী আগুন-ছড়ানো ট্যারা দৃষ্টিতে চেয়ে বারকয়েক শুধু থুথু ফেললে—থু! থু! থু! থু!

নরসিং এবার আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, মেজবাবুর মন্তর মনে পড়ল তার, সে জান্‌কীকে টেনে বুকে চেপে ধরলে।

সঙ্গে সঙ্গে জান্‌কী তার হাতের ভারী রূপোর কাঁকনি দিয়ে মারলে নরসিংয়ের ভ্রূর উপর। কেটে গেল ভ্রূটা। দরদর ক'রে রক্ত ঝ'রে নরসিংয়ের মুখ ভাসিয়ে জান্‌কীর মুখের উপর ঝরে পড়ল।

শ্যামনগর এসে গিয়েছে।

ডান হাতে স্টিয়ারিংয়ে পাক দিয়ে গাড়ীটার মুখ পাশের রাস্তায় বেঁকিয়ে দিলে নরসিং। বাঁ হাতখানা আপনি গিয়ে পড়েছিল ভ্রূর উপরে একটা কাটা দাগের উপর। জান্‌কী তাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

পালিয়ে এসেছিল নরসিং। ভয়ে তার বুক টিপটিপ করেছিল সমস্ত রাত্রি। পরের দিন রাম এসেছিল। গাধার মত উল্লুক রামা। কোন দিন তার বুদ্ধি ছিল না—কোন দিন হবেও না। এসে তার হাতে একটা টাকা দিয়ে বলেছিল—দিদি বললে—এক টাকার আফিং কিনে দিতে। টাকাটা সে নিয়েছিল। বলেছিল—বলিস আমি নিয়ে যাব সন্ধ্যের সময়।

সন্ধ্যেয় গিয়ে মামীকে বলেছিল—মামী, জান্‌কীকে আমি বিয়ে করব; দেবে?

* * *

রাজপুতের মেয়ে জান্‌কী—বড় হয়ে হয়ে উঠল সোজা তলোয়ারের মত লম্বা —সেকালের রাজপুতের তলোয়ারের মত ঝকমকে ধারালো হয়ে উঠেছিল মনে, মেজাজে। আশ্চর্য্য! ছোটবেলার সেই কাদার মত মেয়ে!

মদ খেলে সে কিছু বলত না। মদ তো খায় রাজপুত মরদ। মদ যদি না খাবে তো রক্ত চন-চন করবে কিসে? কিন্তু ব্যভিচারের কথা যদি ঘুণাক্ষরে তার কানে যেত তবে সে তলোয়ারের ধারের দিকটার মত ধারালো হয়ে দাঁড়িয়ে বলত—খবরদার! কখনও ছোঁবে না তুমি আমাকে। কখনও না।

ভয় পেত নরসিং।

জান্‌কী বলত—আমাতে তোমার মন না ওঠে, দিল্ না ভরে, আর একটা ছুটো তিনটে শাদী করো তুমি। কিন্তু এ কাজ—এ পাপ ক'রে আমাকে ছুঁতে পাবে না তুমি।

জান্‌কী, তোকে হাজারো লাখো আশীর্ব্বাদ! অক্ষয় স্বর্গে বাস হবে তোর।

জান্‌কীর দৌলতেই তার এ সমস্ত কিছু। সেই বলেছিল ট্যাক্সি করতে। সেলাম মেজবাবু, তোমাকেও সেলাম। তুমি শয়তানই হও আর যাই হও তোমাকেও সেলাম। তুমিই বলেছিলে—নরসিং, রহমতের কাছে ড্রাইভিংটা শিখে নে দেখি। রহমতটাকে জবাব দোব আমি। মুখের উপর উত্তর করে ও আমার।

রহমতের কাছে সে ড্রাইভিং শিখেছিল। এ ইচ্ছাটা তার বুকের ভেতর আগে থেকেই জেগেছিল। গাড়ীখানা ছুটে চলে, হু-হু ক'রে যেন উড়ে যায়, ইঞ্জিনটা গোঁ-গোঁ শব্দ করে, গরম হাওয়ায় সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরে, হোই দূর দূরান্তরের ছোট্ট জিনিসটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে কাছে চলে আসে, ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল দূর চলে আসে পায়ের তলায়। নেশা—অদ্ভুত নেশা। মদের নেশায় ছুনিয়া টলে। এতে তার পায়ের তলা দিয়ে ছুটে পিছনে চলে যায়। চলো—চলো—চলো। কোই রোখনেওয়ালা হ্যায়? নেহি হ্যায়। চলো—চলো—চলো। পাশ দিয়ে পিছনের দিকে ছুটে চলে যায়—গাছ পালা, রাস্তার ধারের যা কিছু—সব কিছু, আর দূরে পাশে ঘুরপাক খেয়ে ঘোরে সমস্ত কিছু। এত বড় ছুনিয়া—এতটুকু—এইটুকু ছোট হয়ে গেল। চলো—চলো—চলো।

নিতাই বললে—স্পীড কমান সিংজী। এই মোড়েই তো সব নামবেন।

নরসিংয়ের সম্বিত ফিরে এল। অ্যাকসিলারেটর থেকে পা তুলে নিলে।

জোসেফ দাঁড়িয়ে আছে—মোড়ের মাথায়।

আট

জোসেফ দাঁড়িয়ে ছিল বাজারের চৌমাথার ধারে। নরসিংয়ের মোটর থামতেই সে একটু হেসে নমস্কার ক'রে বললে—আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন ?

জোসেফের নমস্কারটা নরসিংয়ের ভাল লাগল না। গিরবরজার হাড়ির ছেলে! সিংহরায়দের অদৃষ্ট, লক্ষ্মী ছাড়ার পরিণাম! জোসেফের দোষ কি ? তবুও সে প্রতিনমস্কার না ক'রে পারল না। হোক সে গিরবরজার হাড়ির ছেলে, তার হাড়িত্বের এক বিন্দু ছাপ আর কোথাও নাই যে, তাকে সেই বলে অবহেলা করা যায়। আচারে-আচরণে, কথায়-বার্ত্তায়, ধারায়-ধরনে সে সর্ব্বাংশে এমন যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে যে, তাকে নমস্কার না-করলে জোসেফের অপমান হবে না, জোসেফ ছোট হবে না, নরসিং নিজেই ছোট হয়ে যাবে, নিজেরই বারবার মনে হবে—এটা অভদ্রতা হ'ল, নমস্কার না করাটা ঠিক হ'ল না। সে একটা ম্লান হাসি হেসে প্রতিনমস্কার করলে।

নিতাই অল্প দূরে দাঁড়িয়ে রামার সঙ্গে কথা বলছিল। ওই জোসেফকে নিয়ে কথা। কাল রাত্রি থেকেই সে জোসেফের উপর বিরূপ হয়ে রয়েছে। সে রামাকে মৃদুস্বরে বললে—বেটা হাড়ি খেরেস্তান হয়ে যেন রাজা হয়েছে। স[illegible]র পাঁচপা দেখেছে। একবারে যেন লাটসাহেব ব'নে গিয়েছে।

জোসেফ এগিয়ে এল গাড়ীর কাছে। নরসিংয়ের পাশের দরজাটার উপর কনুই রেখে হেঁট হয়ে গাড়ীতে উপবিষ্ট নরসিংয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে একটি সিগারেটের প্যাকেট বার ক'রে ধরলে—খান।

ভাল সিগারেট, গোল্ডফ্লেক। নরসিং গোল্ডফ্লেক না-খাওয়া নয়। মেজবাবুর দৌলতে অনেক ভাল সিগারেট খেয়েছে। গোল্ডফ্লেক, ফাইভ ফিফটি ফাইভ, থ্রি কাস্‌ল্‌। মেজবাবুর চাকরটা দিত। দিলদরিয়া মেজবাবু গাড়ীতে হামেশাই সিগারেটের টিন ফেলে যেতেন। অধিকাংশ সময়েই আর খোঁজ করতেন না। খোঁজ করলে কিন্তু একটি সিগারেট কম হলেই তিনি ক্ষেপে যেতেন। এই

খোঁজের একটা সময় ছিল। সেই সময়টা পার হলেই নরসিং সিগারেটের টিনটা পকেটে ক'রে একবার মেজবাবুর কাছে অকারণে ঘুরে আসত, দেখত মেজবাবু নতুন টিন খুলে সিগারেট টানছেন। সেও ফিরে, খানিকটা এসে সিগারেট ধরিয়ে আরাম ক'রে হাপরের মত ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে গ্যারেজের দিকে চলে যেত। ভারী মিঠা সিগারেট এটা। নরসিং নিজেও কখনও কখনও দু'চার প্যাকেট কিনে খেয়েছে শখ ক'রে। চার আনা প্যাকেট। একটা সিগারেট দেড় পয়সার উপর দাম। এ সিগারেট কি তার মত ট্যাক্সি-ড্রাইভারের খাওয়া পোষায় ?

গোল্ডফ্লেকের লোভ সে সামলাতে পারলে না। সিগারেট টেনে নিয়ে মুখে পুরে দেশলাই জ্বাললে; আগে সে জ্বলন্ত কাঠিটা ধরলে জোসেফের সামনে, তারপর নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে জ্বলন্ত সিগারেটটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। ব্যাপারটা হ'ল—ওর এই সিগারেট দেখার আগ্রহের মধ্যে দিয়েই সে যেন বলতে চাচ্ছিল—মনটা ঠিক তোমার দিকে দিতে আমি অনিচ্ছুক।

জোসেফ বললে—সিগারেটটা ভাল।

নরসিং হেসে বললে—না-খাওয়া নই। ফাইভ ফিফটি ফাইভ—

বাধা দিয়ে জোসেফ বললে—স্টেট এক্সপ্রেসটা বড় নরম।

হ্যাঁ। কিন্তু গন্ধ ভাল। তারপর থ্রি কাস্‌ল্‌। হাসলে নরসিং।

জোসেফ বললে—আমার সাহেব এইটাই খেতে ভালবাসেন। খানসামাটার সঙ্গে আমার হাফ প্রাইসে বন্দোবস্ত। স্টক বেশি থাকলে প্রায়ই দেয়। কম পড়লে তখন খোলা প্যাকেট থেকে একটা আধটা ক'রে সরিয়ে চার পাঁচদিনে এক প্যাকেট পাই।

নরসিং একটু হাসলে। তারপর বললে—আমাদের বিড়িই ভাল, বুঝলেন না। যেমন কলি তেমনি চলি, সময় বুঝে চলতে হয়, যেমন মানুষ তেমনি চাল হওয়াই ভাল। এক পয়সায় আটটা।

জোসেফও হাসলে। বললে—এটা আমাদের উপরি। মাসে মাইনে তিরিশ টাকা ; কামাই করলে এক টাকা তো কাটবেই—মধ্যে মধ্যে হাকিমের মেজাজ চড়লে দেড় টাকাও কাটে। তার ওপর ফাইন আছে।

নিতাই এগিয়ে এসে দরজার হ্যাণ্ডেল খুলে বললে—এই আসুন বাবু, এই আসুন।

জোসেফ গম্ভীরমুখে মৃদুস্বরে বললে—আজ আর ট্রিপ দেবেন না।

ট্রিপ দোব না ? কেন ?

কোচোয়ানেরা জোট পাকিয়ে আমার সাহেবের কাছে গিয়েছে। লাইসেন্স না নিয়ে আর ট্রিপ দেবেন না।

নরসিং বললে—হুঁ। সে এটা অনুমান করেছিল। অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে তার এই কাজে। এ কাজের হাল-হদিস, আইন-কানুন সে সবই জানে ; মোটর সার্ভিসের জন্যে সরকারের হুকুম চাই, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের হুকুম চাই, পুলিশ সাহেব গাড়ী দেখে পাস করবে—তবে হবে। তার উপর কথায় কথায় মামলা। বেশী যাত্রী চাপিয়েছ অমনি মামলা হয়ে গেল—দাও ফাইন। কোন কিছুর সঙ্গে গাড়ীর ধাক্কা লাগা দূরের কথা ছোঁয়াছুঁয়ি হল তো—মামলা ; দাও ফাইন। বেলাইনে যদি গাড়ী চালালে তো দাও কৈফিয়ৎ। যদি মনের মত না হল—হয়ে গেল মামলা। গাড়ীর আলো যদি কোন রকমে হঠাৎ বিগড়ে গেল তো হয়ে গেল মামলা। পুলিস রুখতে বললে রুখতে-রুখতে যদি এগিয়ে এসে পড়ল পাঁচ হাত তো নিয়ে নিলে নম্বর, দুদিন পরেই সমন—তার পর মামলা ; নির্ঘাৎ ফাইন হবে মামলায়। সরকারী বাদশাহী শড়ক ; গাড়ী তার নিজের ; লোকে চাপবে তাদের গাঁটের পয়সা দিয়ে কিন্তু তাতেও চাই লাইসেন্স —হুকুমনামা। নরসিংয়ের মগজটা গরম হয়ে উঠল। মাথার শিরাগুলোয় যেন গুণ-দেওয়া ধনুকের ছিলার মত টান ধরে গেল। প্রতি পায়ে আইন— প্রতি পায়ে আইন ! জিঞ্জির দিয়ে তামাম মুলুকের মানুষগুলোর পা বেঁধে রেখেছে। নরসিংয়ের দু'পাশের রগের দুটো শিরা মোটা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

গিবুবরজার ছত্রিদের এটা বংশগত বৈশিষ্ট্য। রাগ হলেই মাথার দিকে রক্ত ছোটে। সে অবশ্য সকল মানুষেরই ছোটে কিন্তু গিবুবরজার ছত্রিদের রক্ত ছোটে যেন বেশি পরিমাণে। সেই জন্য রাগ হলে তারা সামলাতে পারে না, দাঙ্গা বাধিয়ে বসে, খুনখারাবি হয়ে যায়, পরকে মারে, নিজেরা মরে; পরের হাতেও মরে আবার অবরুদ্ধ ক্রোধে মাথার শিরা ফেটে গিয়েও মরে, অজ্ঞান হয়ে যায়, নাক দিয়ে ঝুঁকিয়ে রক্ত গড়িয়ে মাটি বিছানা ভিজে যায়।

নিতাই নরসিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—তা হলে সিংজী?

নরসিং বললে—এক লোটা জল নিয়ে আয় তো।

নিতাই ডাকলে—রাম! এ রে রামা!

রামা একদল গেঁয়ো যাত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের হালচাল লক্ষ্য করছে। মোটরে যেতে প্রলুব্ধ করবার কথা ভাবছে। রাজী ওরা চট ক'রে হয় না। পায়ে হেঁটে বিশ মাইল চল্লিশ মাইল চলে যায়; মাথায় বোঝা, কাঁধে বাঁক নিয়ে পুরুষানুক্রমে হেঁটেই চলে ওরা।

নরসিং বিরক্ত হয়ে বললে—তুই নিয়ে আয়।

জোসেফ বললে—একটা কথা বলব?

নরসিং মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকালে।

চলুন না আমার বাড়ি। একটু চা খাবেন। ওখানে বসেই বরং দরখাস্ত লিখে সাহেবের কুঠিতে নিয়ে যাব। আমার দ্বারা যতটুকু হয় করব। হাজার হলেও আমার মনিব তো! এখানে সাহেব একটা রেকমেণ্ড ক'রে দিলে চলে যাবেন সদর শহরে। পুলিশের কাছে পাস করিয়ে—ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের পারমিশন নিয়ে কালই আবার ফিরে আসবেন।

নিতাই জল নিয়ে এল নরসিং কোন উত্তর দেবার পূর্ব্বেই। জলের ঘটিটা নিয়ে খানিকটা জল ঢকঢক ক'রে খেয়ে বাকীটায় মুখ কান ঘাড়টা ধুয়ে ফেললে, খানিকটা জল মাথার উপর দিয়ে ভিজিয়ে নিলে। তারপর বললে—চলুন, তাই চলুন।

যেমন অদৃশ্য রাসায়নিক কালির লেখা ফুটে ওঠে আগুনের উত্তাপ পেলে, তেমনি ভাবে পুরানো ছত্রিরা নতুন কালের ছেলেদের মধ্যে জেগে ওঠে ওই রক্তগরমের মধ্যে দিয়ে, ঠাণ্ডা জলে নরসিংয়ের মাথার গরম রক্ত ঠাণ্ডা হতেই সে একালের মানুষ হয়ে উঠল। মামীর কঠোর তিরস্কারে ত্রস্ত হয়ে যে নরসিং বড় হয়েছে, ইমামবাজারের বাবুদের বাড়ির দয়ার অন্নে সংস্কারের বাঁধনের মধ্যে থেকে যে নরসিং পথ খুঁজে নিয়েছে, মেজবাবুকে সেলাম বাজিয়ে বকশিশ নিয়ে যে নরসিং খুশি হয়েছে, ড্রাইভার রহমতকে তোয়াজ ক'রে যে নরসিং ড্রাইভিং শিখেছে—সেই নরসিং। যে নরসিং এই গত কাল তামাকওয়ালাকে প্রথমটা ধমক দিয়ে শাসন করার পর তারই কাছে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া পেয়ে তাকেই সসম্মানে ভেতরে বসিয়ে শ্যামনগর পর্যন্ত নিয়ে এসেছে ড্রাইভ ক'রে—সেই নরসিং।

* * *

গিরবরজার হাড়ির ছেলের বাড়ি। কিন্তু 'শূয়ার খুপরী' নয়। গিরবরজার ছত্রিরা হাড়ি ডোম বাউরীদের ঘরগুলোকে 'শূয়ার খুপরী'ই বলে থাকে। কথাটার মধ্যে ঘৃণা এবং অবজ্ঞা আছে তাই কথাটা কটু এবং অন্যায় শুনায়, অন্যথায় কথাটা সত্য। ছোট একখানা খড়ো ঘর। জানালা নাই, অন্ধকূপের মত অন্ধকার, ভিতরে ভ্যাপসা গন্ধ। এক কোণে থাকে হেঁসেল, এক কোণে থাকে ছাগল, এক কোণে থাকে হাঁস মুরগী, এক কোণে থাকে দু'চারটে মাটির হাঁড়িতে কিছু চাল কিছু ডাল কিছু পেঁয়াজ; চালের কাঠ থেকে ঝুলানো শিকেতে ঝোলে ক্ষেতের বা বাড়ির উৎপন্ন দুটো একটা কুমড়ো; মাচায় তোলা থাকে কাটকুটো ঘুঁটে। রাত্রিতে তারই মধ্যে তারা শোয়। ঘরের বাইরে বাঁশের খুঁটি দেওয়া একটা চালা। চালার এক পাশে হয় রান্না, এক পাশে বসে তাদের দিনের আসর।

জোসেফ গিরবরজার হাড়ির ছেলে, দু'পুরুষ আগে তার প্রপিতামহ এসে এখানে খেরেস্থান হয়েছে। তাকে মদের দোকানে দেখে যেমন চিনতে পারে নি

নরসিং গিব্‌বরজার হাড়ির ছেলে ব'লে, তেমনিই ঠিক চিনতে পারলে না তাদের বাড়িতে এসে তাদের বাড়িটাকে হাড়ির ছেলের বাড়ি ব'লে। পাকা দালান কোঠা নয়, মেটে বাড়িই, কিন্তু মেঝে পাকা, দাওয়া পাকা, লম্বা বাংলো ধরনের সারি সারি তিনখানি ঘর, তক-তক ঝক-ঝক করছে। ধবধবে চুনের কলি দেওয়া দেওয়াল, প্রতি ঘরেই বেশ মাঝারি আকারের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। দরজায় দরজায় খেরেস্তানী কায়দায় সাহেব লোকের—বাবুলোকের মত পর্দা ঝুলছে। বাইরের বাঁধানো বারান্দায় খান দুই চেয়ার, গোটা চারেক মোড়া সাজানো রয়েছে। উঠানটা মাটির কিন্তু চারিপাশে বাঁধানো নর্দ্দমা। উঠোনের এক পাশে তারের জালের একটা বড় বাক্সে কতকগুলি মুরগীর বাচ্চা কিলবিল করছে, পাখা ঝাড়ছে, বড় বড় মুরগীগুলো উঠানে নর্দ্দমায় খুঁটে খুঁটে খেয়ে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা হাঁসও রয়েছে। নর্দ্দমায় রাত্রের বাসি খাবার খাচ্ছে। একদিকে খানিকটা জায়গায় মাত্র গোটা চারেক বেলফুলের গাছ। শীতের সময় তারই মধ্যে গাঁদা এবং মোরগ ফুল লাগানো হয়েছিল, সেগুলি এই বৈশাখ মাসে শুকিয়ে গিয়েছে, এখনও সেগুলো তুলে ফেলে নি। বেলফুলের ঝাড় কয়েকটা ফুলে ভরে আছে। ঘরের চালের উপর একটা লাউয়ের লতা উঠেছে, কচি লতা, লাউডগা সাপের মাথার মত লতার ডগাগুলা বেঁকে যেন মুখ তুলে রয়েছে। অন্য পাশ থেকে উঠেছে একটা কুমড়ো লতা। দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। বাঃ! দিল খুশি হয়ে উঠল।

জোসেফ বারান্দায় উঠে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে—আসুন, বসুন সিংজী।

নরসিং উঠে এল, আবার একবার সব মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে বললে—বাঃ! ভারী চমৎকার আপনার বাড়ি!

জোসেফ হেসে বললে—কি করব, গরীব মানুষ, নিজেরাই খেটেখুটে সব ক'রে নিয়েছি। বসুন। তারপর ডাকলে—কই, মা কই?

বেরিয়ে এল জোসেফের মা। মোটাসোটা প্রৌঢ়া, পরিচ্ছন্ন কাপড় প'রে

সাদাসিধে বাঙালী গেরস্ত ঘরের মেয়ের মতই ; কোনখানে খেরেস্তানীর ছাপ নাই। নরসিংকে নমস্কার ক'রে বললে—আপনি আমাদের গিরবরজার সিংরায় বাড়ির ছেলে ? আমার কত ভাগ্যি যে আপনি আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন।

নরসিং একটু হাসলে।

জোসেফ ডাকলে রাম এবং নিতাইকে—আপনারা আস্থন, বস্থন।

রামটা অকারণ লজ্জায় ছোট ছেলের মত মুচকে মুচকে হাসছিল। নিতাই অবাক হয়ে দেখছিল সব। সে হঠাৎ রামকে মৃদুস্বরে বললে—এ শালাদের ভেতরে গুড় আছে বুঝলি রামা।

নরসিং ডাকলে, আয় রে, ব'স্।

রামা উঠে গিয়ে ভাবছিল, কোথায় বসবে, চেয়ারে অথবা মোড়ায় ! নিতাই নিজে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল, একটা মোড়া রামার দিকে ঠেলে দিয়ে বললে—ব'স্ না রে।

জোসেফ মাকে বললে—একটু চা তৈরী করতে হবে যে।

জোসেফের মা একটু অপ্রস্তুতের মত বললে—চা খাবেন ? প্রশ্ন করলে সে।

খাবেন বইকি। আমি নিয়ে এলাম।

জোসেফের মায়ের প্রশ্নটা নরসিংয়ের মনের ঠিক জায়গায় গিয়ে ঘা দিয়েছিল ; মনটা মুহূর্ত্তের জন্ম বিদ্রোহ ক'রে উঠল। খেরেস্তানের, মুসলমানের দোকানে চা সে খেয়েছে, কিন্তু এরা যে এককালে গিরবরজার হাড়ি ছিল ! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল দরখাস্তও লেখাতে হবে। এস. ডি. ও-র কাছে নিয়ে যেতে হবে এই জোসেফের সঙ্গেই। শ্যামনগর-পাঁচমতী সার্ভিস খুলতে হলে জোসেফের অনেক সাহায্য চাই। সঙ্গে সঙ্গে সে হেসে বললে—খাব বইকি। তারপর জোসেফের দিকে চেয়ে বললে—আপনি কিন্তু দরখাস্তটা লিখে দিন। আর আজই ওটা যাতে সাহেব রেকমেণ্ড ক'রে দেন তার ব্যবস্থা করতে হবে।

হ্যাঁ। আমার বোন আসুক, তার হাতের লেখাটা ভাল। তাকে দিয়েই লেখাব।

আপনার বোন?

হ্যাঁ। এখানকার মেয়েদের মাইনর ইস্কুলে চাকরী করে। এখন মর্নিং ইস্কুল, এই এল বলে। জোসেফের কণ্ঠস্বর একটু উদাস হয়ে উঠল—বড় ভাল মেয়ে, ম্যাট্রিক পাস করলে, আর পড়াতে পারলাম না। কি করবে? মিশনারী ইস্কুল—আমরা কৃশ্চান, চাকরীর সুবিধে হ'ল, ঢুকে পড়ল চাকরীতে।

নরসিং এ কথার কি জবাব দেবে? সে স্তব্ধ হয়ে রইল। কিন্তু এখানে বসতে সে যে অস্বস্তি অনুভব করছিল মুহূর্ত্তপূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সেটুকু এক মুহূর্ত্তে দূর হয়ে গেল। নিতাই রামের হাতে একটা চিমটি কাটলে। রামা একবার 'উঃ' ক'রে উঠল কিন্তু তার পরমুহূর্ত্তেই খুক্ খুক্ ক'রে হাসতে আরম্ভ করলে।

জোসেফ পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে ধরলে। থান ততক্ষণ। সিগারেট ধরিয়ে অকস্মাৎ প্রশ্ন করলে—কাল বললেন শুখনরামের গদিতে রয়েছেন। ওখানে উঠলেন কেমন ক'রে?

নরসিং তার মুখের দিকে তাকালে, মনে পড়ে গেল গত রাত্রের মদের দোকানের কথা। শুখনরামের গদিতে উঠেছে শুনে জোসেফ কিছুক্ষণ চুপ করেছিল, তারপর বলেছিল কাল হবে কথা। নরসিংয়ের ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল, সে বললে—কেন বলুন তো? ওকেই কাল ভাড়া এনেছি।

নিতাই বললে—বেটা ভুঁড়ের মেলাই টাকা, না মশাই? তারপর সে আকর্ণবিস্তার দাঁত মেলে বললে—আমরাও ছাড়ি নাই, পঞ্চাশ টাকা ভাড়া আদায় করেছি।

রামের মনে পড়ে গেল শুখনরামের থলথলে ভুঁড়িটা কেমন ভাবে মোটরের ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে দোল খাচ্ছিল। সে হি-হি ক'রে হাসতে আরম্ভ করলে।

জোসেফ গম্ভীর ভাবে বললে—লোকটা ভাল নয়। পাঁচ সাতবার লোকটার বাড়ি সার্চ হয়েছে।

বাড়ি সার্চ হয়েছে ? কেন ?

লোকটা গাঁজা চরস আমদানী করে লুকিয়ে লুকিয়ে।

নরসিং কোন জবাব দিলে না; তার বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় হয়ে উঠল; বোধ করি অপরিসীম বিস্ময়ই তার হেতু।

জোসেফ বললে—বাইরে থেকে চরস আফিং গাঁজা আনে পেশোয়ারী পাঠান পাঞ্জাবীরা, শুখনরাম এখানে তামাকের ব্যবসার সঙ্গে এ ব্যবসা চালায়। হঠাৎ হেসে বললে—তা না হলে অত বড় ব্যবসাদার নিজে দেহাত যায়! বুঝলেন না ব্যাপারটা ? এখানে-ওখানে গাঁয়ে দেহাতে যে সব এজেণ্ট আছে, তাদের কাছে এ ব্যবসায় মধ্যে মধ্যে নিজে না গেলে চলবে কেন ? এ সব কি কর্ম্মচারী দিয়ে চলে ?

নরসিংয়ের মনে পড়ে গেল ছোট্ট একটা তামাকের পেটী। গাড়ী দরুনে তামাক পড়ে থাকল ভাঙা গাড়ীর সঙ্গে মাঠে। ওই ছোট্ট পেটীটা সে নিয়ে এল কেন ? মনে পড়ল গদীর সামনে গাড়ী থেকে নেমেই শুখনরাম হুকুম দিলে, ছোটা পেটিয়াটো উতারো আগাড়ি। তারপর ছেলেকে বলেছিল—একদম উপরমে লে যাও, মেরা কামরামে ঠিকসে রাখ না।

কি ছিল সেটাতে ?

জোসেফ বললে—তা ছাড়া লোকটা মধ্যে মধ্যে মেয়ে কিনে আনে দেহাত থেকে। গরীব ঘরের মেয়ে—বিয়ে হয় না বদনামী হয়েছে বলে, কি বিধবা, মা-বাপে পুষতে পারছে না এমন মেয়ে—লোকটা বুঝে-শুঝে কায়দামাফিক কথাটা পেড়ে মা-বাপকে টাকা ধরে দেয়; নিয়ে আসে। কিছুদিন রাখে বাড়ীতে। ওইসব পাঞ্জাবী পেশোয়ারী যারা আসে তাদের খুসী করে ওদের দিয়ে। মধ্যে মধ্যে টাকা নিয়ে বেচেও দেয়।

নরসিং এবার চমকে উঠল। কথাটা মিথ্যা মনে হ'ল না। জোসেফের খবর পাকা খবর। সেই মেয়েটিকে মনে পড়ে গেল। সুন্দরী মেয়েটি, সব চেয়ে সুন্দর তার গায়ের রঙ আর চুল। মনে পড়ে গেল শুখনরামের সেই

বীভৎস ভঙ্গিতে কুৎসিত কদর্য্য গালাগাল: "আরে হারামজাদী কুত্তি বেসরমী কাঁহাকা! কেনে হাসছিস? কাহে? কাহে?...আরে মশা, ওই মেইয়া লোকটার বাত শুনবেন?...আড়াই শও রূপাইয়া দেকে উসকে হামি কিনিয়ে আনলম মশা। উসকে পোথোরকে ঘাটসে পাকড়কে লিয়ে গিয়েসিলো চারো জোয়ান—দোঠো মুসলমান, এক আদমী বাগদী, এক হাড়ি।"

চঞ্চল হেসে উঠল নরসিং।

নিতাই বলে উঠল—ওরে শালা!

রাম ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল প্রায়। তার গলা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। কাল যখন মোটরখানা গদির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন গদির ঐশ্বর্য্যের পটভূমিতে ওই শুখনরামকে দেখে তার গম্ভীর আদেশদৃপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে সে একবার ভয় পেয়েছিল। সে দেখাটা যেন অন্ধকারে কোন দুষমনের চেহারা—আবছা চেহারা! আর এই মুহূর্তে সে দুষমনের চেহারাটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জোসেফের মা এসে দাঁড়াল। রজনী!

জোসেফ বললে—হয়েছে?

হ্যাঁ। কোথায় দোব?

এই যে আমি ঠিক করে দি। হেসে নরসিংয়ের দিকে চেয়ে জোসেফ রজনী দাস বললে—একটা টেবিল পাতি? চা দেবার জন্যে?

হ্যাঁ। হ্যাঁ।

হঠাৎ নরসিং ক্ষেপে উঠেছে মনে মনে। দুনিয়ার সব কিছুকে ভেঙে চুরে দেবার ইচ্ছা হচ্ছে তার। হারামজাদে শুখনরাম, সুদখোর মুনাফাখোর বানিয়া—

লম্বা একখানি ভাঁজা টেবিল এনে সাট করে পেতে ফেললে জোসেফ। তার উপর পেতে দিল একখানি রঙীন চাদর। জোসেফের মা চায়ের কাপ এনে নামিয়ে দিলে। বললে—বলতে ভরসা হয় না, কিছু খাবার দেব? মিষ্টি? মিষ্টিতে তো দোষ নাই।

জোসেফ হেসে বললে—মায়ের সেকালের ধাঁচ এখনও গেল না। আরও বেশি একটু হেসে বললে—আমরা সব ভাইবেরাদার মা, এক কাজ করি ; এক সঙ্গে উঠি বসি। তা ছাড়া—। সকৌতুকে নরসিংয়ের দিকে চেয়ে বললে—কোন মদের দোকানে আমাদের দেখ নি তুমি।

নরসিং চুপ ক'রে রইল।

জোসেফই প্লেটে ক'রে মিষ্টি এনে নামিয়ে দিলে। তারপর একটা খাতা পেন্সিল এনে বসল, বললে—আপনার নাম, বাবার নাম, গ্রাম তো জানি—বলুন দেখি, দরখাস্তটা লিখে ফেলি। মেরীর আসবার সময় হয়েছে।

নরসিংয়ের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ও-জেলার সদর-শহরে এস. ডি. ও-র সঙ্গে যে কাণ্ডটা তার হয়ে গিয়েছে—সেই কাণ্ডটার কথা। আগে সে ইমামবাজারে ট্যাক্সি সার্ভিস চালাত এ কথা জানালেই একটা এনকোয়ারি হবেই। তার ড্রাইভিং লাইসেন্স ও-জেলার। কিন্তু তার উপায়ই বা কি ?

জোসেফ আবার তাগিদ দিলে—বলুন ?

নরসিং বললে—থাক্ এ বেলাটা। বলব, খানিকটা কথা বলতে হবে আপনার সঙ্গে। আজ বেলা হ'ল।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে এসে ঢুকল একটি মেয়ে। আবলুসের মত কালো রঙ, নিতাইয়ের চেয়েও কালো। ধবধবে কাপড় জামায় হয়তো তাকে বেশি কালো দেখাচ্ছে। কিন্তু ভারী ভাল লাগল নরসিংয়ের। ভারী ভাল লাগল।

জোসেফ বলল—এই যে মেরী। ইনিই আমাদের গিরবরজার সিংহরায় বাড়ির ছেলে।

মেরী মৃদু হেসে বললে—নমস্কার।

প্রতিনমস্কার করলে নরসিং।

নিতাই অবাক হয়ে গেল। একেবারে অবিকল ইস্কুলের দিদিমনি! জোসেফের সঙ্গে সে দিব্যি কথা বলতে পারে, ইয়ার্কি করতে পারে, মদ খেয়ে গালিগালাজ, এমন কি মারামারি করতে পারে। সহজে পাঞ্জা ধরেও বলতে

পারে—চলে আও লড়ো পাঞ্জা। কিন্তু জোসেফের বোনের সঙ্গে কথা বলতে গেলে সে কিছুতেই 'আপনি' না বলে পারবে না।

রামা কিছুতেই হাসতে পারছে না, মেয়েটার এত কালো রঙ তবু সে হাসতে পারছে না।

মেরী নীলিমা দাস। জোসেফ রজনী পরিচয় করিয়ে দিলে। মেয়েটি কথা বলে কম। অল্প কয়েকটি কথা বললে সে। বেশ হাসিমুখে কথা বললে—কথাগুলিও বেশ মিষ্টি লাগল নরসিংয়ের। শুধু মিষ্টি নয়—কথাগুলি যেন একটু ভারী ভারী মনে হ'ল। এ ধরনের ভারী কথা বেশ একটু মানী লোকেরাই বলে থাকে। ওই কালো মেয়েটি বয়সে জোসেফের চেয়ে ছোট, জাতে এক সময় হাড়ি ছিল ওর পূর্ব্বপুরুষ, তবুও আশ্চর্য্যের কথা—এ ধরনের কথা মেয়েটির মুখে বেমানান বলে মনে হ'ল না। সে হাসিমুখে বেশ সহজভাবে বললে—ছেলেবেলায় আমার ঠাকুরদাদা বলতেন গিরবরজার গল্প। সিংহরায়দের সিংহদের কথা। ভারী ভাল লাগত আমাদের। রাজা-রাজড়ার গল্পের চেয়েও ভাল লাগত। সে আরও একটু মিষ্টি হাসি হেসে চুপ করলে।

নরসিং গম্ভীরভাবে বসে ছিল, মেয়েটি আসার পর থেকেই সে একটু বেশি গম্ভীর হয়ে উঠেছে। সে একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।

নীলিমাও এক কাপ চা নিয়ে বসে ছিল, সে চায়ের মধ্যে চামচ ডুবিয়ে নাড়তে নাড়তে বললে—আবার আপনারা সব করবেন। এই তো আপনি নতুন পথ ধরেছেন।

নরসিং বললে—এতে কি আর সে দিন ফিরে আসে? এবার সে একটু ম্লান হাসি হাসলে।

সে আর এখন মোটর ড্রাইভার নরসিং নয়, গিরবরজার ছত্রি সিংহরায় বাড়ীর ছাওয়াল সে, কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ছে গিরবরজার একটি গল্প—খুব বেশিকালের কথা নয়, কোম্পানীর আমলের কথা। তখন সবে গিরবরজার

ছত্রিদের জ্বালানো আগুনের আঁচে অস্থির হয়ে মা-লক্ষ্মী গির্‌বরজা ছেড়েছেন, লাগাম-ছেঁড়া পাগলা লালঘোড়া নিয়ে ঘোড়দৌড়ের খেলা খেলছে ছত্রিরা, মনের ভিতরের ঘর-আলো-করা মতি তখন তারা হারিয়েছে, কিন্তু মাথার পাগড়ীর শিরপুছ বাতাসে পিছনের দিকে হেলে না পড়লে তাদের চমক ভাঙে, মনে হয়—এ কি! মাথাটা নুয়ে পড়ল নাকি? সেই সময়ের কথা। পাশের গ্রামে এক সদ্‌গোপ অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছিল। ছত্রিরা সদ্‌গোপদের বলত—চাষা। বড় বড় সিংহরায়রা বলত—চাষো। হালে বলদে, ধানে মরাইয়ে, ক্ষেতে খামারে, জলকর ফলকরে, বাগ-বাগিচায় লোকটা দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠল।

লোকে বলত—লক্ষ্মীর সংসার। হঠাৎ লোকটার মাথায় ভরকরলে বেওকুফির সয়তানী। সে নীলামে কিনলে সিংহরায়দের কতকটা আবাদী জমি। দখল নিয়ে দাঙ্গা হ'ল। জখম হয়ে পড়ে গেল দু'তিন লাঠিয়াল ক্ষেতের চষা মাটির উপর, দুষমনের রক্ত শুষে নিলে ছত্রিদের ক্ষেত। হটে যেতে হ'ল সদ্‌গোপকে। তার পর হ'ল মামলা। মামলা গির্‌বরজার ছত্রিরা করলে না, করলে সদ্‌গোপ। ছত্রিরা হ'ল আসামী। শিরপেঁচ বেঁধে গোঁফে চাড়া দিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। পিছনে হেলে রইল পাগড়ীর শিরপুছ। সদ্‌গোপের বরাত, আর ছত্রিদের মাথায় দেবতা বাবা ভিখারী মহাদেওজীর কৃপা—হঠাৎ সদ্‌গোপটা মরে গেল মামলার মধ্যেই। এর পর একদিন এক সওয়ারী অর্থাৎ পাল্কী এসে নামল সিংহরায়দের অন্দরের দরজায়। নামল এক বিধবা ছোট এক ছেলের হাত ধরে। ওই সদ্‌গোপের বিধবা সে। মামলাটা মিটিয়ে নিতে এসেছে। তবে হাঁ, মেয়েটি মেয়ের মত মেয়ে বটে। রূপ তো ছিলই, তার উপর লছমীর প্রসাদ পেয়েছে সে তখন। কপালের উপর চুলের সীমানা বরাবর মাথার ঘোমটা তুলে দিয়ে সিংহরায়ের সঙ্গে কথা বললে। কথার তার ধার কি! প্যাঁচ কি! জেদ না, জোর না, আইন না, তুললে সে ন্যায়-অন্যায়ের সওয়াল। বললে—ফৌজদারী মামলা আমি তুলে নিচ্ছি কালই। আপনারা ছত্রি, ব্রাহ্মণের নীচেই আপনারা, চিরকাল আপনাদের আমরা প্রণাম ক'রে এসেছি,

রাজা বলে এসেছি। আমার স্বামী ফৌজদারী করেছিল তার জন্য আমি কসুর মানছি। কিন্তু বিচার আপনাকে করতে হবে। এই আমার নাবালক বাচ্ছা। এর বাপ টাকা দিয়ে নিলামে জমি কিনেছে। সে নীলামে তার যোগসাজস থাকে, কোন কারচুপি থাকে বাজেয়াপ্ত করুন তার দাবী। কিন্তু যদি সে কসুর না থাকে, তার টাকা যদি হকের হয় তবে তার দাবী কায়েম করবার ভার আপনাকে নিতে হবে। আবার প্রণাম ক'রে সে চলে গেল ছেলের হাত ধরে পাল্কীতে সওয়ার হয়ে। ষোল কাহার হুল-হুম ক'রে যে সোর তুলতে পারলে না, গির্‌বরজা গাঁয়ে ওই মেয়েটির মিষ্টি অথচ জোরালো কথা ক'টি সেই সোর তুলে দিয়ে গেল। গির্‌বরজার সিংহরায়-বাড়ির ঘরের কোণে কোণে যেন সেই কথার ধ্বনি বাজতে লাগল। জমে রইল সে কথা।

সিংহরায় গেল তারপর সদ্‌গোপের বাড়ি। ছেড়ে দিয়ে এল জমি। ছেলের হাতে দিল একটি মিঠাইয়ের ঠোঙা আর বললে, যাও বেটা, তুমার জমির দখল তুমি লে লেও। হামার দাবী ছুট গিয়া।

মেয়েটি বেরিয়ে আবার তাকে প্রণাম করলে, আসন দিয়ে বসালে, তরিবৎ ক'রে ফল কেটে সাজিয়ে নামিয়ে দিলে সামনে। পান দিলে আর দিলে এক মোহর প্রণামী। বললে—শুধু তো এতেই আপনাকে আমি রেহাই দিতে পারব না; আমার আরও আরজী আছে। আমার বাচ্ছা বড় না হওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে দেখতে হবে। নজর রাখতে হবে।

গির্‌বরজার ছত্রি সিংহরায় পান চিবিয়ে মুখ লাল ক'রে ফিরে এল। লোকে বাহবা দিলে মেয়েটাকে। হাঁ, একটা রানীর মত মেয়ে। আচ্ছা বুদ্ধি, সিংহ-রায়কে বুদ্ধির খেল দেখিয়ে দিলে।

হা-হা ক'রে হাসল সিংহরায়।—ঠিক কথা। মেয়েলোকের সম্বল হল বুদ্ধি—পাতলা ছুরির মত তার ধার, মিহি কাটে কাটাই ওর ধরম। পুরুষ হল মর্দ্দানা, তার ধরম হল পৌরুষ। সে হল তলোয়ারের মত। পাতলা ছুরি তলোয়ারের গায়ের ময়লা সাফ করে চিরদিন। মাটি লাগলে চেঁচে ফেলে,

রক্ত মাংস লেগে থাকলে সাফা ক'রে দেয়। আমার গায়ে বে-ধরমীর ময়লা লেগেছিল পাতলা ছুরি সাফা ক'রে দিলে। এতে আর সরমটা কোথায়? নরসিং নিজে তলোয়ার ব্যবহার করে নাই, তার আমলে তার বাপ-দাদাদের মধ্যেও তলোয়ার ব্যবহারের রেওয়াজ উঠে গিয়েছিল। কিন্তু সে বলিদান দেখেছে। ছেত্তাদারের কোমরে থাকে ধারালো ছুরি, প্রতিবার বলিদানের পরই সে ওই ছুরি দিয়ে খাঁড়ার রক্ত-মাংস-মেশানো মাটি সত্যিই চেঁচে ফেলে দেয়। যাক সে কথা।

সিংহরায়ের কথাটা প্রমাণ হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। লছমীর প্রসাদ পাওয়া, পাতলা ছুরির মত ধারালো-বুদ্ধি যে মেয়ে, যে সওয়ালে হারিয়ে দিয়েছিল সিংহরায়কে, যে যোল বেহারার পাল্কী হাঁকিয়ে এসেছিল একদিন গির্‌বরজা—সে মেয়ে একদিন চার বেহারার ডুলী চেপে এসে উঠল সিংহরায়ের বাপের কাটানো পুকুরের পাড়ে আম-বাগিচার মধ্যে যে এক বাড়ি তৈরী করেছিল আরামখানা নামে, সেই আরামখানায়। তলোয়ারের চেয়ে পাতলা-ধার ছুরি তলোয়ারের তাঁবেদারিন হয়ে রইল এর পর চিরদিন।

কথাটা স্মরণ ক'রে নরসিং আজ আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। বললে—আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি।

জোসেফ বললে—ও বেলায় কখন আসছেন?

ও বেলা?

হ্যাঁ, দরখাস্তটা লিখতে হবে, কি সব কথা বলবেন বললেন।

হাঁ হাঁ। দুই হাতের তালু দিয়ে গোঁফের দুই প্রান্ত উপরের দিকে তুলে দিয়ে নরসিং বললে, আসব। ভেবে হিসাব ক'রে দেখি দাঁড়ান।

আবার খটকা লাগল?—হাসল জোসেফ।

খটকা?—নরসিং হাসল।

সমস্ত দুপুরটা ভাবলে নরসিং। অনেক ভাবনা। রামা রান্না করলে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে মন ঠিক করলে। বিকেল বেলা শুখনরাম গদীতে এসে বসতেই সে গেল সেখানে; একটা চাকর একটা গেলাসে সিদ্ধির ঠাণ্ডাই এনে ধরলে শুখনরামের সামনে। শুখন মদ খায় না, সিদ্ধি, তারপর এক কল্কে চরস, তারপর গাঁজা। শুখন নরসিংকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে বললে—কেয়া সিংজী? আঁা? আজ পাঁচমতী তো চার-পাঁচ খেপ দিলে! সাভিস খুলবেন?

নরসিং বললে—খুলি যদি আপনি শুদ্ধ নামেন ব্যবসাতে।

হামি? হা-হা ক'রে হাসলে শুখন। আরে সীয়ারাম! সিংজী, উ কেরেয়া খাটাকে কাম হামি পারবে না। হামারা বহুৎ কাম—ওহি কাম হামি দেখতে পারছি না ভাই।

নরসিং মুখটা এগিয়ে এনে বললে—আপনার সুবিধে হবে মোটর সাভিস থাকলে, পাঁচমতী থেকে শ্যামনগর আপনার মাল আসবে মোটরের মধ্যে।

শুখনরাম চকিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালে, কিন্তু কিন্তু কোন কথা বললে না।

নরসিং বললে—ছোট পেটীর মাল আপনার।

শুখনরাম এবার ঘাড় বেঁকিয়ে একটু ঝুঁকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে নরসিংয়ের দিকে এগিয়ে এল। সে দৃষ্টি দেখে নরসিং একটু শঙ্কিত হ'ল; চেয়ার টেবিলে বসে কথা বলতে বলতে মেজবাবুর হঠাৎ টেবিলের উপর কনুই রেখে ঝুঁকে পড়তেন; চোখের দৃষ্টি ছোট হয়ে আসত; তখন বুঝতে হ'ত মেজবাবুর মেজাজে রাগের পাকে জট পাকাচ্ছে; কিন্তু রাগটা প্রকাশ করবার উপায় নাই। শুখনরাম আবার উঠে খাড়া হয়ে বসল। তারপর হঠাৎ নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হাঁকে-ডাকে কর্ম্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। খাতার পর খাতা আসতে লাগল তার সামনে। সেই ব্যস্ততার মধ্যেই শুখন বললে—হামার এখুন অনেক কাম মশায়, আপনার কথা শুনব থোড়া বাদ।

সন্ধ্যার পর শুখনরাম নিজেই তাকে ডাকলে। ডাকলে একেবারে বাড়ির

ভিতরে। একটা চাকর গাঁজা মলছে। একটা তার গা টিপছে। শুখন বললে—বলেন মশা, আপনার বাত।

নরসিং বললে—আমি তো বলেছি। এখন বলেন আপনি।

কে আপনাকে কি বলিয়েছে ওহি বাত হামি পুচছি।

হাসলে নরসিং। বলবে কে শেঠজী! আমি গির্বরজার সিংহরায়-বাড়ির ছেলে। শ্যামনগরে কে কি করে, কি দিয়ে ভাত খায় আমি জানি না!

অনেকক্ষণ পর শুখনরাম বললে—বাস্, হামাকে কি করতে হোবে বলেন?

কি করতে হবে? প্রথম সার্ভিস লাইন খুলতে সাহায্য করতে হবে। দুশো-চারশো টাকা ধার দিতে হতে পারে। আমি গাড়ী বন্ধক রাখব অবিশ্যি। আর বিপদে-আপদে দেখবেন—এই আর কি!

বস্। ঠিক হ্যায়। হামার বাত হামি দেই দিলাম। বস্। এই পর্য্যন্ত—আউর কিছু না। উ সব গাড়ীকে বেবসামে হামি নামবে না। উ রাস্তামে সার্বিস—টাকাকে বরবাদ। গাড়ী তো তিন রোজমে লক্কড় ঝক্কড় হইয়ে যাবে। লেকেন—গাড়ী বন্ধক লিয়ে টাকা আপনাকে হামি দেবো।

দেখুন, ঠিক তো?

ঠিক—ঠিক—ঠিক।

আচ্ছা, রামরাম। এখন তা হ'লে আমি সব ঠিকঠাক করি। গাড়ীটাকে পাস করবার আগে খানিকটা মেরামত করা দরকার। মেরামত সে নিজেই করবে। ডাক্তারী পড়তে গেলে ছাত্ররা যেমন মড়া কেটে চিরে চিরে মানুষের শরীরে সব দেখে শেখে, রহমতের কাছে সে তেমনিভাবেই গাড়ীর সব চিনেছে। কতকগুলো পার্টস দরকার শুধু। শুখনরামের কাছে টাকা ধার নিয়ে কলকাতা থেকে সে সব কিনে আনবে। কলকাতা তাজ্জবকে শহর! দিদিয়া বলত বাগদাদের গল্প। বাগদাদের মত আজব শহর। মনে পড়ে রাত্রে রঙ-ধরা চোখে কসবীদের পাড়ার ঝলমলে আলোয় আলো করা রাস্তার কথা। একদিন ফূর্ত্তি ক'রে আসবে সেখানে। হঠাৎ নরসিং চমকে উঠল। সিঁড়ির বাঁকের

মুখে কোণে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে! ঘোমটা দিয়ে সাদা থান পরণে, বেরিয়ে আছে শুধু দু'টি নিরাভরণ হাত। নরসিংয়ের বুকের রক্ত তোলপাড় ক'রে উঠল। পিছনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে সে খপ ক'রে তার মাথার ঘোমটাটি খুলে দিলে।

সেই মেয়ে! গাড়ীর চাকায় লেগে দেশান্তরে এসে পড়া মাটির টুকরোর মত শেঠের বাড়ির সিঁড়ির কোণে পড়ে আছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে মেয়েটি তার দিকে চাইলে। নরসিং মৃদুস্বরে বললে—তোমাকে বেচে দেবে, পাঞ্জাবীর কাছে কি পেশোয়ায়ীর কাছে।

মেয়েটির মুখ সাদা হয়ে গেল ভয়ে।

নরসিং বললে—পার তো আজ রাত্রে বাইরে আমরা যেখানে থাকি সেখানে এস।

নয়

নিতাইয়ের নেশাটা আজ ভাল জমে নাই। নেশা না জমলে নিতাইয়ের ঘুম আসে না। নরসিং বলে—নেশাটি পুরো হলেই হারামজাদে নদীর দহের মাছ। অথৈ জলে আরামসে থির হয়ে যেন অঙ্গ এলিয়ে দিলে। আর নেশা না হলেই শূয়ারকি বাচ্চে ডাঙ্গার মাছ। ঝটপট-ছটফট—উল্লুক কাঁহাকা!

নিতাই দাঁত বার ক'রে হাসে, খুশিমনে হাসিমুখে স্বীকার ক'রে নেয় সিংজীর কথা। বলে—গা-গতরের 'বেথা' না মরলে ঘুম আসে কখনও? আপুনিই বলুন কেনে? তা ছাড়া নিতাই আরও খানিকটা দন্তবিকাশ ক'রে বলে—অল্প খেলে মাথা চনচন করে, তাগদ যেন বেড়ে যায়, মারামারি করতে ইচ্ছে হয়; হ্যা-রে-রে ক'রে ছুটে বেড়াতে আমোদ লাগে। ঘুম পালায় যেন

নদী পেরিয়ে ভূতের মত। এর পর গলা নামিয়ে বেশ মিষ্টি মোলায়েম সুরে বলে—আর পুরো নেশা হ'ল, তামাম দুনিয়া দুলতে লাগল, মাটিতে পড়লাম যেন মায়ের কোলে শুয়ে দোল খেতে লাগলাম, কানের কাছে চেঁচান না ক্যানে, চোখ আরও কিটিমিটি ক'রে বুজে আসবে, মনে হবে—শালা বর্গী এল বুঝি! বাস্, তারপর একবার নাক যদি ডাকল তো রাত ফরসা।

নেশা না জমায় নিতাইয়ের ঘুম আসে নাই; বিছানায় খানিকটা এপাশ ওপাশ ক'রে সে উঠে বাইরে এসে ঘুরছিল।

নরসিংও জেগে আছে। সে ভাবছে। অনেক কথা। নিতাই গল্প করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু নরসিং উত্তর দেয় নাই। শেষে সে বিরক্ত হয়ে বলেছে, মাথায় জল দিয়ে বাইরে খানিকটা হাওয়া লাগিয়ে আয়।

দিব্যি ফুটফুটে জ্যোৎস্না। শুখনরামের বাড়িটা নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্নার মধ্যে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে নিতাইয়ের মনে হ'ল, কেয়াবাৎ! বাড়িটার বাহার যেন জ্যোৎস্নার মধ্যে বেড়ে গিয়েছে!

বেটা ভুঁড়িরাম আচ্ছা বাড়িটা হাঁকিয়েছে, পেল্লায় কাণ্ড! আষ্টেপৃষ্ঠে শিক দিয়ে কাঠ দিয়ে যেন একটা সিন্দুক বানিয়েছে। মাছি গলবার ফাঁক নাই। দরজাগুলোয় ডবল পাল্লা, সামনে লোহার শিক-ঘেরা পাল্লা—পিছনে ইয়া পুরু শালকাঠের দরজা। দাওয়ার খিলেনগুলো শিকের ফ্রেম এঁটে বন্ধ। উপরের বারান্দার রেলিং আর মাথার ঝিলমিলির মাঝখানটা পর্য্যন্ত ফাঁক রাখে নাই; সমস্ত কাঠ দিয়ে বন্ধ। হঠাৎ তার মনে হ'ল—দিনের বেলা যেন ওগুলো খোলা ছিল। হ্যাঁ, খোলাই তো ছিল। স্থূল বুদ্ধিতে অনেক গবেষণা করেও সে ব্যাপারটার কিনারা করতে পারলে না। যাঃ বাবা, নেশা লাগল না কি?

সে চমকে উঠল—এ কি? আরে বাপ রে বাপ! তার সর্ব্বাঙ্গে, পায়ের নখ থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটা চমকের শিরশিরে প্রবাহ ছুটে গেল। সে পা টিপে টিপে ঘরে এসে ঢুকল, চাপা গলায় ডাকলে—সিংজী!

নরসিং অত্যন্ত বিরক্ত হ'ল। মেজাজ তার ভাল নাই। মাথা যেন গরম

হয়ে রয়েছে। 'শ্যামনগর পাঁচমতী' সার্ভিসের ভাবনা, লাইসেন্স চাই। শুখনরাম সাহায্য করবে বলেছে। কিন্তু না আঁচালে বিশ্বাস নাই ; শুখনরাম সব পারে। তবে নরসিং বড় কায়দা ক'রে ধরেছে শুখনকে। এখন ভয় হচ্ছে জোসেফকে। জোসেফকে পাশ কাটিয়ে শুখনরামের সঙ্গে দোস্তি করার জন্যে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে সে। সে আবার এস. ডি. ও-র ড্রাইভার। সাহেবের কান না ভারী ক'রে দেয়! 'গরজু' মিটমিটে ডাইন কাঁহাকা! গরজ কত! বলে, আরম্ভ করুন আপনি, আমারও ইচ্ছে আছে একখানা গাড়ী কিনে ওই লাইনে সার্ভিস চালাব। হাড়ির ছেলে কেরেস্তান হয়ে হুঁসিয়ার হয়েছে। তবে লোকটা মোটের উপর ভাল। তা ছাড়া আজ মদের দোকানেও একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে, আর একটু হলেই একহাত বেঁধে যেত। এইটা একটা খারাবি হয়ে গেল। ক'জন ড্রাইভার কণ্ডাক্টারের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে।

সন্ধ্যাবেলা এখানকার ড্রাইভারদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে গিয়ে তাসে বসেছিল নরসিং। রামেশ্বর, জাফর, রসিদ আর সে। মদের বোতল নিয়ে মদের দোকানের পাশেই ডিম, আলুর দম, মাংসের দোকানে। মস্ত একখানা খড়ের চালা, সামনেটায় নড়বড়ে টেবিলের উপর চায়ের ব্যবস্থা। সকাল থেকে বিকেল পর্য্যন্ত বড় একটা অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়িতে জল ফুটছে। টেবিলের উপর ময়লা কাপ আর মাটির ভাঁড় সাজানো থাকে। চালার ভিতরে কয়েকখানা ভাঙা চেয়ার, কয়েকখানা বেঞ্চি ; চেয়ার এবং বেঞ্চি-গুলোর মাঝখানে উঁচু লম্বা টেবিল। সকাল থেকে চায়ের খরিদ্দারেরা জমিয়ে রাখে দোকানটি। সন্ধ্যে থেকে চায়ের আসরে মন্দা পড়ে ; উননে কড়াই চড়ে। মাংসের কালিয়া, ডিমের কোর্ম্মা, আলুর দমের লোভনীয় গন্ধ উঠতে থাকে। পরোটা ভাজা হয়। দোকানে আসর দুটো—একটা সামনে, একটা পিছনে। চালাটার পিছনে পাঁচিলের ওপাশে একটা আড্ডা বারোমেসে বাঁধা খরিদ্দারদের আসর। দু'চার জন কোর্টের টাউট আছে, রামেশ্বরদের

একদল আছে, আরও আছে পাঁচমিশেলী একটা দল—কাপড়ের দোকানের কর্ম্মচারী, ধানচালের দালাল, রঙমিস্ত্রী, হারমোনিয়ম-মেরামতওয়ালা, এমনি ধরনের পাঁচ কারবারের পাঁচটি লোক, তারা এক পাশে আলাদা আলাদা মদ মাংস ডিম খায়, গোলমাল বড় করে না, চুপচাপ খেয়ে উঠে চলে যায়। বড় জোর স্ফূর্ত্তি বেশি জমলে হঠাৎ দু-চার কলি গান গেয়ে ওঠে।

রামেশ্বরদের আড্ডা আলাদা। ওদের প্রথম আড্ডা বসে মদের দোকানে, তারপর বোতল নিয়ে রেষ্টুরেণ্টের এই ভিতরের দিকে এসে বসে। পাকা বন্দোবস্ত, আপন আপন বসবার আসন পর্যন্ত ওরা কিনে রেখেছে। রামেশ্বর, জাফর, রসিদ এদের তিনখানা ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ার কেনা আছে। ক্লিনার ন্যাপলা, ফটকে, হাফিজ এদের আছে তিনটে টুল, সাজার অর্থাৎ চাঁদা ক'রে কেনা আছে আরও একটা ইজিচেয়ার, একটা ছোট টেবিল—আসলে সেটা চওড়া টুল, আর একখানা বেঞ্চি। চওড়া টুল অর্থাৎ টেবিলখানাকে মাঝখানে রেখে রামেশ্বররা ইজিচেয়ারে আরাম করে হেলান দিয়ে বসে। টেবিলের উপর পড়ে তাস। তে-তাসের খেলা চলে। নিঃশব্দে নির্দ্দিষ্ট তাসখানা সকলকে দু'তিনবার দেখিয়ে টেবিলের উপর ফেলে দেয় তাস তিনখানা। নির্দ্দিষ্ট তাসখানাকে চিনে তার উপর দান ধরতে হবে।

জোসেফ আজ মদের দোকানে আসে নাই। দোকানে গিয়েই নরসিং খবর পেলে সন্ধ্যাবেলাতেই জোসেফ দুটো বোতল কিনে নিয়ে বাড়ি গিয়েছে। নরসিং বুঝলে, জোসেফ তাদের প্রতীক্ষা করছে, বাড়িতে বসে। হুঁসিয়ার সয়তান লোকটা, নরসিংয়ের বাড়া ভাতে ভাগ বসাতে চায়। হেসে নরসিং বসে গেল দোকানে। ওদিক আর মাড়াচ্ছে না সে। রামাকে পাঠালে ডিম আর মাংস কিনে আনতে। রামেশ্বর এগিয়ে এসে বললে, রাম রাম সিং ভাই!

নরসিং হেসে বলে—রাম রাম!

রামেশ্বরের পিছনে এসে দাঁড়াল রসিদ। সেলাম ভাই।

সেলাম।

রামেশ্বর হঠাৎ তার হাত ধরে বললে—সব শুনেছি। পাঁচমতী সার্বিস খুলে দিলেন ?

নরসিং গম্ভীরভাবে বললে—দেখি ; চেষ্টা তো করছি।

হাত ধরে টেনে রামেশ্বর বললে—আসুন।

কোথায় ?

রসিদ বললে—আমাদের একটি আড্ডা আছে।

চলুন নিরিবিলি কথা হবে সেখানে। দোস্তি হবে।

রামেশ্বর বললে—শালা জোসেফটা আজ আসে নাই। ভাল হয়েছে। চলুন।

নরসিং একটু ভাবলে। যদি হাঙ্গামা বাধে! সে একবার নিতাইয়ের দিকে তাকালে। বেটা ডোমের চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে, গায়ের জামা খুলে কাঁধে ফেলেছে, মনে হচ্ছে একটা দুর্দান্ত মহিষ দাঁড়িয়ে আছে। এই মুহূর্তে রাম এসে দোকানে ঢুকল। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, ছোঁড়ার লাঠির হাতও ভাল। নরসিং উঠে দাঁড়াল, চলুন।

জাফর দাঁড়িয়ে ছিল জানালার ধারে। রসিদ গিয়ে তাকে ধাক্কা দিলে—চল্ বে।

জাফর নিঃশব্দে তার দিকে ফিরে তাকালে একবার, তারপর বললে—আসছি।

রামেশ্বর হেসে উঠল, বললে—নজরমে কুছ আগেয়া ? যানে দে উসকো।

নরসিং নিতাইকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বললে—মাল খাবি না বেশি।

খাব না ?

না। খাব বাড়িতে গিয়ে। খবরদার! অচেনা লোক, বিদেশ বিভুঁই।

•

মন্দ লাগল না আসরটা। হাঁ, আরাম আছে, তোয়াজ করবার মত ব্যবস্থা আছে। মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল নরসিংয়ের। সে একখানা ইজিচেয়ারে বসে বললে—বেশ জায়গা!

নিতাই দাঁত বার ক'রে বলে উঠল—কেয়াবাৎ হায়! গুরুজী আমাদেরও চেয়ার কিনে ফেলুন।

হারমোনিয়ম-ওয়ালাটার চুলের বাহার দেখে রাম মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। বাহবা, বাহবা! থাকে থাকে ঢেউ-খেলানো চুল টোপরের মত মনে হচ্ছে! সে নিজে চুলের উপর আঙুল দিয়ে ঢেউ-খেলানো থাক তুলতে চেষ্টা করতে লাগল।

রামেশ্বর বললে—জোফেস শালার সঙ্গে দহরম-মহরম করবেন না। শালা এস. ডি. ও-র ড্রাইভার, শালা গোয়েন্দা হায়।

হাঁ, উ হামারা মালুম হো গেয়া।

রসিদ মদের গেলাস ভরে টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে বললে—আজ তো কটা ট্রিপ দিলেন, কি রকম মালুম হ'ল?

খুব ভাল।—নিতাই বলে উঠল।

হারামজাদা ডোম, বে-আক্কেল—বেকুফ কাঁহাকা! শূয়ারকি বাচ্চার ঘটে যদি এক তিল বুদ্ধি থাকে! মনে মনে চটে উঠল নরসিং, কিন্তু এখানে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করা চলে না। সে হেসে বললে—প্যাসেঞ্জার ভাল হয় কিন্তু রাস্তার যা হাল তাতে তিন মাসেই গাড়ী খতম। আর—একটু থেমে বললে—প্যাসেঞ্জার ভাল হলেও ঘোড়ার গাড়ীওয়ালারা ছাড়বে না। ভাড়া নামাবে। তিন চার আনায় নামাবে। তাহলে তো আধেলা মুনাফাও থাকবে না। আবার একটু থেমে বললে—সুবিধে বুঝছি না। ভাবছি।

তারপর নিঃশব্দে মদ্যপান চলে।

নরসিং হঠাৎ তুললে শুখনরামের কথা।

রামেশ্বর বললে—বাপ রে বাপ! উ তো একঠো ঘড়িয়াল হায়।

রসিদ বললে—শালা জেনানীর কারবার করে। দেহাতসে জেনানী কিনে আনে—চালান ভেজে কলকাত্তা। উঃ, পরসাদ ভাই, দু-মাহিনা হ'ল একঠো যা ভেজলো! উঃ! শালা জাফর তো গাড়ী ছেড়ে দিয়ে বলে, হামভি যায়গা কলকাত্তা, শিয়ালদহসে উসকো ছিনা লেকে ভাগেগা। শালা!

রামেশ্বর তাস বার করলে।

রসিদ বললে—জোসেফের বহিনটাকে দেখিয়েছিস ভাই পরসাদ? জাফর তো বলে, কেরেস্তান হয়ে ওকে আমি বিয়ে করবো। তা মেয়েটা কালোতে খুবসুরাৎ আছে।

নরসিং বললে—থাক্ ও সব কথা।

আপনি দেখেন নি?

দেখেছি।

আ—। হেসে উঠল রসিদ।—নজর গির গেয়া?

কি সব যা-তা বলছেন? ভদ্রলোকের মেয়ে, আমাদের ভাইবেরাদারের বহিন, লেখা-পড়া শিখেছে—

ইয়া—। হা-হা-হা। দরদ আগেয়া! রসিদ বীভৎস উল্লাসে হাসতে লাগল। নিতাইও হাসতে লাগল, রামাও হাসছে। নরসিং হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, নিতাইয়ের মাথার চুলের মুঠো ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললে—হাসছিস ক্যানে উল্লুক? তোর বহিনকে নিয়ে যদি এমনি তামাসা করে?

রামেশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আরে ভাইয়া, ই কেয়া হোতা হ্যায়! ছোড়দো উ বাত। বৈঠ যাইয়ে। এ রশ্বিদ—ঢালো ঢালো।

রসিদ আবার গেলাস ভরতে লাগল। রামেশ্বর তাস বাঁটতে লাগল আপন মনে। গ্লাস শেষ হতেই সে বললে—আসুন দু'হাত খেলা যাক। নসীব আপনার দেখি। পাঁচমতী সার্ভিস ভাল চললে আপনার জিত।

তাস খেলতে লাগল সে। ঠোঁটের একটা দিক ঘন ঘন নাড়তে আরম্ভ করেছে। ঐ পাশের নাকের পেটিটা সঙ্গে সঙ্গে নড়ছে। নেশা জমে আসছে রামেশ্বরের।

নরসিং স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল রামেশ্বরের হাতের দিকে। লোকটা পাক্কা জুয়াড়ী। তাস তিনখানা পাশাপাশি ফেলে দিয়ে বললে—ধরুন দান।

নিতাই ঝপ ক'রে একটা সিকি ধরলে একখান তাসের উপর। উল্লুক বুড়বক মরেছে। সে বিষয়ে নরসিং নিঃসন্দেহ।

রসিদ ঝপ ক'রে ফেললে অন্য একখান তাসের উপর পুরা আধুলির একটা দান। রামেশ্বর বললে—আপনি ?

নরসিং ভাবলে একটু। সে রসিদের দানের পাশেই ধরলে তার দান পুরা টাকা।

রামেশ্বর তাস উল্টালে। সব ফাঁক। যেখানায় কেউ বাজী ধরে নাই সেইখানাই বাজীর তাস। সে দান টেনে নিলে। ফের ফেললে তাস। রসিদ এবার ঝপ ক'রে ফেললে এক টাকা। নরসিং তার দিকে তাকালে একবার। রসিদ এবার ঠিক তাসখানার উপর বাজী ধরেছে। প্রত্যাশা করেছে গতবার ঠকার পর এবার নরসিং তার তাসে বাজী ধরবে না।

নিতাই এক সিকিতেই দমে গিয়েছে ?

নরসিং পকেট থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে ধরলে রসিদ যে তাসে বাড়ী ধরেছিল সেই তাসেই।

রামেশ্বর তাকালে রসিদের মুখের দিকে। কি ইসারা হয়ে গেল।

নরসিং বললে—উঠান তাস।

রসিদ ঝুঁকে পড়ল টেবিলের উপর—ফিন হামারা তাসমে বাজী লাগায়া ?

নরসিং হেসে বললে—হাঁ, আপনার সনেই নসীব জড়ালাম। কই, উঠান তাস।

সবুর। রসিদ আরও একটু ঝুঁকে এসে বলল—এক বাত।

নরসিং বললে—তাস ঢাকা পড়েছে। খাড়া হয়ে বলুন কি বলছেন ?

উত্তরে আরও একটু ঝুঁকে বুকের আড়ালে গোটা টেবিলটাকে ঢেকে দিয়ে রসিদ বললে—আমার নসীবের ভাগা দেনে হোগা। জোসেফের বহিন—। দাঁত মেলে সে হাসতে লাগল। নরসিংয়ের দরদের পরিচয় সে পূর্ব্বেই পেয়েছিল তাই ওই জায়গায় খোঁচা দিতে চাইল।

নরসিং দু'হাতে এবার রসিদের দুই কাঁধে ঠেলা দিয়ে সজোরে বসিয়ে দিলে, কিন্তু ততক্ষণে টেবিলের উপরের তাস টাকা ছটকে পড়েছে, বাজীটা ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। রামেশ্বর চীৎকার ক'রে উঠল—উল্লুক কাঁহাকা! বাজী বরবাদ ক'রে দিলে।

নরসিং পাঁচ টাকার নোটখানি তুলে নিয়ে বললে—বাজীর টাকা দিতে হবে, বাজী আমি মেরেছিলাম।

রামেশ্বর চাকু ছুরিটা বার ক'রে বললে—বসুন। বরবাদ গিয়েছে, ফের ফেলছি তাস। এমন যায়।

উঁহু। বাজীর টাকা না দেন, গত বাজীর টাকাটা, নিতাইয়ের সিকিটা ফেরত দেন। আমি উঠব।

রসিদ উঠে দাঁড়াল। ইয়ে আপকা আবদার হ্যায়, না, কেয়া?

আবদার নয়—দাবী। নিক্‌লান টাকা।

চাকু ছুরিটা হাতে নিয়ে রামেশ্বরও উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে নরসিং তার হাত চেপে ধরলে। ছ'ফিটের কাছাকাছি লম্বা নরসিং, তার হাতখানাও সেই অনুপাতে লম্বা। বললে—দেখছেন কতখানি লম্বা আমি? আপনার চাকুর ফলা ছোট, আমার কলিজার সন্ধানও পাবে না।

নিতাইও উঠে দাঁড়িয়েছে নরসিংয়ের পাশে। কালো মহিষের মত চেহারা, তার উপর ছাতিখানা তার উঁচু হয়ে উঠেছে—হাতাহাতি মারামারির সম্ভাবনা। হারমোনিয়ম-ওয়ালার চুলের মোহ কেটে গিয়েছে রামার, সেও সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রসিদ আস্তিন গুটিয়েছে, ক্ষ্যাপলা ফটকেও উঠে দাঁড়িয়েছে। হাফিজ বসে ছিল। সেই সর্ব্বাগ্রে গম্ভীরভাবে বলে উঠল—পর্‌সাদ সাহেব অন্যায় আপনাদের। বাজী সিংজী মেরেছিল, রশিদ ভাই অন্যায় ক'রে ভেস্তে দিলে।

হাফিজের কথায়, মুহূর্ত্তে ফেটে পড়বার মত ব্যাপারটা শিথিল হয়ে ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়ল—বার্ষ্ট্ হওয়ার বদলে, পাংচার হওয়া মোটরের চাকার মত

চুপসে গেল। সকলেই তাকালে হাফিজের মুখের দিকে। রামেশ্বর বললে—ছাড়ুন, হাত ছাড়ুন, বসুন। নরসিং হাত ছেড়ে দিলে, কিন্তু বসল না, আসর থেকে বেরিয়ে এসে ডাকলে—নিতাই, রামা, আয়। বেরিয়ে আসবার দরজার মুখে ফিরে দাঁড়িয়ে হাফিজকে বললে—সেলাম ভাই দোস্ত। চললাম।

চলে এল ওখান থেকে। কিন্তু মদের বোতলটা উঠিয়ে আনতে ভুল হয়ে গেল। ওদিকে তখন মদের দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নতুন অচেনা জায়গা, মদের দোকানের খিড়কীর দরজাটা জানা নাই; নিতাই কপাল চাপড়াতে লাগল। নরসিং খারাপ মেজাজ নিয়ে বসে আছে। মদের জন্যই যে তার মেজাজ খারাপ হয়েছে তা ঠিক নয়, জোসেফের বোন মেরী বেচারীকে খামকা অপমান করলে; সে-অপমানের নিমিত্ত হ'ল সে-ই। জোসেফ কালই ওদের সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়েছিল। খামকা লোকগুলোর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। হয়তো ওরা এর পর শত্রুতা করতে আরম্ভ করবে। তার ভরসা শুখনরাম। সয়তান বদমাস শুখনরাম! সবাই এক কথা বলছে। ও আবার শেষ পর্য্যন্ত কি করবে কে জানে? নরসিংয়ের একমাত্র অস্ত্র—সে শুখনরামের গোপন আবগারীর মাল আমদানীর সন্ধান পেয়েছে। তার গাড়ীতে সে মাল এনে পৌছে দেবে। কিন্তু সয়তান যদি শেষ পর্য্যন্ত ওকেই ধরিয়ে দেয়? কিছু বিচিত্র নয়, শুখনরাম সব পারে। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠছে নরসিংয়ের। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক এই সময়টিতেই নিতাই সন্তর্পণে এসে ঘরে ঢুকল, চাপা গলায় ডাকলে—গুরুজী!

নরসিং চমকে উঠল চিন্তায় বাধা পেয়ে, রূঢ়দৃষ্টিতে ফিরে তাকালে সে নিতাইয়ের দিকে।

উঠে আসুন। তাজ্জব ব্যাপার!

কি?

আসুন না উঠে। চুপি চুপি। মজা দেখবেন আসুন।

নিতাই তাকে নিয়ে রাস্তার একটা গাছতলায় দাঁড়াল।—ওই দেখুন।

নরসিংয়ের বড় বড় চোখ দুটো বিস্ময়ে উত্তেজনায় বিস্ফারিত হয়ে আগুনে পোড়ানো ভাঁটার মত হয়ে উঠল।

সাদা কাপড় পরা, মাথা পর্য্যন্ত ঢাকা! স্ত্রীলোক, হ্যাঁ, স্ত্রীলোক। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গাছ-কোমর বেঁধে কাপড় পরেছে। মেথর-ঢোকা গলির মধ্যে শেঠজীর বাড়ীর পাঁচীলের মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। লাফিয়ে পড়বে! বিদ্যুচ্চমকের মত একটা কথা নরসিংয়ের মনে পড়ে গেল। আজই সন্ধ্যার আগে শুখনরামের সিঁড়ির কোণে দেখা হয়েছিল, সে আসতে বলেছিল। বুকের ভিতর যেন মোটরের ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে গেল তার। ছুটে সে এগিয়ে গেল। অদ্ভুত সাহস, আশ্চর্য্য মেয়ে! নরসিং তাকে মাটিতে পড়তে দিলে না, তার দীর্ঘ মজবুত হাত দুখানা মেলে দিয়ে মেয়েটাকে সে লুফে নিলে।

মেয়েটা চমকে উঠল, তারপরই কিন্তু চাঁদের আলোয় নরসিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে খিলখিল করে হেসে উঠল।

নিতাই ব্যাপারটা বুঝে হঠাৎ সেই পথের ধুলোর উপরেই একটা ডিগবাজী খেয়ে নিলে।—শালা! ই মেয়ে গাছ চালিয়ে দেবে রে বাবা!

* * * *

ফট্‌কির গ্রামের লোকেও ঠিক এই কথা বলে। ফট্‌কি মেয়েটার ডাকনাম। ভাল নাম একটা আছে, কিন্তু সে গ্রামের লোকে কেউ জানে না। ফুট্‌ফুটে মেয়ে, স্ফটিকের মত উজ্জ্বল লাবণ্যময় দেহবর্ণ দেখে ছেলেবেলায় ফটিক থেকে স্ত্রীবাচ্যে ফট্‌কি বলে ডাকত। সে নাম পরিবর্ত্তন করার কোন হেতু ঘটে নাই। বাল্যের লাবণ্য গ্রামের ধুলায় মাটিতে দারিদ্র্যের স্পর্শে মলিন হয় নাই, সূর্য্যের উত্তাপেও তার রঙ তামাটে হয় নাই। বরং বিপরীতই হয়েছে। রঙ তার দিন দিন উজ্জ্বল হয়েই উঠেছে।

ছেলেবেলায় তার মা তাকে নাচিয়ে আদর করত—'রাঙা মাটির ছবি

দেখলে তোরা পাগল হবি'। তিন চার বৎসর বয়স হ'তেই রঙীন ফেরানী প'ড়ে পাড়ায় বেড়াতে বার হলেই লোকে তাকে কোলে তুলে আদর করত। বাঃ, ভারী ফুটফুটে মেয়ে! কি নাম তোমার?

ফট্‌কি।

বা-বা-বা! ফুট্‌ফুট্‌ ফুট্‌ ফটিকমণি!

পাড়া-ঘরের ছেলের মায়েরা বলত—বউ করতে হয় তো এমনি। হ্যাঁ গো ফটিক, আমার বেটার বউ হবে?

ফটিক হেসে ঘাড় নেড়ে বলত—হব।

আরও একটু বয়স বাড়ল, পাড়ার ছেলেমেয়েরা মিলে খেলার বয়স হ'ল—তখন ছেলের দলের ঝগড়া বাধতে আরম্ভ করল ফট্‌কির স্বামিত্ব নিয়ে। ফট্‌কির পক্ষপাত ছিল না, সে দাঁড়িয়ে নির্ব্বিকারচিত্তে দেখত তাদের ঝগড়া, তারপর পুরাকালের বীর্য্যশুল্কার মত যেদিন যে বিজয়ী হ'ত, তার খেলাঘরেই বউ সেজে বসত।

আরও একটু বয়স হ'ল, ফট্‌কি তখন ফেরানী ছেড়ে কাপড় পরতে আরম্ভ করেছে, তখন ছেলেরা তার নাম দিলে 'ফটিকজল'। ফটকী মুখ টিপে টিপে হাসত, স্বাদ বুঝবার বয়স তখনও নয়, কিন্তু গন্ধটা মিষ্টি লাগত।

এই সময়েই হ'ল তার বিয়ে। দশ বছরের মেয়ে, আঠারো বছরের বর।

"অতি বড় ঘরন্তী না পায় ঘর, অতি বড় স্বন্দরী না পায় বর"—প্রবাদ-বাক্যটা ফলে গেল ফট্‌কির কপালে, বছর পার না হ'তেই ফট্‌কি বিধবা হ'ল; সব মনে পড়ে ফট্‌কির। বর মরে যাওয়ার সংবাদে ফট্‌কির দুঃখ হয় নাই, সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। আঠারো বছরের জোয়ান চাষীর ছেলে, তাকে দেখে তার ভয় হত। এক বৎসরের মধ্যে বার তিনেক সে এসেছিল ফট্‌কির বাপের বাড়ী, প্রতিবার ফট্‌কি কেঁদেছিল। এখন তার মধ্যে মধ্যে তাকে মনে প'ড়ে দুঃখ হয়। তার সেই লম্বাচওড়া দেহ, চওড়া ছাতি মনে পড়লে কিছুক্ষণের জন্য ফট্‌কি নিঝুম হয়ে বসে থাকে।

আরও বছর দুয়েক গেল। দুনিয়ায় হঠাৎ রঙ লেগেছে মনে হ'ল ফট্‌কির। মা বাপ সাবধান করত তাকে, বাইরে যেতে বারণ হ'ল; যেতে হলে মায়ের সঙ্গে যেতে হবে। একা বাইরে বার হলেই দু'পাশের বেটাছেলের চোখ তার উপরে এসে পড়ে; ফট্‌কি সঙ্কুচিত হয়, অস্বস্তি অনুভব করে—বুকের ভিতরটা গুরগুর করতে থাকে। একলা দেখলে অল্পবয়সীরা হেসে তাকে হাসাতে চেষ্টা করে; মুখ নামিয়ে চলে যায় ফট্‌কি। তারা গান গায়, ছড়া কাটে। একটা ছেলে মুখে মুখে ছড়া বাঁধতে পারত। সে ছড়া বাঁধলে একটা নয়, দু-চারটে।—

ফটিক জল, ফটিক জল, ও হায়, তেষ্টাতে ছাতি ফাটছে।
নাইকো খাওয়া, নাইকো ঘুম, বড় দুঃখেতে দিন কাটছে।

আরও একটা মনে আছে—

ফটিক জল, একবার মুখটি তোলো
মুচকি হেসে একটি কথা বলো।
ওগো একটু ফিরে চাও—আমার মাথা খাও।

মরণ! ফট্‌কির হাসি পেত। হাসতে তার ইচ্ছা হ'ত। কিন্তু ভয়, একটা আতঙ্ক তার বুকের ভিতরের সেই অদ্ভুত শিহরণকে স্তব্ধ ক'রে দিত। দুটোর ধাক্কায় সে কেমন হয়ে যেত। দুনিয়া হয়ে উঠত তেতো, কিছু ভাল লাগত না। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হ'ত, ছুতোনাতায় ঝগড়া—সে উপোস ক'রে কাঠের মত পড়ে থাকত। তখন সে সব বুঝেছে। বুকের ভিতরের অস্বস্তিটা আগে ছিল ধোঁয়ার মত, এখন সে যেন আগুনের মত জ্বলে উঠল। সত্যিই, ফট্‌কির মনে হ'ত শরীর তার জ্বলছে। পুকুরের জলে নেমে সে আর উঠতে চাইত না, শুধু মাটির উপর শুয়ে থাকতে ভাল লাগত। রাত্রে মা বাবার ঘরের ঠিক পাশের ঘরেই সে শুয়ে থাকত, ঘরে এসে খিল দিয়েই সে বিছানা তুলে ফেলে দিত। ঘুম হত না। জানালায় মধ্যে মধ্যে ঠুক্‌ঠাক শব্দ উঠত, ঢেলা লাগত জানালায়। কখনও শিসের শব্দ উঠত। কখনও চাপা মিহিগলায় গান শোনা যেত।

হঠাৎ একদিন মনে হ'ল, কোঠা-ঘরের জানালায় কে যেন উঠে বসেছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা কোঠাঘর। পাশাপাশি দুখানা কুঠরী, দক্ষিণের কুঠরীতে শোয় মা আর বাবা, উত্তর দিকের কুঠরীতে ফটিকি। উত্তর দিকের জানালাটা খোলা বারণ। ও জানালাটায় বাবার নজর চলে না। শব্দ শুনে ফটকি উঠে বসল, বুকের ভেতরটা যেন ঢেঁকি দিয়ে কুটছে। চীৎকার ক'রে ডাকতে ইচ্ছা হয়েছিল তার প্রথমে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল, না। সে স্থির চোখে চেয়ে রইল জানালাটার দিকে। শব্দ হ'ল—একটা কিছু যেন ভেঙে গেল। কি ভাঙল? কাঠের গরাদে? সঙ্গে সঙ্গে চাষীর ঘরের অসমান জানালার জোড়ের ফাঁকের ভেতর একটা শিক চালিয়ে ঠেলে জানালার খিলটা খুলে ফেললে বাইরে থেকে। একটা মুখ ঢুকল গরাদে-ভাঙা জানালা দিয়ে। গাঁয়ের বড় মোড়লের ছেলে। এতক্ষণে তার যেন চেতনা হ'ল, সে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করলে, খিল খুলে সে দরজা টানল, কিন্তু দরজা বাইরে থেকে শেকল-বন্ধ। মা বাবা তার দরজায় বাইরে থেকে শেকল দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখে। পিছন থেকে এসে জোরে জড়িয়ে ধরে ফেললে বড় মোড়লের ছেলে। সে প্রাণপণে বাধা দিতে চেষ্টা করলে, ডাকলে—বাবা, বাবা গো!

মোড়লের ছেলে বাঘের মত চেঁচিয়ে উঠল—খুন করে ফেলাব।

ও-ঘরে বাবার শব্দ পাওয়া গেল, সে ভূত দেখে ভয় পাওয়া লোকের মত বু-বু করছে, মা চেঁচিয়ে উঠল স্পষ্ট ভাষায়—মেলে গো, খুন করলে গো!

ফটকি তখন স্তব্ধ। মোড়লের ছেলে আবার চীৎকার ক'রে উঠল—দুয়োর ভেঙে গিয়ে কেটে ফেলাব। হাঁ।

মা বাবা চুপ হয়ে গেল।

মোড়লের ছেলে আবার ওই ভাঙা জানালা দিয়েই বেরিয়ে গেল, জানালা দিয়ে গলে লাফিয়ে পড়ল মাটির উপর। ফটকি তখন অজ্ঞানের মত পড়ে।

সে দিন ফটকির চিরকাল মনে থাকবে।

পরদিন বাবা মা তাকে গালাগালি করলে। বললে—তুই জলে ডুবে মর্, বিষ খেয়ে মর্, গলায় দড়ি দে।

সে কি করবে? সে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল মা বাপের মুখের দিকে।

কে? লোকটা কে বল্?

সে বললে—বড় মোড়লের ছেলে।

বাপ বললে—নালিশ করব আমি।

মা বললে—চেঁচিয়ে পাড়া গোল ক'র না। কেলেঙ্কারীর সীমা থাকবে না। জাতে পতিত করবে। চাষার খেঁটে কোথাকার!

বাপ গেল বড় মোড়লের কাছে। কি হ'ল কে জানে! তবে বাবা ফিরে এল বড় মোড়লের কাছে জমি-বন্ধক দেওয়া বন্ধকী দলিলখানা হাতে ক'রে। বললে—যা হয়েছে তা হয়েছে, মোড়ল বলছে, আর হবে না।

ফট্‌কি সমস্ত দিন যেন মাটির পুতুলের মত বসে রইল। রাত্রে মা বাবা সে—সকলে এক ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা হ'ল। মা বাবা ঘুমিয়ে গেল, তার কিন্তু ঘুম এল না, একটা আতঙ্ক যেন তাকে অস্থির ক'রে তুলছে। রাত্রি বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কও বাড়ছে। পেঁচা ডেকে গেল, সে চমকে উঠল। মনে হ'ল, কে শিস দিয়ে গেল! ডাকপাখী ডাকছে, ফট্‌কির মনে হচ্ছে কেউ কুক দিচ্ছে। চাষীর ঘর, ইঁদুর বেড়াচ্ছে, শব্দ উঠছে, ফট্‌কির মনে হচ্ছে ওপাশের ঘরের জানালায় কেউ উঠে জানালা খুলছে। ঘুম এল তার শেষরাত্রে। তাও কিছুক্ষণের মধ্যেই দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কে সে গোঙাতে লাগল; মনে হ'ল, কে এসে তাকে আক্রমণ করেছে। মা তাকে জাগিয়ে তুললে। কিন্তু লজ্জায় বলতে পারলে না, কি দুঃস্বপ্ন সে দেখেছিল।

দিন কয়েক পরই আবার একদিন সন্ধ্যার সময় গোয়ালে সে গরু বাঁধছিল। হঠাৎ বড় মোড়লের ছেলে গোয়ালে ঢুকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে।—চেঁচিয়ো না। চেঁচালে আমার কচু, তোমারই কলঙ্ক।

ফট্‌কি চেঁচালে না।

পরের দিন আবারও সে গোয়ালঘরে ঠিক সময়ে এসে ঢুকল।

একদিন বাইরে থেকে আর কয়েকজন ছোকরা এসে শেকল দিলে ঘরে। মোড়লের ছেলে ফট্‌কিকে নিয়ে মাচায় উঠল, কাস্তে দিয়ে চালের বাখারী কেটে ফট্‌কিকে নিয়ে চাল্ ফুঁড়ে উঠে ওপাশে লাফিয়ে পড়ল।

মোড়লের ছেলেকে চিরদিন মনে থাকবে তার। তার বুকে সে বাঘিনীর সাহস জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে। আশ্চর্য, দিনে ফট্‌কি সে সাহস খুঁজে পায় না। রাত্রির অন্ধকার যত ঘনাতে থাকে ফট্‌কির বুকে সাহসও তত জাগতে থাকে, কয়লার আঁচের মত। সন্ধ্যা থেকে সে ধোঁয়ায়, প্রথম প্রহরে সে থমথম করে, চৌকিদার হাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেলেই সে যেন ধ্বক ধ্বক ক'রে জ্বলে। সমস্ত বাধা বিঘ্ন পুড়িয়ে ছাই ক'রে সে তখন বেরিয়ে আসে।

হঠাৎ মরে গেল মোড়লের ছেলে। যেমন মানুষ তেমনি মরণ। প্রকাণ্ড উঁচু গাছে উঠেছিল কচি পাতা কাটবার জন্য। শখের লড়াইয়ে-মেড়া ছিল তার, সেই মেড়াকে খাওয়াবার জন্য লকলকে কচি ডাল এবং পাতা কাটতে উঠল। সেই গাছের ডগা থেকে পড়ল নিচে ঘাড় গুঁজে। বীভৎস সে মূর্ত্তি!

তারপর সেই ছড়া-বাঁধা ছেলেটা।

ফট্‌কির মা বাপ তখন নিশ্চিন্ত হয়েছে। মোড়লের ছেলে মরেছে। ফট্‌কি ম্রিয়মাণ হয়েছে খানিকটা। ফট্‌কিকে তার আলাদা ঘরেই শুতে দিয়ে তারা তাদের ঘরে শুচ্ছে। মেয়েটা যদি শুয়ে একটু-আধটু কাঁদে কাঁদুক, তা ছাড়া মা মেয়ে বাপ এক ঘরে শোয়াও ভাল দেখায় না।

ছেলেটা একদিন একলা পেয়ে বললে—ফটিকজল!

ফট্‌কির বুকে পাক খেয়ে উঠল আগুন, সে চারিদিক চেয়ে দেখে নিয়ে বললে, রাত্রে জানালার ধারে এস। শিস দিয়ো। চৌকিদার চলে যাওয়ার পর।

রাত্রে চৌকিদার হাঁক দিয়ে গেল। উঠে বসল ফট্‌কি। আস্তে আস্তে এসে সেই মোড়লের ছেলের ভাঙা জানালাটার ধারে বসল। সেটা আবার

মেরামত হয়েছিল, কিন্তু আজই আবার ফটিকি সেটাকে ভেঙে আলগা ক'রে ঠেকিয়ে রেখেছে। একটুক্ষণ বসে থেকে সে জানালার খিলটা খুললে। আরো একটুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে জানালাটা একটু ফাঁক ক'রে দেখলে। তারপর সম্পূর্ণ জানালাটা খুলে ফেললে। অধীর অস্থির হয়ে উঠেছিল সে।

তার নারী-জীবনের দেহগত স্বাভাবিক ক্ষুধা বৈধব্যের বাঁধে বাঁধা পড়েছিল সমাজ ও শাস্ত্রের নির্দ্দেশে। সে বাঁধের গায়ে রাত্রির অন্ধকারে সরীসৃপের মত বিষনিশ্বাস দিয়ে নির্গমন-পথ সৃষ্টি ক'রে গিয়েছে বড় মোড়লের ছেলে। অভ্যাস এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় রাত্রির অন্ধকারে সে ক্ষুধার্ত্ত ধারা উতলা এবং মত্ত হয়ে উঠেছে। ভালমন্দ পাপপুণ্য সব তার কাছে এখন তুচ্ছ।

অধীরতার মধ্যে সে আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না। ভাঙা জানালাটা দিয়ে নিচের দূরত্বটা একবার দেখে নিলে। মনে পড়ল মোড়লের ছেলের সঙ্গে গোয়ালের চাল থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ার কথা। পড়বে লাফিয়ে? কিন্তু জানালাটা অপরিসর বলে লাফিয়ে পড়ার তেমন সুবিধা নাই। উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় তার মস্তিষ্ক মন—সমস্ত কিছু তখন প্রচণ্ড কামনায় একাগ্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ সে উঠল, উঠে আলনা থেকে কাপড় নিয়ে জানালার মাঝের মোটা বাজুতে বেঁধে বাইরের দিকে ঝুলিয়ে দিলে। তারপর তাই ধরে সে ভাঙা জানালা দিয়ে গলে বাইরে এসে ঝুলে পড়ল, দেওয়ালের গায়ে পা রেখে ধীরে ধীরে সে নেমে এল নিচে। তারপর সেই ছেলেটা এল।

ফটিকির সর্ব্বাঙ্গ তখন যেন জ্বরগ্রস্তের মত তপ্ত হয়ে উঠেছে। বুকের ভিতরটা জলন্ত হাপরের মত মনে হ'ল, হাঁপাচ্ছে—নিশ্বাস পড়ছে আগুনের মত গরম। সে বললে—চল গাঁয়ের বাইরে। বড় মোড়লের আমবাগানে। সমস্ত রাত্রি সেখানে প্রেতিনীর মত নৃত্য করলে সে। সত্যই সে নাচলে, গান গাইলে। শেষরাত্রে ফিরে সে আশ্চর্য্য নিপুণতার সঙ্গে আবার ওই কাপড় বেয়ে উপরে উঠে গেল।

ছড়া-গাইয়ে ছেলেটা আর আসে নাই। তার কথা মনে হলে দিনের বেলা

ফট্‌কি মুখ মচকে ব্যঙ্গের হাসি হাসে। রাত্রের বেলায় মনে হলে মাটির উপর থুথু ফেলে।

মানুষের অভাব কোথায়?

পরের দিন রাত্রেই নতুন লোক এল আশ্চর্য্যভাবে। ফট্‌কি কাপড় বেয়ে নিচে নেমে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এল না। ফট্‌কি ভাবছিল। হঠাৎ এল একজন। গ্রামে হাঁক মেরে চৌকিদার ফিরছিল। সে এসে খপ ক'রে হাত ধরলে।

ফট্‌কি বললে—হাত ছাড়।

না।

খালি হাতটা দিয়ে সটান্ এক চড় বসিয়ে দিল ফট্‌কি তার গালে। বাগ্দী ছোঁড়াটা সঙ্গে সঙ্গে আর এক গাল পেতে বললে—ই গালেও মার।

ফট্‌কি আর না হেসে থাকতে পারলে না। বললে—মরণ!

তারপর এল গ্রামের জমিদার। ঘাটের পথে যেতে পথের মাঝখানে পড়ে কাছারী। হঠাৎ একদিন সে দেখলে কাছারীতে জমিদার এসেছে। ভাল লাগল জমিদারকে। দিনে ফট্‌কি আর এক ফট্‌কি। মুখ নামিয়ে ঘোমটা টেনে সে পার হয়ে গেল কাছারীর সামনেটা, কিন্তু রাত্রে নিজেই গিয়ে হাজির হ'ল কাছারীর পাশে। জমিদার কোন্ ঘরে থাকে সে তার অজানা নয়। নগদী গমস্তা গাঁয়ের লোক বলে—পুকুরের ধারের ছোট কুঠরীটা হ'ল বাবুকামরা। বাবুকামরার জানালায় সে গিয়ে টোকা দিলে। দু'বার, তিন বার, চার বার। জানালা খুলে বাবু ডাকলে—কে? সামনেই ছিল সে, একটু পাশে সরে গিয়ে দাঁড়াল দেওয়াল ঘেঁষে। চাপা গলায় বললে—খুলুন।

জমিদারকেও তার ভাল লেগেছিল। কিন্তু কথাটা প্রকাশ ক'রে দিল চৌকিদারটা। সেই ছিল আবার জমিদারের নগদী। সে কথা মনে হলে হাসে ফট্‌কি। হারামজাদার চাকরী গেল। জমিদারের কাছে একটি নূতন আস্বাদ পেলে সে।

কথাটা প্রচার হলেও গ্রামে কেউ উচ্চবাক্য করলে না। বাপ মা পর্য্যন্ত। বাপ নূতন জমি বন্দোবস্ত পেলে বিনা সেলামীতে। দু'একজন তাকে ধরলে সুদ-খাজনা মাফের সুপারিশের জন্য।

জমিদার চলে গেল। ওই চৌকিদার বাগ্দী ছোঁড়া এবার আক্রোশ মেটাতে একদিন তাকে ঘাট থেকে দিনে-দুপুরে তুলে নিয়ে গেল আরও তিনজন সঙ্গী জুটিয়ে। দু'জন মুসলমান, একজন হাড়ি। কিছুক্ষণ দেরী হলে হয়তো তার সন্ধান করা কষ্টকর হয়ে উঠত কিন্তু ফটকির জন্যে ব্যাকুল তরুণের গ্রামে অভাব ছিল না। তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটল। উদ্ধার ক'রে চৌকিদারটাকে আর তার সঙ্গীদের বেঁধে নিয়ে এল। ফলে ব্যাপারটা চাপা পড়ল না। মামলা হ'ল।

মামলায় অনেক কথা নিয়েই জেরা হ'ল, ঘাঁটাঘাঁটি হ'ল, কিন্তু দিনের বেলায় ফটকির মুখ দেখে বিচারক সব কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। জেল হয়ে গেল তাদের। কিন্তু এবার সমাজকে ঠেকানো গেল না। সমাজে তার বাপ পতিত হ'ল।

এই সময় এল সুখনরাম। সে আড়াইশো টাকা দিলে তার বাপকে। জরিমানা দিয়ে বাপ সমাজে উঠল। কথা দিলে—ফটকিকে সে ঘরে রাখবে না, নবদ্বীপ কি কোথাও পাঠিয়ে দেবে। নবদ্বীপের বদলে বাবা একদিন রাত্রে শুখনরামের তামাকের গাড়ীতে তাকে তুলে দিলে। শুখনরাম তাকে নিয়ে এল। ফটকি আপত্তি করে নাই। শুখনরামকে দেখে তার সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে, কিন্তু তার অনেক টাকা, অনেক সম্পদ, অনেক সম্মান। তাই আস্বাদ করবার জন্য সে এসেছে। একই রাত্রে শুখনরাম এবং শুখনরামের ছেলে, দু'জনের কাছেই তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। প্রথম ছেলে। বাপ তখনও অন্দরে আসে নাই। তারপর বাপ। শুখনরামকে দেখে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্রথমে ইচ্ছে হল, সে ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। মনে হল, এ কি অত্যাচার! মনে হল, কি মনে হল সে তা বুঝতে পারলে না। শরীর মন দুইই ঘিনঘিন ক'রে উঠল। কিন্তু কি করবে সে?

আজ সিঁড়ির কোণে নরসিংয়ের সঙ্গে দেখা। নরসিংয়ের ডাক তার মনে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। পাঞ্জাবীদের কাছে তাকে শুখনরাম বিক্রী করবে শুনে সে প্রথমটা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ পরেই তার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠেছিল। ভয়! কিসের ভয়? চলবে দেশ থেকে দেশান্তরে! স্ফটিকের মালার মত আজ এর গলায় কাল তার গলায়। তবে ওই মোটরওয়ালা কি বলে সেটা তাকে শুনতে হবে। ওকে দেখে ফটকীর নেশা লাগছে।

সন্ধ্যাবেলা থেকেই সে জর হয়েছে বলে শুয়ে ছিল। জর শুনে তার আজ ডাক পড়ে নাই। গভীর রাত্রে সে উঠে এসেছে।

ফট্‌কিকে লুফে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকে মোমবাতি জ্বাললে সে। রামা ঘুমচ্ছিল। ফট্‌কি হেসে বললে—ও কে?

আমার শালা।

তোমার পরিবারের ভাই? আপন ভাই?

হ্যাঁ।

হেসে ফট্‌কি লুটিয়ে পড়ে বললে—বলে দেবে না নিজের বোনকে আমার কথা?

চমকে উঠল নরসিং। মনে পড়ে গেল জানকীর কাছে প্রতিজ্ঞার কথা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নরসিং বললে—বউ আমার বেঁচে নাই। তুমি ব'স।

ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ফটকি দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুলের মালার মত বুকের উপর নিজেকে এলিয়ে দিলে। ফুলের মালা, কিন্তু আগুনের ফুল—নরসিংয়ের সর্ব্বাঙ্গে উন্মত্ত জ্বালা ধরিয়ে দিলে; কিন্তু সে ছত্রির ছেলে—প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য পাথরের মত শক্ত হয়ে বসে রইল। শুধু তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে। বড় মায়া হচ্ছে মেয়েটির উপর। শুধু মায়া—সুন্দর পাখী, ছোট্ট একটি হরিণ দেখে যেমন মায়া হয় তেমনি ধরনের মায়া। তার বেশি কিছু নয়। সমস্ত রাত্রি মেয়েটা আদরিণীর মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু নরসিং শুধু তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করলে মাত্র। আর

আফশোসও করলে, কেন তাকে সে হট ক'রে একটা ঝোঁকের মাথায় আসতে বলেছিল সিঁড়ির কোণে! জানকীর কাছে দেওয়া কসম মনে পড়েছে তার। মোটর ড্রাইভার হলেও সে ছত্রির ছেলে। কসম তাকে রাখতেই হবে। কঠোর সংযমে সে নিজেকে বাঁধলে। এ বিষয়ে তার অভ্যাসও আছে। মেয়েদের নিয়ে সে আমোদ করে, মাথামাখি করে কিন্তু ব্যাভিচার করে না। ফটকী ব'কে গেল অনর্গল। বলে গেল তার জীবনের কথা। নরসিং ভাবলে আর ফট্‌কির কথা শুনলে।

গভীর রাত্রের অন্ধকারে ফটকির লজ্জা নাই, ভয় নাই; পিশাচী বল সে পিশাচী, প্রেতিনী বল সে প্রেতিনী—অকুণ্ঠ মুখরতার সঙ্গে সে সব বলে গেল। ভোরের শুকতারা দেখা দিল আকাশে। নিতাই বাইরে থেকে ডাকলে—গুরুজী, ভুল্‌কো তারা উঠেছে আকাশে।

নরসিং সস্নেহে বললে—চল, তোমাকে তুলে দি বারান্দায়। রাত শেষ হয়ে এল।

তাকে বুকের উপর রেখে উপভোগ না ক'রে কেউ বিদায় দেয় এ ফটকির কাছে নূতন। সে এক মুহূর্ত্তে কেমন হয়ে গেল। নরসিংয়ের গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে সে হঠাৎ কেঁদে ফেললে।

নরসিং সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে; মুখে তার বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল।

ফট্‌কি বললে—আমাকে নিয়ে তুমি পালিয়ে চল এখান থেকে।

নরসিং আবার তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—আজ তুমি যাও, আমি ভেবে দেখি। কাল—কাল তোমাকে জানাব।

ফট্‌কী বললে—না না। তোমাকে ছেড়ে— না না।

নরসিং বললে—না নয়। কাল, কাল। আজ যাও তুমি। আর বেরিয়ে আসতে হলে চোরের মত নয়; কাল ভেবে দেখে যা হয় ব্যবস্থা করব আমি।

দশ

ওই মুখরা মেয়েটার সংস্পর্শে এসে নরসিং যেন কেমন হয়ে গেল। অতি মাত্রায় বিষণ্ণ এবং স্তব্ধ অথচ গম্ভীর।

জানকীর কাছে তার গায়ে হাত দিয়ে কসম খেয়েছিল। জানকী তাকে শপথ করিয়েছিল—যদি ইচ্ছে হয় তুমি আরও একটা দুটো বিয়ে কর। কিন্তু ওই সব খারাপ মেয়েকে নিয়ে পাপ করতে পাবে না তুমি। নরসিং কসম খেয়েছিল। সে শপথ সে বিচিত্র উপায়ে রক্ষা করে। মধ্যে মধ্যে তার জীবনে স্বৈরিণী নারী আকস্মিক ভাবে আসে। মদ খেয়ে দিল্ যখন দরিয়ার মত উথলে ওঠে তখন নিকটে যে এসে দাঁড়ায় তাকে সে টেনে নেয়; খুশিমেজাজের ঢেউয়ের সাপটাকে বার কয়েক লোফালুফি ক'রে আবার তাকে কৌতুকভরে কিনারায় ডাঙার উপর ফেলে দিয়ে স'রে যায়। কিন্তু এমনভাবে গম্ভীর কখনও হয় না। নেশার ঝড়ের হাওয়া যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সমানে উতলাও থাকে। হা-হা ক'রে হাসে। অশ্লীল কৌতুক রসিকতায় মাতোয়ারা হয়ে থাকে। নেশা কাটলে স্বাভাবিক অবস্থা। অনুশোচনা নাই, আবার আফশোষও করে না। সহজ মানুষ সকালে উঠে চা খেয়ে আপনার কাজে লেগে যায়। মোটরে স্টার্ট দিয়ে ইঞ্জিনে রেস দিয়ে লতিয়ে নিয়ে গাড়ী ছেড়ে দেয়।

গাড়ী ছোটে—নরসিং মধ্যে মধ্যে বিগত রাত্রির ঘটনা নিয়ে ইঙ্গিতে রসিকতা করে নিতাইয়ের সঙ্গে। কখনও কখনও নিতাই অনুযোগ করে—আর গুরুজী! আপনার কথা আপনাকেই ভাল। সিদ্ধপুরুষ মশাই আপনি, দিষ্টিভোজনেই খুশি।

নরসিং হা-হা ক'রে হাসে। বলে—ভাগ্ বেটা, হাড়ি কোথাকার! অনেক সময় গম্ভীর হয়ে যায়, বলে—ওরে, যে ছত্রির বাতের ঠিক নাই তার জাতের ঠিক নাই। সে কখনও ছত্রি নয়।

পথে দ্রুতধাবমান গাড়ীতে বসে দুপাশের রাহীদের মধ্যে হঠাৎ কোন

সুন্দরী তরুণীকে দেখে ঠিক তারই কয়েক মুহূর্ত পরেই সে হেসে ইসারা ক'রে নিতাইকে ডাকে—নিতাই !

সেই মানুষের পক্ষে এটা একটা প্রত্যক্ষ পরিবর্ত্তন। নিতাই কিন্তু একটু খুশি হয়ে উঠল, গুরুজীর মনে মেয়েটা রঙ ধরিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে।

নিতাই তাকে প্রায়ই অনুরোধ করে—এইবার সাদী ক'রে ফেলান গুরুজী। রাম তার দাদাবাবুর জন্য আন্তরিক দুঃখ অনুভব করে। মাঝে মাঝে সেও অনুরোধ জানায়।

গির্‌বরজা থেকে তার বাপও কয়েকবার পত্র দিয়েছে।

নরসিংয়ের কিন্তু ভাল লাগে না। কেন ভাল লাগে না তার কারণটা খুব স্পষ্ট নয় তার কাছে। জানকীকে সে খুবই ভালবাসত তাতে কোনই সন্দেহ নাই, তবে তার জন্য যে সে আজীবন অবিবাহিত থাকতে চায় তাও ঠিক নয়। সে বলে—দূর, দূর! যেমন তেমন একটা পরিবার হলেই হ'ল নাকি ?

ইমামবাজারে, রেলজংসনে, সদর শহরে শিক্ষিত ভদ্রবাড়ির মেয়েদের দেখে তার মনে হয়, তাদের গির্‌বরজায় কি ও-অঞ্চলে তাদের জাতের মধ্যে এমন মেয়ে একটিও পাওয়া যায় না। তার আফশোষ হয়।

আসলে তার রুচি তার অজ্ঞাতসারে পালটে গিয়েছে। এই রুচির পরিবর্ত্তনই তাকে নারীসঙ্গভোগে তার এই বিচিত্র অর্দ্ধনির্লিপ্ত পদ্ধতির অভ্যাস গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

কাল রাত্রে ফট্‌কির আবির্ভাবে তার অভ্যাস সত্যিই নাড়া খেয়েছে। ফট্‌কির রূপ, তার দেহের কোমলতা, জরোত্তপ্তার মত উষ্ণ স্পর্শ নরসিংয়ের নূতন রুচিতে—মুগ্ধ দৃষ্টিতেও মোহের সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে, তার দেহের প্রতি জীবকোষে-কোষে উচ্ছ্বাস তুলতে চেয়েছে। নরসিং বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করেছে—মনের মধ্যে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব উঠেছিল।

মনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল জান্‌কী। বাইরে ছিল ফট্‌কি। দু'জনের মধ্যে যেন একটা লড়াই চলেছে। এখনও সে লড়াইটা চলেছে।

নরসিং হঠাৎ বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। আশ্চর্য্য—জানকী তো নয়—জানকীর জায়গায় যে দাঁড়িয়ে আছে, সে যে নীলিমা—জোসেফের বোন মেরী নীলিমা।

সে চঞ্চল হয়ে উঠল।

অল্প দূরে বসে নিতাই অলসভাবে বিড়ি টানছিল, সে চকিত হয়ে নরসিংয়ের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—গুরুজী ?

নরসিং এবার তার দিকে ফিরে তাকালে।

কিছু বলছেন ?

একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নরসিং উঠে দাঁড়াল। বললে—ওঠ। গাড়ীখানাকে খুলে ফেলতে হবে। কি কি পার্টস বদলাতে হবে ভাল ক'রে দেখে নোব।

সব পাবেন এখানে ?

না পেলে কলকাতা যাব।

নিতাই উদার লোক, সে বললে—এবার রামকে নিয়ে যান। ওকে কলকাতাটা দেখিয়ে নিয়ে আসুন। হঠাৎ হি-হি ক'রে হেসে বলে উঠল—ছেড়ে দেবেন একদিন হাড়কাটা গলির ভেতর সন্‌জেবেলা।

এখানকার মোটর পার্টস সাপ্লাইয়ের দোকানটা নেহাত বাজে। প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। গিরবরজায় ছোট টেকোনার দোকান ক'রে সিংহ-বংশের ভৈরব সিং তার নাম দিয়েছিল—মহাজনী কারবার। ছত্রির ছেলে সে, নিজে হাতে তুলদাঁড়ি ধরত না—একজন সদ্‌গোপের ছেলে রেখেছিল, সেই জিনিস ওজন করত, ভৈরব সিং একটা ছোট তোষক পেতে বালিশে ঠেস দিয়ে গোঁফে তা দিত—পয়সা গুনে নিত। নিজের বসবার জায়গাটাকে বলত 'গদি'। ভৈরব সিংয়ের মহাজনী কারবারের মাল ছিল—মণখানেক নুন, এক টিন সরষের তেল, এক টিন কেরোসিন, পাঁচ সের নারকেল তেল, ধনে মরিচ লঙ্কা প্রভৃতি মশলার কোনটা পাঁচ পো কোনটা আড়াই সের। এখানকার মোটর পার্টস

সাপ্লাইয়ের দোকানটাকে দেখে শুনে ভৈরব সিংয়ের মহাজনী কারবারের কথা মনে হ'ল তার।

খানকয়েক টায়ার টিউব আর তেল—পেট্রোল-মোবিল-লুব্রিকেটিং অয়েল মাত্র সম্বল। কাঠের সেল্‌ফে অনেক রকম বাক্স সাজানো আছে কিন্তু তার ভেতরে জিনিস নাই। সিগারেটের দোকানদারদের খালি সিগারেটের বাক্স সাজিয়ে রাখার মত প্যাঁচ কষেছে। এদিকে দোকানটার সামনে সাইনবোর্ডটা ইয়া লম্বাই-চওড়াই একটা ব্যাপার। কাঠের ফ্রেমে আঁটা টিনের প্লেটে কালো রঙ লাগিয়ে তার ওপর সাদা হরফে ইংরেজী বাংলা দু'রকম হরফে নাম লেখা হয়েছে। দরজার দুই পাশে দেওয়ালে হরেক কোম্পানীর রঙচঙে বিজ্ঞাপন এঁটে রেখেছে। একটা কাঠের খুঁটো পুঁতে তার মাথায় সাদা রঙ লাগানো টিনের গোল প্লেটে লেখা—Ask here for Gargoil—Mobil Oil। সবুজ রঙের প্লেটে সাদা রঙের হরফে B. O. C. Motor Spirit-এর বিজ্ঞাপন, তিন কোণা হলদে প্লেটে লাল হরফে—Shell পেট্রোলের বিজ্ঞাপন দু-একখানা নয়, কয়েকখানাই বেশ সাজিয়ে মেরেছে দেওয়ালে। গুডইয়ার—ফায়ারস্টোন—ব্রিজস্টোন টায়ারের বিজ্ঞাপনগুলো অপেক্ষাকৃত বড়। সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন ডানলপ টায়ারের, দোকানের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত লম্বা একখানা টিনের প্লেটে মোটা মোটা হরফে বেশ সাজিয়ে লিখেছে—'ডানলপ টায়ার,' তার নিচে অপেক্ষাকৃত ছোট—'দি ন্যাশানাল টায়ার উইথ ইণ্টারন্যাশানাল পপুলারিটি।'

ঘরের ভিতরেও হরেক রকম বিজ্ঞাপন। নাইট্রোভাল্‌সপারের বিজ্ঞাপন—হ্যাভ ইওর কার স্প্রেড উইথ নাইট্রোভাল্‌সপার এণ্ড ড্রাইভ এ নিউ কার। মিনটেক্স—টোয়াইস অ্যাজ সেফ—ব্রেক লাইনিংস। এক্‌সাইড—এসকো—শক্তি ব্যাটারীর বিজ্ঞাপন। ফিল্‌ড ক্যাষ্ট্রোল—ডি বেণ্টের বিজ্ঞাপন। লুকাস ব্যাটারীর বিজ্ঞাপনে বাহার আছে; এক একটা অক্ষর এক এক টুকরো পিচবোর্ডে এঁকে পাশাপাশি সাজিয়ে লিখেছে—লুকাস ব্যাটারীজ। টেবিলের

ধারেই কাঠের সেল্‌ফের গায়ে আঁটা একখানা পিচবোর্ডে আঁকা একটি সুন্দরী মেমসাহেবের রাঙা টুকটুকে ঠোঁটের ফাঁকে মুক্তোর মত সাদা এবং সুন্দর দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে—মিষ্টি হেসে মেমসাহেব বাঁ হাত তুলে ডেকে বলছে—স্টপ—লুক—গ্লিসিন। মেটাল পলিশের বিজ্ঞাপন। এই ছবিটিই তার সবচেয়ে ভাল লাগল।

হঠাৎ মনে পড়ল তার ফটিকিকে। মেয়েটার যেমন রঙ তেমনি মুখখানি মিষ্টি। ওকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে ছবি আঁকলে সে ছবি মেমসাহেবের ছবির পাশে খাটো মনে হবে না।

শ্যামনগর থেকে জেলার সদর শহর পর্য্যন্ত বাস সার্ভিসের গাড়ীগুলো একটা ট্রিপ সেরে ফিরে আসতে সুরু করেছে। প্রথম গাড়ীখানা এসে পৌছল। গাড়ীখানার ড্রাইভার—রামেশ্বরপ্রসাদ, তারক কণ্ডাক্টার, পাগলা ক্লীনার ; তারা নামল গাড়ী থেকে। পাগলার ধরনটা সত্যিই খানিকটা পাগলাটে। আধ হাত ক'রে লম্বা চুল মাথায় ; মেমসাহেবদের মত বব ছেঁটেছে। তেলের ওপর পথের ধুলো লেগে প্রায় স্থায়ীভাবেই লালচে হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে চুলগুলো সামনে কি আশেপাশে ঝুলে পড়লে পিছনের দিকে মাথাটা ঝাঁকিয়ে দেয় পাগলা, চুলগুলো চাবুকের দড়ির মত লাফিয়ে ঠিক পাটে-পাটে বসে যায়।

দোকানের বাবুটির সঙ্গে নরসিংয়ের পরিচয় প্রথম দিন সন্ধ্যাতেই হয়েছিল—গতকাল সকালেও সে তেল নিয়েছে। বাবুটি নরসিংকে একখানা লোহার চেয়ার দেখিয়ে বললে—বসুন আপনি। সার্ভিসের গাড়ী এল, একবার দেখি।

পাগলা জামার পকেট থেকে একখানা চিরুনী বার করে চুলগুলো বার কয়েক আঁচড়ে নিলে। নরসিংয়ের দিকে তীর্য্যক দৃষ্টিতে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে রামেশ্বরপ্রসাদের দিকে চাইলে—সম্ভবত কিছু ইসারা হয়ে গেল।

রামেশ্বর গাড়ী থেকে নেমে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে হেসে বললে—রাম রাম। বসে আছেন ?

নরসিংও হেসে বললে—রাম রাম।

কি খবর? আর ট্রিপ দিয়া নেহি?

না।

কাহে?

লাইসেন্স হুয়া নেহি।

ও-হোঃ! ঠিক বাত। একটু চুপ ক'রে থেকে রামেশ্বর হেসে বললে—আজ সামকো আইয়েগা তো?

না। সংক্ষেপে জবাব দিয়ে নরসিং টেবিলের ওপর নিজের জিনিসের ফর্দ্দটা রেখে সেইটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে।

রামেশ্বরও ঝুঁকে পড়ল টেবিলের এক কোণে হাত রেখে।—কি ওটা? পার্টস কিনবেন বুঝি?

ফর্দ্দটা গুটিয়ে নিয়ে নরসিং বললে—হ্যাঁ।

মৃদুস্বরে রামেশ্বর বললে—আমাকে দেখাবেন। থোড়াথুড়ি কিছু আমি দিতে পারব।

নরসিং তার দিকে চেয়ে হাসলে। সে জানে। হাজার কড়া হিসাবের মধ্যেও ড্রাইভারেরা কিছু কিছু পার্টস চুরি করে। ইমামবাজারে বাবুদের বাড়ীতে সে যখন ড্রাইভারী করত—তখন এ কাজ সেও করেছে। কিন্তু এই লোকটির কাছে জিনিস কিনতে তার ইচ্ছা হ'ল না। প্রথম দিন থেকেই লোকটাকে তার ভাল লাগে নি। তার ওপর কাল যা ওর পরিচয় নরসিং পেয়েছে তাতে ওর ওপর দিল্ পর্য্যন্ত চটে গিয়েছে। নরসিং কোন উত্তর দিলে না।

রামেশ্বর নরসিংয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে—সস্তা হবে।

নরসিং এবার বললে—দেখি। এখানকার যা গতিক তাতে কলকাতাই হয়তো যেতে হবে।

রামেশ্বর একটু চুপ ক'রে থেকে হেসে বললে—আচ্ছা রাম রাম। বেরিয়ে

গেল সে ঘর থেকে। খালি মোটর-বাসটায় বসে স্টার্ট দিয়ে সেখানাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ড্রাইভারের সিটের পাশে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে পাগলা হেঁকে উঠল—চল্ রে আমার ময়ূরপঙ্খী লা—খিষ্টান পাড়ার দীঘির ঘাটে চল্। খিষ্টানপাড়া দীঘির পাড়ে যাবি—নীল জল খাবি রে মাণিক, সাধ মিটিয়ে নীল জল খাবি। নীল জল—নীল জল, নীল জল খেতে চলল ময়ূরপঙ্খী।

পিছন থেকে দোকানের বাবুটি চীৎকার ক'রে উঠল—এই, এই, এই! কিন্তু মোটর-বাসখানা বেরিয়ে চলে গেল, বোধ হয় শুনতে পেলে না। বাবুটি দোকানের চাকরটাকে বললে—এরা একটা হাঙ্গামা না ক'রে ছাড়বে না। বার বার বারণ ক'রে দিয়েছি ক্রীশ্চান পাড়ার দীঘিতে যাবি না। জোসেফ এস-ডি-ওর ড্রাইভার—তার ওপর পাদরী সাহেবেরা সুদ্ধ যদি জানতে পারে, তবে থ্রি ওয়াল্ড—তিন ভুবন দেখিয়ে দেবে।

চাকরটা বললে—কিছুদিন তো যায় নাই ওদিকে। আজ আবার দেখছি হঠাৎ ভূত চেপে গিয়েছে ঘাড়ে।

নরসিংয়ের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল। নীলিমাকে বিরক্ত করতে আরম্ভ করেছে আগে থেকেই; ব্যাপাটা নিয়ে খানিকটা জানাজানিও হয়েছিল, হয়তো জোসেফ সার্ভিসের আপিসে জানিয়েছিল। এস-ডি-ওর কানে তুলবে, পাদরী সাহেবদের জানাবে—এ কথা বলেছিল। যার ফলে রামেশ্বর-পাগলার দল ও-দিকে আর যাচ্ছিল না। আজ যে গেল সেটা নরসিংকে খোঁচা দিয়ে তার ওপর আক্রোশবশেই—নীল জল হাঁকতে হাঁকতে চলে গেল ক্রীশ্চান-পাড়ার দীঘির ঘাটে।

সয়তান! ভাইবেরাদারের মা-বহিনের ইজ্জত যে রাখতে জানে না—সে পুরা শয়তান।

বাবুটি এসে ঘরে ঢুকল। বললে—ফর্দ্দটা রেখে যান। আজই আমি হেড আফিসে বাসের মারফতে পাঠিয়ে দোব; দু-তিন দিনের মধ্যে মাল পেয়ে যাবেন।

নরসিং বললে—আগে দাম কষে আমাকে দিতে হবে। টাকা বুঝে যদি বাদসাদ দিতে হয়—দিয়ে অর্ডার দোব। নরসিংয়ের মনের কথা হ'ল—সে এখানকার দাম দেখে কলকাতা যাওয়ার কথা বিবেচনা করবে। কলকাতায় তার জানাশুনা দোকান আছে, লোক আছে, যাদের মারফৎ—নামে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কাজে প্রায় নূতন জিনিস—সস্তাদরে মেলে। দামের তফাতটা সে হিসেব ক'রে দেখবে। তেমন বেশি তফাত না হ'লে সে কলকাতা যেতে চায় না। এখানে জিনিস কিনে একটা কারবারের সম্বন্ধ পাতাতে চায়। এদের সঙ্গে মুখ রাখতেই হবে—না রাখলে চলবে না। মনে পড়ে ইমামবাজারের জেলার সদর শহরের সব চেয়ে বড় মোটর সার্ভিসের মালিক—মোটর পার্টসের দোকানের মালিক বুধাবাবুর কথা। বুধাবাবু এক মুঠোয় রাখেন জেলার হাকিমদের—অন্য মুঠোয় রাখেন শহরের গুণ্ডা বদমায়েসদের; বড় বড় বাবুলোক—যাদের মোটর আছে তারাও থাকে তাঁর হাকিম-ধরে-রাখা মুঠোর মধ্যে। ফলে যত ড্রাইভার ট্যাক্সিওয়ালা ক্লীনার কণ্ডাক্টার বুধাবাবুর কাছে সার্কাসের পোষমানা বাঘের মত থাকে। দাঁত নখ বার করতে চেষ্টা করলেই বুধাবাবু হুঁসিয়ারীর সঙ্গে আন্দাজ ক'রে কখনো চালান হাকিমী মুঠোর ঘুষি, কখনো মারেন গুণ্ডাধরা মুঠোর রদ্দা। কখনও দুই মুঠোই চালিয়ে দেন একসঙ্গে। এখানকার দোকানের মালিক থাকে জেলার সদর শহরে। তাকে নরসিং জানে না—কিন্তু এটুকু সে জানে যে এ-সব কারবারের কারবারীরা সবাই প্রায় বুধাবাবু। খানিকটা কম—আর খানিকটা বেশি। বড় ভাই আর ছোট ভাই। সহোদর নয়, মাসতুতো ভাই। এদের স্বপক্ষে আনতে না পারলে সার্ভিস চালানো কঠিন হবে। হাকিম মুঠোর মধ্যে থাকলে লাইসেন্স মঞ্জুরীতে প্যাঁচ কষবে। হয়তো নিজেরাই দিয়ে দেবে একখানা গাড়ী। কিম্বা গুণ্ডা দিয়ে ছুতোনাতা ক'রে একটা হুজ্জৎ বাধিয়ে দেবে। কাজ কি? বিশ ত্রিশ কি আরও পাঁচ দশ টাকা যদি বেশিই লাগে তো লাগুক। হাল-চাল যখন খারাপ তখন ও-টাকাটাকে গুনগারী মনে করলে চলবে না। মালিকের সঙ্গে

আলাপটা বেশ জমিয়ে নিতে হবে প্রথম থেকেই। মালিক অবশ্যই বড়লোক—তার সঙ্গে নরসিংয়ের ঠিক দোস্তি হওয়া সম্ভবপর নয় কিন্তু তা ব'লে ওদের বাস-সার্ভিসের ড্রাইভারদেরও সমান নয় সে। সে একখানা ট্যাক্সির মালিক—দোকানের খরিদ্দার—সুতরাং তাদের চেয়ে বেশি খাতির তার প্রাপ্য এবং সে তা পাবেও। তা ছাড়া এ জেলায় তার আরও একটা খাতির আছে। গিরবরজার ছত্রি-বাড়ির ছেলে সে। মালিকের সঙ্গে আলাপ জমে গেলে ওই রামেশ্বরোয়া পর্য্যন্ত খানিকটা কায়দায় আসবে। মন সে স্থির ক'রে ফেললে এই মুহূর্ত্তে। তাই যাবে সে। আজই। সে উঠে পড়ল। নিতাইকে গাড়ীটা সাফ করবার জন্য—মেরামতের জন্য খুলে ফেলতে বলেছে। সে আবার কতটা কি ক'রে ফেলেছে এর মধ্যে কে জানে?

আচ্ছা নমস্কার বাবুসাহেব! বেরিয়ে পড়ল সে। এতক্ষণ পরে সে সহজ হয়ে উঠল। শীতকালের ভোরে মোটরের ইঞ্জিন যেমন ঠাণ্ডা মেরে যায়, কিছুতেই স্টার্ট নেয় না—তেমনি অবস্থা গিয়েছে তার এতক্ষণ। এইবার স্টার্ট নিয়েছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে হনহন ক'রে চলল সে।

আটটা বাজে। শহরের বাজার হাট এরই মধ্যে জমে উঠেছে। চায়ের দোকানগুলোর আসর জমে উঠে এবার ভাঙতে শুরু করেছে। একটা দোকানে সে ঢুকল। দোকানটার সামনেই চৌমাথা। একটু দূরে মিউনিসিপ্যালিটির বাজার। বাজারের আধ রশি পূর্ব্বদিকে ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা। বাজারের সামনে গাড়ীগুলো এসে দাঁড়িয়েছে। দু'তিনখানা চৌমাথা পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে ভাড়া খুঁজছে। নরসিংয়ের চায়ের তৃষ্ণাটা প্রবল নয়, গাড়োয়ানদের হালচাল দেখবার জন্যই সে দোকানটায় ঢুকল। চারখানা গরম সিঙ্গাড়া আর এক কাপ চা নিয়ে সে বসল। আজ ওদের হাঁকডাক খুব জোর।

পাঁচমতী বাবু, পাঁচমতী। ভাড়া এক আনা কমলো বাবু আজ থেকে। সাত আনা সিট। সাত আনা।

একজন পানওয়ালা মুখ বেঁকিয়ে হেসে বললে—কি রে সোভান! এক

দিনে ঘাল খেয়ে গেলি ? কমিয়ে দিলি এক আনা ? সোভান বেশ আস্ফালন করেই উত্তর দিলে—হাঁ। দরকার হোবে তো আউর ভি কমাবে। দু আনা সিট চালাবে। হাঁ।

তারপর ?

তারপর শালা ডাণ্ডা।

সোভানের পিছনের গাড়ীর কোচোয়ান বলে উঠল—সাবাড় করে দিবো শালাকে শেষ পর্য্যন্ত। বারোখানা গাড়ীতে কম-সে-কম তিরিশ আদমী আমরা আছি—যাবে ফাঁসী এক আদমী। বাস্। লোকটার মুখের দিকে চেয়ে নরসিংয়ের মনে হ'ল—লোকটা সত্যিই খুন করতে পারে।

সোভান বললে—হাঁ। তা না তো কি ? মোটর সারবিস ক'রে আমাদের অত বড় রুটির পথটা মেরে দিলে। শহরের মাঠ থেকে শ্যামনগর—পঁচিশ বিশখানা গাড়ী খাটত, ঘোড়ার গাড়ীর সার লেগে যেত। এক একখানা গাড়ীর চারটে ক'রে ঘোড়া লাগত। একটা খেপ মারলে কম-সে-কম—চারটে টাকা রোজগার। সোকালে একবার যাও—ফিন এসো—বিকেলে একবার যাও—এসো—বাস্! চারটে টিরিপে চার-চারে ষোলো টাকা—শালা সিবিল সারজেনের ফি। সে পথ মেরে দিলে। তা বলি—লে রে বাবা লে। তোদেরই রাজত্বি কোম্পানীর থাকল—আংরেজের কল আনলে শহরের শেঠজী, আনুক। মেরে দিলে গরীবের রুটি। দিক। আঠারো-উনিশখানা গাড়ী পেটের দায়ে ভাগলো। আমরা শালা দশ-বারোখানা কোনো রকমে দিন গুজরান করছিলাম—আবার এল মোটর! দিবো শালাকে এবার জানে মেরে।

নরসিং দোকান থেকে বেরিয়ে এল। তাকে দেখে সোভান থমকে গেল। পাশের সেই কোচোয়ানকে ইসারা ক'রে দেখিয়ে দিল। নরসিং দেখলে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করলে না। একটা সিগারেট ধরিয়ে চলে এল।

দুনিয়ার যত গোলমাল ওই পেটের রুটি নিয়ে। ওরা যে চটে উঠেছে—খুন করব বলছে, তার জন্যে নরসিং ওদের ওপর খুব রাগ করতে পারলে না। কিন্তু

সেই বা কি করবে? তারও রুটি চাই। তা ছাড়া দুনিয়ার হালই এই। ওই ইমামবাজার থেকে রেলজংসন পর্য্যন্ত সে-আমলে কারবার ছিল গরুর গাড়ীর। টাপরবাঁধা পঞ্চাশখানা গরুর গাড়ী হাজির থাকত জংসন ইষ্টিশানে। তারপর হ'ল ঘোড়ার গাড়ী। তারপর পড়ল রেল-লাইন, ঘোড়ার গাড়ীকে পালাতে হ'ল। তারপর হয়েছে মোটর-বাস। মোটরের ক্ষমতা [illegible]—সে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে, টিঁকে আছে। রাস্তা ভাল হ'লে ট্রেনের চেয়ে জোরে ছুটতে পারে সে, ভাল মোটর হলে ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসের চেয়েও আরাম দিতে পারে সে। ইমামবাজারের বাবুদের একবার সখ হয়েছিল কলকাতায় প্রাইভেট ট্যাক্সির কারবার করবার। ট্যাক্সির মিটার থাকত না। বড় বড় লোকেরা দিন ঠিকে ক'রে ভাড়া নিত। আমেরিকা থেকে টুরিস্ট আসার ধুম পড়েছিল তখন। তাদের এন্তার পয়সা—দিলদরিয়া মেজাজ—মোটা মোটা ভাড়া দিত তারা। তাদের জন্যে বাবুরা একখানা মাষ্টার-বুইক গাড়ী কিনেছিল। সে গাড়ী নরসিং চালিয়েছে। তার আরাম কি—ভেতরের কায়দা কি! তারই জোরে মোটর টিঁকে আছে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। মোটরের স[illegible] পাল্লায় হার মেনে যদি ঘোড়ার গাড়ীকে পালাতে হয় তবে পালাতে হবে, আর সে কি করবে! আর তাকে না হয় ডাণ্ডা মেরে খুনই ক'রে ফেললি—কিন্তু তাতে নরসিংই মরবে, মোটর মরবে না। নরসিংকে খুন করার খবর রটবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে মোটরের কারবারীদের চোখ পড়বে এই পথের উপর। একখানার জায়গায় দু'চারখানা ট্যাক্সী এসে জুটবে। তবে হ্যাঁ, ওদেরও এটা রুটির ঘর—তাতে ভাগীদার জুটলে ওদের দুঃখ হবারই কথা; কেউ-কেউ যদি ক্ষেপেই ওঠে তাতেও দোষ দিতে পারে না নরসিং। উঠুক ক্ষেপে—সে ক্ষ্যাপামির ধাক্কা সইতে হবে তাকে। তার জন্য ভয় পেলে চলবে না। ভয় পেলেই হার নির্ঘাত। সে জানে নরসিং। তবে মগজ গরম করলে হবে না। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ চালিয়ে নিতে হবে। ডাণ্ডা চালালে ডাণ্ডা রুখতে হবে, উল্টে ডাণ্ডা চালালে চলবে না। ছত্রির ছেলে সে, তার বংশে

অবশ্য ডাণ্ডা খেয়ে কেউ চুপ করে থাকে না; এক ডাণ্ডা খেলে দু'ডাণ্ডা চালানোই তাদের স্বভাব। কিন্তু গিরবরজায় যা চলে, বাইরের দুনিয়ায় তা আর চলে না; গিরবরজা থেকে বেরিয়ে এসে অনেক ঘাটের জল খেয়ে অনেক নতুন আক্কেল তার হয়েছে। পারলে সে কোচোয়ানদের সঙ্গে একটা আপোষ করবে। আপোষ না হয়, চলুক লড়াই। কি করবে সে? ওদেরও রুটি চাই—তারও রুটি চাই। রুটি নিয়ে কাড়াকাড়ির ঝগড়াতেই তো দুনিয়া সরগরম হয়ে রয়েছে সেই আদ্যিকাল থেকে।

গাড়ীখানার সামনের সিটে শুয়ে নিতাইটা অঘোর ঘুমুচ্ছে। গাছের ছায়ায় গাড়ীখানাকে রেখে মিঠা ঝিরঝিরে সকালের হাওয়ায়, সারারাত্রি জেগে, আরাম করছে উল্লুক। পরিষ্কার করা, কি কলকব্জা খুলে রাখা দূরে থাক্, বনেটটা উল্টে সেটা আর বন্ধ করবার খেয়াল পর্য্যন্ত হয় নাই! অন্যদিন হলে নরসিংয়ের রাগ হ'ত। কিন্তু আজ মেজাজটাও অন্য রকম হয়ে রয়েছে, তার উপর সদর শহরে যাওয়ার মতলব ক'রে ফিরেছে। গাড়ীখানা খুলে ফেললে অনেক অসুবিধা হত, আবার এক বেলার ফেরে পড়তে হত; এতে তার সুবিধাই হয়েছে। কিন্তু রামা কই? সেটা গেল কোথায়?

*   *   *   *

রামা দাদাবাবুর জন্য বেরিয়েছে। সকালে উঠেই সে নিতাইয়ের কাছে গতরাত্রির তাজ্জবের গল্প আগাগোড়া শুনেছে। নিতাই তার উপর চড়া রঙ চড়িয়েছিল। বলেছিল, বেহুঁস হয়ে ঘুমুলি উল্লুক বুড়বক কাঁহাকা—দেখতে পেলি না—সে কি তাজ্জবের কাণ্ড! শালা আকাশ থেকে নেমে এল এক পরী। আমি দেখালাম গুরুজীকে পরী নামছে। বাস্, গুরুজী গিয়ে দুই হাত পেতে লুফে ধরে নিলে। পরী একবারে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলে গুরুজীর গলা। ভোরবেলা বলে—যাব না আমি, থাকব তোমার কাছে। কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিলে। গুরুজী অনেক বুঝিয়ে বললে—আজকের মত যাও। কাল সব ঠিক করব। তবে যায়।

রামার চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছিল, হাঁ ক'রে শুনছিল নিতাইয়ের কথা শেষ হলে সে তার বাস্তব জ্ঞানের সাধ্যমত বিচার ক'রে পরী নেমে আসাটা নিতান্তই অসম্ভব—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে অনুমান করলে, নিতাই তাকে ঠাট্টা করছে। সে বিজ্ঞ রসিকের মত বললে—ভাগ্।

নিতাই সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ে হাত দিয়ে শপথ করলে—মাইরী বলছি, তোর গায়ে হাত দিয়ে বলছি। এরও উপর গুরুত্ব আরোপ করবার জন্য সে বললে—মা-কালীর দিব্যি, ওপর থেকে নেমে এল আর গুরুজী হাত পেতে লুফে নিলে।

মা-কালীর শপথে রামার সকল অবিশ্বাস সঙ্কুচিত হয়ে গেল। বাস্তব বিচারবুদ্ধি পঙ্গু হয়ে গেল, সে স্তব্ধ হয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চেয়ে রইল।

নিতাই বললে—হ্যাঁ, পরী বটে!

রামা প্রশ্ন করলে—আজ আবার আসবে?

কথা তো বটে। তারপর নিতাই হাসতে হাসতে বললে—পরীকে অবশ্যি তুইও দেখেছিস। চল্, ওই গাছতলাতে গাড়ীতে বসে সব বলব।

সমস্ত কথা শুনে রাম কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। নিতাই বললে—কি, তুই যে ভিজে-দেশলাইয়ের কাঠি হয়ে গেলি রে! এ কথারও কোন জবাব দিলে না রাম। নিতাইয়ের মনে কিন্তু এখনও রঙ ধরে রয়েছে, সে বললে—মেয়েটা কিন্তুক গুরুজীর মনে রঙ ধরাচ্ছে। সে হাসতে লাগল।

রাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। নিতাইয়ের গল্পের প্রথম দিকটায় ওই শান্ত সুন্দর নরম মেয়েটার অকল্পিত দুঃসাহসিক অভিসারের কথা শুনে সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেষের দিকটার বিবরণ শুনে সে স্তিমিত হয়ে পড়ল। তার দিদির মৃত্যুর পর নরসিংয়ের নারী সম্পর্কে এই রহস্যময় নিরাসক্তি তাকে অত্যন্ত দুঃখ দেয়। নরসিং তার কাছে প্রায় দেবতা। ছেলেবেলায় তাদের মা মরেছিল, বাপ ছিল দরিদ্র। তার পিসীমা—ধরণী রায়ের স্ত্রী, তাদের ভাইবোনকে নিয়ে এসেছিল নরসিংকে উচ্ছেদ করবার জন্য। পিসী

বার বার তাকে বলত—পিসের কাছে যাবি, পিসের কথা শুনবি, মেজাজ দেখে আদর করবি, কোলে চাপবি। বুঝেছিস?

হাঁ করে তাকিয়ে থাকত রাম। সে কথাটা বুঝতে পারত না।

পিসী বুঝিয়ে বলত—তোকে যখন আদর করবে তখন বলবি, তুমি নরসিংকে বেশী ভালবাস। বুঝলি?

পিসী হিংসার বীজ বপন করতে চেয়েছিল; সে বীজ থেকে অঙ্কুর ফেটে বার হলে সে হয়তো বিষবৃক্ষেই পরিণত হত। কিন্তু সে বীজ অঙ্কুরিত হতে পায় নি, ধরণী রায় নরসিংকে ইমামবাজারের বাবুদের বাড়ীতে রেখে এল। শিশু রাম এমন কোন হেতুই পেলে না যার জন্য সে নরসিংকে হিংসা করতে পারে। নরসিংএ বাড়ীর সকল আদর ফেলেই চলে গেল যখন, তখন নরসিং দাদাকে বেশি ভালবাস, বেশি আদর কর—এ বলে পিসের কাছে অভিযোগ করবার কোন কারণই দেখতে পেল না। বরং উল্টো হ'ল। বয়স্ক ছেলেদের অনুকরণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে সে নরসিংয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। অন্যদিকে পিসীই হয়ে উঠল ভয়ের মানুষ, সকল বিরূপতা জমে উঠল তার বিরুদ্ধে। পিসীরও দোষ নাই। বন্ধ্যাজীবনের অভ্যাসে জান্‌কী এবং রামার অস্তিত্ব তার কাছে উপদ্রবের সামিল হয়ে উঠল। শিশুকে তার ভাল লাগত না এ নয়, কিন্তু তারা কলরব করত সে তার মাথায় গিয়ে লাগত, কাঁদলে তো সে প্রায় ক্ষেপে যেত, ছুটোছুটি করলে অসহ্য মনে হত; খেলার সামগ্রী—ভাঙা খোলা ঘুটিং নুড়িপাথর ঘাস-পাতা আগাছার ফল বাখারীর টুকরো ঘরে এনে জমা করত, ঘর দোর ময়লা করত, সে কিছুতেই সহ্য করতে পারত না নরসিংয়ের মামী—রামের পিসী। আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল প্রথম দিনই। মায়ের মতই স্নেহে রামকে নিজের ছেলের মত আপন ক'রে নেবার আগ্রহে পিসী রামকে নিজের কাছে নিয়ে রাত্রে শুয়েছিল। জানকীর বিছানা করেছিল পাশেই একটু তফাতে। রামা ঘুমিয়ে গিয়েছিল, পিসী শুতে এল একটু রাত্রে। বিছানায় বসে কিন্তু তার গা ঘিনঘিন ক'রে উঠল। হাতের কেরোসিনের

ডিবের আলোটা পড়েছিল রামার মুখের উপর। পিসীর চোখে পড়ল রামার মুখের এক পাশ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। অসন্তুষ্ট মনে মুখ বিকৃত ক'রে খানিকটা ভেবে সে রামার দিকে পিছন ফিরে শুল। মধ্যরাত্রে রামা ঘুমের ঘোরে কুণ্ডলী পাকিয়ে মোড়া হাঁটু দুটো পিসীর পিঠে প্রায় গুঁজে দিলে। ধড়মড় ক'রে উঠে পিসী ঠেলে সরিয়ে দিলে রামাকে। কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে আবার তাই। আবার সরিয়ে দিলে পিসী। আবার মিনিট দশকের মধ্যে রামা হাঁটুর গুঁতো দিয়ে ফিরে শুল। এবার পিসীর আর সহ্য হ'ল না। সে উঠে শিয়রের পাখা নিয়ে রামের অবাধ্য হাঁটু দুটোর উপর বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দিলে। রামা চীৎকার ক'রে কেঁদে জেগে উঠে বসল। পিসী আরও ঘা কয়েক পিঠে বসিয়ে দিয়ে বললে—চিল্লাবি তো তোর খাল তুলে দিব।

থেমে গেল রামা ভয়ে, সে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল পিসীর দিকে। পিসী বললে—ভাগ্ ভাগ্ আমার বিছানা থেকে। ভাগ্।

রাম বুঝতে পারলে না—এই রাত্রে বিছানা ছেড়ে সে কোথায় ভাগবে! পাশের বিছানায় দিদি জানকী উঠে বসেছিল এই চীৎকার-ঝঙ্কারে, ভয়-বিহ্বল চোখে তাকিয়ে সে সব দেখছিল; পিসী হঠাৎ উঠে গিয়ে তার পিঠে দু'ঘা পাখার ডাঁট চালিয়ে বললে—হারামজাদী ট্যারা চোখ নিয়ে বসে দেখছে দেখ। নিয়ে যা ভাইকে, নিয়ে যা বলছি। তারপর কপাল চাপড়ে বললে—আমার নসীব। বে-তরিবৎ বে-আক্কেল্ বে-সরমী দু'টো বান্দরের বাচ্চা আমার কপালে জুটেছে! নিয়ে যা ভাইকে তোর বিছানায়। তোর ভায়ের হাঁটুর গুঁতো তুই খাবি না তো কি আমি খাব?

সেই রাত্রেই পিসীকে তার ভয় হয়ে গেল। বাঘ তখনও পর্য্যন্ত রাম দেখে নাই, দেখেছিল ক্ষ্যাপাকুকুর; দাঁত বার ক'রে গোঁ-গোঁ শব্দ ক'রে রাস্তার লোককে তেড়ে কামড়াতে সে নিজের চোখে দেখেছিল। পিসীকে দেখে তার তেমনি ভয় হত। পিসে ধরণী রায় গাঁজা খেয়ে ভাম হয়ে থাকত, ডাকবাংলায়

বসে শনের দড়ি পাকাত, সে উপেক্ষাও করত না, আশ্রয়ও দিত না। পিসী মারলে পিসে সান্ত্বনা দিত কিন্তু পিসীকে কিছু বলত না।

এরই মধ্যে শনিবার রবিবার আসত নরসিং। তার মামীকে বলত—নেকড়ানী। পিসীর এই নামকরণের মধ্যেই রামা পেয়েছিল পিসীর প্রতি নরসিংয়ের বিরূপতার পরিচয়। ওইটাই তাকে এবং জানকীকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। নরসিং বয়সে বড়, তা ছাড়া তার বড় বড় চোখ দুটোতে ছিল উগ্র দৃষ্টি, দেখে তারা বুঝতে পারত ওর তেজ আছে। নরসিংয়ের মামী রামের পিসী মধ্যে মধ্যে বলত—নরসিংওয়ার আঁখ দেখো না, যেন গিলে খাবে। খুনখারাবী করা যে ওদের ঝাড়ের অভ্যেস। পিসীর মুখে এই কথা শুনে নরসিংয়ের প্রতি ভক্তি তাদের বেড়ে গিয়েছিল। তারা ভাই-বোনে নরসিংকে দলপতি ক'রে পিসীর বিরুদ্ধে তাদের তিনজনকে একদলে মনে করত।

দিদি জানকী বেশি ভক্তি করত নরসিংকে। রামাকে বলত—নরসিং ভাই বহুৎ এলেমদার লোক হবে। লিখাপড়ি শিখছে। কলম চালাবে, তলব পাবে মোটা।

নরসিংকে মধ্যে মধ্যে বলত—তুমার পুরানো কিতাবগুলি দিয়ো নরসিং ভাই, রামসিং পড়বে। পিসী ব্যবস্থা করেছিল রামা ঘরের গরুগুলোকে মাঠে ঘাস খাইয়ে নিয়ে আসবে, পিসের কাছে শনের দড়ি পাকানো শিখবে, ক্ষেত-খামার জমি-জেরাত যেটুকু আছে সে সব দেখবে, জোয়ান বয়স হলেই পিসের ওই ইজ্জতদার কাজ—ডাকবাংলার জমাদারের কাম করবে। লোকে বলে—ডাকবাংলার মালী। ধরণী রায় ডাকবাংলার জমাদার। রায়ের স্ত্রী বলে—জমাদার সাহেব। রামের তাতে দুঃখ ছিল না। সে তাই গরু ঠেঙিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরত। সন্ধ্যাবেলা পিসে অ—আ—ক—খ পড়াত। এমনি ভাবেই দিন কাটছিল। হঠাৎ কি হ'ল! রামা আজও ঠিক বুঝতে পারে না, তবে কিছু হয়েছিল। নরসিং এল সে দিন নতুন চাকরীর তলব

নিয়ে, নেকড়ানীকে টাকা দিয়ে প্রণাম করলে। তারপর কখন চলে গেল। পরের দিন দিদি জানকী তাকে পাঠালে নরসিংয়ের কাছে। বললে—তুহার নরসিং দাদার কাছে যাবি। বলবি—দিদি বললে, গোটা রূপেয়ার আফিম কিনে দাও।

নরসিং তার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে বললে—বলবি সন্ধ্যের সময় আমি নিয়ে যাব।

সঁন্ধ্যের সময় গিয়ে নেকড়ানীকে বললে—মামী, জানকীকে আমি বিয়ে করতে চাই। দেবে বিয়ে আমার সঙ্গে?

রামা কথাটা শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্ধকার মাঠে একলা আপন মনে নেচেছিল। কেয়াবাৎ হো! জয় ভগোয়ান, জয় শিরিরামজী!

নরসিংদাদা এবার তার সত্যিকার দাদা হ'ল। ওইটুকুতেই সে খুশি হয়েছিল। তার পর যখন নরসিং জানকীকে নিয়ে ইমামবাজারে বাসা করলে এবং রামকেও সেখানে নিয়ে এল তখন সে খুশি হয়ে প্রায় পাগল হয়ে গেল। নরসিং তখনও কয়লার ডিপোতে কাজ করে। সে রামাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিলে। রামা এই ব্যাপারটিতে তখন দাদাবাবুর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল। দিদি জানকী বলত—বান্দর, মুরূখ্ কাঁহাকা! লিখাপঢ়ি শিখবি না তো কি কাম করবি? দেখ্ তো তোর দাদাবাবুকে। লিখাপঢ়ি শিখলে তবে না কয়লার হিসাব লিখে!

তারপর দাদাবাবু হ'ল বাবুদের মোটর ড্রাইভার। দাদাবাবু যখন ওই গাড়ীটার সেই গোল চাক্কীটা ধ'রে বুনো শূয়োরের মত গোঙানী আওয়াজ ছেড়ে ছুটন্ত গাড়ীখানাকে যে দিকে খুশি চালাত—দাদাবাবুর কেরামতী দেখে, এলেম দেখে অবাক হয়ে যেত। এখন মনে হলে সে হাসে। সেও শিখেছে চালাতে, ওই গোল চাক্কীটা—স্টিয়ারিংটা ধরে সেও এখন ইচ্ছামত জোরে গাড়ীটাকে ছাড়তে পারে।

তারপর বাবুদের মেজবাবু মারা গেল। নরসিং মাথায় হাত দিয়ে বসল। জানকী তাকে বললে—তুমি নিজে গাড়ী করো। সে বার করে দিলে পাঁচশো টাকা। নরসিংয়ের তলব আর উপরি-পাওনার টাকা থেকে সে জমিয়েছিল টাকাটা। নরসিং বুধাবাবুর কাছে কিনলে এই পুরানো গাড়ীটা। জবরদস্ত পুরানো মডেলের গাড়ী।

রামা হ'ল তখন কণ্ডাক্টার, টিকিট বেচে পয়সা নিত। নরসিংয়ের কাছে সে যেন কেনা গোলাম হয়ে গেল। জোয়ান সে পুরো হয় নি, তবু ঘরে বসে দিদির আর দাদাবাবুর ভাত খেতে তার কেমন যেন লাগত। মোটর গাড়ীর কণ্ডাক্টার হয়ে তার মনে হ'ল, সে অনেক ইজ্জতের মানুষ হয়ে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে মনে হত পিসীর বাড়িতে থাকলে সে আজও মাঠে গরু চরিয়ে বেড়াত। দাদাবাবুর কাছে তলব নিয়ে সেও গিয়েছিল পিসীর বাড়ি। নেকড়ানীকে টাকা দিয়ে সেও প্রণাম করেছিল। নেকড়ানী তাকে অনেক আদর করেছিল সেদিন। সে দিনটা সে কখনও ভুলবে না। ওই দিনটা তার সবচেয়ে বড় ইজ্জতের দিন, খাতিরের দিন। নেকড়ানীর সব গালিগালাজ অনাদর অবহেলার শোধ উঠে গিয়েছে ওই দিনে। আর সব চেয়ে দুঃখের দিন তার দিদির মৃত্যুর দিন। দিদি জানকী সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মরে গেল। আরে বাপ রে! দাদাবাবুর সে দিন কি চোখ!

দিদি মরে গেল। দাদাবাবু পাথরের মত সহ্য করলে। রামা ভেবেছিল—দাদাবাবু আবার সাদী করবে, নতুন বহু আসবে, সে বহুয়ারও তো ভাই আছে—সে হয়তো এসে গাড়ীর কণ্ডাক্টার হবে। তবু দাদাবাবুকে পরণাম, হাজার হাজার পরণাম, দাদাবাবু তাকে কাম শিখিয়েছে—মানুষ ক'রে দিয়েছে, কাম সে খুঁজে নেবে। দিদির মৃত্যু আজ বছর পার হয়ে গেল, তবু দাদাবাবু বিয়ে করলে না। দিদি জানকী নাই তবু দাদাবাবুর স্নেহ এতটুকু কমে নাই। তাই তো দাদাবাবু যখন মেয়েলোককে নিয়ে শুধু খেলা ক'রে বিদায় দেয় তখন তার দুঃখ হয়, ভয় হয়, দাদাবাবু কি সন্ন্যাসী হয়ে যাবে!

আজ নিতাই যখন বললে—মেয়েটা গুরুজীর মনে রঙ ধরাল্ছে, তখন রামা কেমন অবাক হয়ে গেল। প্রথমেই খানিকটা দমে গেল। তবে এইবার দাদাবাবু বিয়ে করবে, নতুন বউ আসবে। যদি বউয়ের সঙ্গে বউয়ের ভাই আসে? এসে সে কি ফিরে যাবে? কিছুক্ষণ্ পরে মনে হ'ল, ভাই যদি আসে তো আসুক। দাদাবাবুর ঘর হোক, সংসার হোক, ছেলেপুলে হোক। সে কাজ শিখেছে, জোয়ান বয়স, দুনিয়াতে কাজের কি অভাব!

নিতাই বনেটটা খুলে ভিতরটা দেখছিল। বললে—বসে ভাব লেগে গেল নাকি তোর? আয়—আয়। গুরুজী মোটরের দোকানে গিয়েছে পার্টসের অর্ডার দিতে। বেবাক খুলে পুরনো রদ্দি যা আছে পাল্টানোর হুকুম হয়ে গিয়েছে। আয়।

রামা নিতাইয়ের সঙ্গে কাজে লাগতেই যাচ্ছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল সাওজীর ছাদের আলসের মাথার ওপর সেই মেয়ের মুখ। তার নেশা লেগে গেল। মেয়েটাকে কোন রকমে ইসারা করে ডাকবে সে, সাওজীর বাড়ি থেকে কোন রকমে বেরিয়ে আসতে বলবে। তারপর সে তার সঙ্গে দিদি সম্বন্ধ পাতাবে। বলবে—আজ থেকে তুমি ভাই আমার দিদি। বলবে—দিদি, তোমাকে ভাই দাদাবাবুর মনটিকে ভিজাতে হবে, ভুলাতে হবে। দাদাবাবুর কেমন আমীরী মন, কত উঁচু দিল্, সে কথা তাকে বলবে। সে একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল; এখান থেকে ফট্‌কির মুখ বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। এ ফট্‌কি দিনের ফটকি। এ আর এক রকম মানুষ। বেড়ালের চোখ, বাঘের চোখ রাত্রে জলজল ক'রে জ্বলে; হাপরের আগুনের আঁচে লোহার টুক্‌রো যেমন রাঙা টলটলে হয়ে বাহারের চেহারা ধরে, পদ্মপাতার উপরের জলের টোপার মত একটু দোলাতেই নাচে, রাত্রের স্পর্শ পেলেই ফট্‌কি তাই জ্বলন্ত বাঘ-বেড়ালের চোখের মত জলজলে হয়ে ওঠে, হাপরের আঁচে গলন্ত লোহার দানার মত রাঙা টলটলে চঞ্চল হয়ে ওঠে। আবার দিনের আলোর ছটা পেলেই বাঘের, বেড়ালের চোখের তারা যেমন গুটিয়ে লম্বা কালো দাঁড়ির মত ঠাণ্ডা

ভালমানুষটির চেহারা নেয়, ঠাণ্ডা হলেই যেমন গলন্ত টলটলে লোহা শক্ত খটখটে কালো চেহারা নেয়—দিনের বেলায় ফটকির চেহারাও তেমনি পালটে গিয়েছে ; কপালের ওপর চুলের সীমানা পর্য্যন্ত ঘোমটা টেনে নিচের দিকে চোখ রেখে সে কাজ ক'রে চলেছে। রামা নিতাইকে ডেকে ইসারা ক'রে তাকে দেখালে।

নিতাই হাসলে, বললে—আয়, এখন কাজ কর্, রাত্রে দেখবি। আসবে, ঠিক আসবে।

রামার কিন্তু কাজের চেয়েও ওই দিকে মন টানছিল বেশি। গোপনে কাজ করার মধ্যে একটা নেশা আছে। সেই নেশায় তাকে পেয়ে বসেছে তখন। সে বললে—ব'স, আমি আসছি। ওর সঙ্গে 'দিদি' পাতিয়ে আসি।

নিতাই তাকে বারণ করলে—যাস নে। দাদাবাবু বকবে। কাজ রয়েছে, জরুরী কাজ।

রামা এ কথাও শুনলে না। সে তো দাদাবাবুর জন্যই চলেছে। যদিই বকাবকি করে দাদাবাবু, সে তা সহ্য করবে। আর কাজ? কাজ তো হবেই। দু'দণ্ড আগে আর পরে। সে চলে গেল। নিতাই একটা বিড়ি ধরিয়ে এসে বসল সামনের সিটে। সারারাত্রি জাগরণের ফলে চোখ জ্বলছিল। চৈত্র মাসের সকালে গাছতলায় মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে। সে শুয়ে পড়ল। তারপর ঘুম। সে ঘুম ভাঙল নরসিংয়ের ডাকে। রামা শূয়ার এখনও ফেরে নাই।

কাজকর্ম্ম কিছু হয় নাই, এর জন্য নরসিং আজ বিরক্ত হ'ল না। ভালই হয়েছে। গাড়ী খুলে রাখলে আজ আর সদর শহরে যাওয়া হত না। কাজের কথা না তুলে সে জিজ্ঞাসা করলে—রামা কই?

নিতাই একটু মাথা চুলকে বললে—গেল যে কোথা! বললে, এই আসছি। তার ভয় হচ্ছিল বেকুফ উল্লুক রামা আবার বাড়ির আশেপাশে ঘুর ঘুর করতে গিয়ে ধরা পড়ল না কি? নইলে এতক্ষণ ফিরছে না কেন?

নরসিং বিরক্ত হ'ল এবার, সে বেশ বুঝতে পারলে—নিতাই তার কাছে আসল কথাটা লুকচ্ছে। বিরক্ত হয়ে সে ধমকের স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় গেল বলতে ঢোক গিলছিস্ কেন?

নিতাই এবার না বলে পারলে না। বললে—ছাদে সে কাপড় মেলে দিচ্ছিল, তাকে দেখে—

কে?

কাল রাত্রের সেই।—হাসলে নিতাই।

ভুরু কুঁচকে নরসিং দাঁড়িয়ে রইল চুপ ক'রে। কিছুক্ষণ আগে ওই ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ানদের কথা শুনে তার মনে হয়েছিল—রুটি নিয়ে কাড়াকাড়ির ঝগড়াতেই তো দুনিয়া সরগরম হয়ে রয়েছে সেই আদ্যিকাল থেকে। এখন মনে হ'ল—রুটির ঝগড়ার সঙ্গে সমানে চলছে মেয়েলোকের মন নিয়ে কাড়াকাড়ির ঝগড়া। রামা ছুটেছে মেয়েটার মনের জন্য? জোয়ান হয়ে উঠেছে ছোঁড়াটা। নরসিং বললে—ওকে কড়কে দিতে হবে। এইবার রোগে ধরেছে শূয়ারকে।

নিতাই বললে—না না গুরুজী, সে বলে গেল—'দিদি' পাতিয়ে আসি ওর সঙ্গে, ব'স্ তুই। মুহূর্ত্তে নরসিংয়ের মনে পড়ে গেল জানকীকে। তার মনের চিন্তা সব যেন এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল। চুপ ক'রে সে দাঁড়িয়ে রইল।

নিতাই তাকে ডাকলে—সিংজী! তার স্তব্ধ মূর্ত্তি দেখে তাকে 'গুরুজী' বলে ডাকতে তার ভরসা হ'ল না।

নরসিং বললে—হ্যাঁ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে সচেতন হয়ে উঠল।

নিতাই প্রশ্ন করলে—কি রকম দাম দেখছেন এখানে? সব জিনিস মিলবে?

নরসিং বললে—ওদের হেড আপিসে যাব। গাড়ী খুলে ফেলিস নাই ভাল হয়েছে। সে গাড়ীতে উঠে বসল। স্টিয়ারিংটার ওপর মাথা রেখে বললে—রামাটা—

নিতাই বললে—দেখব নাকি ?

নরসিং চুপ ক'রে রইল। মনের মধ্যে এখনও সব এলোমেলো হয়ে চলছে। নিতাই আবার বললে—সিংজী !

নরসিং বললে—হারামজাদা রামেশ্বর-পাগলা এরা আজ জোসেফের পাড়ায় একটা গোলমাল করতে গিয়েছে। জোসেফের বোনের নাম নিয়ে নীল জল, নীল জল বলতে বলতে ওদের পাড়ার দীঘির পাড়ে গিয়েছে বাস ধুতে।

বাইসিক্লে চড়ে কে আসছে ? জোসেফ নয় ? নিতাই বললে—হ্যাঁ, সেই নবাবই বটে। নিতাই কিছুতেই ভুলতে পারে না—হাড়ির ছেলে—তারই স্বজাতি স্বশ্রেণীর লোক হয়ে জোসেফ একটা মাতব্বর হয়েছে।

জোসেফ এসে তাদের গাড়ীর কাছেই নামল। নেমে হেসে নমস্কার ক'রে বললে—নমস্কার ! ভাবি নাই আপনাকে ধরতে পারব। আজ গাড়ী বার করেন নাই ?

নরসিং বললে—না, লাইসেন্স না হলে কি ক'রে বার করব গাড়ী ? আপনি বারণ করলেন কাল।

ভাল হয়েছে। আমার গাড়ী বিগড়েছে। গোটা দিন লাগবে সারতে। এ-দিকে সাহেবকে আজ সদর শহরে যাবার জরুরী তাগিদ এসেছে। সাহেব বলছিলেন বাসে সিট দেখতে। আমি বললাম—একখানা ট্যাক্সি আছে। এসেছে এখানে ভাড়া নিয়ে। চলে যান সাহেবকে নিয়ে। যা ভাড়া দেয় নিয়ে নেবেন। লাইসেন্সে সুবিধে হবে।

নরসিং সজাগ হয়ে উঠে বসল। নিতাইকে বললে—স্টার্ট দে।

নিতাই বললে—রামাকে একবার দেখি।

নরসিং বললে—সে থাক্। স্টার্ট দে তুই।

জোসেফ বললে—একটু অপেক্ষা করুন। আমি আসছি বাড়ি থেকে। নীলির কি দু'একটা বরাত আছে শহরে কিনতে হবে। আমি

আসবার সময় ফেলে এসেছি কাগজের টুকরাটা। সে বাইসিক্ল হাঁকিয়ে চলে গেল।

নরসিংয়ের মনে হ'ল—ভালই হ'ল। জোসেফ বাড়ি গেল—যদি রামেশ্বররা বদমায়েসী শুরু ক'রে থাকে, তা'হলে জোসেফ তার ব্যবস্থা করতে পারবে।

নিতাই বললে—যাই বলেন গুরুজী, হাড়ির ছেলের এত বাড় ভাল লয়।

নরসিং বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে।

নিতাই বললে—হলেই বা খ্রীষ্টান। আপনাদের গাঁয়ের হাড়ির ছেলে তো! আপনার সঙ্গে কয় যেন ইয়ারকী মারে। বলে আবার—নমস্কার!

নরসিং কোন উত্তর দিলে না। সে ভাবছিল। অনেকক্ষণ ভেবেও সে জোসেফ এবং নীলিমার ব্যবহারকে উদ্ধত বা অপমানজনক মনে করতে পারলে না। জোসেফ তার অনেক উপকার করছে, নীলিমা মেয়েটি বড় ভাল। হোক হাড়ির মেয়ে। ভদ্রলোকের মেয়ে আজ ওর কাছে হার মেনে যায়।

জোসেফ ফিরে এল। তার সঙ্গে নীলিমা। বাইসিক্ল ধরে হেঁটে নীলিমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল জোসেফ। চোখ মুখ তার থমথমে হয়ে উঠেছে। বললে—ভাগ্যে গিয়েছিলাম আমি। রামেশ্বর আর পাগলা আমাদের পাড়ায় দীঘিতে 'বাস ধুতে এসে—। সে থেমে গেল। নরসিং বললে—হ্যাঁ, আমার সামনে দিয়েই গেল চীৎকার করতে করতে, ক্রীশ্চান দীঘির জল খেতে চলল গাড়ী।

হ্যাঁ। সেখানে উপদ্রব আরম্ভ করেছিল। নীলি ইস্কুলে পড়ায় তার জন্যে ওদের ভীষণ রাগ। যা-তা বলে, রাস্তায় ঘাটে শিস দেয়। ওর অপরাধ ও ক্রীশ্চান—আর আমি মোটর ড্রাইভার—আমার বোন। দিনকতক বন্ধ হয়েছিল। আজ দেখি আবার শুরু করেছে তাই। ওকে নিয়ে এলাম সঙ্গে ক'রে, ইস্কুল পৌঁছে দিয়ে এসে নিয়ে যাব আপনাকে।

নরসিং বললে—কেন? উনি উঠুন না গাড়ীতে। ওঁকে ইস্কুলে নামিয়ে

দিয়ে আমরা চলে যাব। নীলিমার দিকে চেয়ে সে খুব মিষ্টি করেই বললে—উঠুন গাড়ীতে।

নীলিমা দাদার দিকে চাইলে। জোসেফ বললে—উঠে পড়।

নরসিং হেসে বললে—আপনাদের বাড়ি গেলে ভাড়া দিয়ে দেবেন আর ভাল ক'রে চা খাইয়ে দেবেন। সত্যি, আপনাদের বাড়ির চা চমৎকার।

এগারো

নসীবের গতিক হ'ল তাজ্জবের কাণ্ড। নসীবের খেয়ালের মত খামখেয়াল দুনিয়ায় আর হয় না। অত্যন্ত সহজে, যাকে বলে—ধাঁ ক'রে, হয়ে গেল নরসিংয়ের সার্ভিস লাইনের হুকুম। এখানকার এস-ডি-ও করে দিলেন। ইমামবাজারের সার্ভিস উঠে গেল সেখানকার এস-ডি-ওর জবরদস্তিতে; শ্যামনগর এসে সেই ভয়টাই ছিল সব চেয়ে বড় ভয়। এনকোয়ারী হলে সেখানকার রিপোর্ট আসবে—কি রিপোর্ট আসবে সে নরসিং জানত। সেই কারণে সে ঠিক করেছিল শুখনরামের নামে সার্ভিস লাইনের দরখাস্ত করবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এখানকার এস-ডি-ও বিনা এনকোয়ারীতেই লাইসেন্স ক'রে দিলেন। বেঁচে থাক জোসেফ ভাই; সেই দিয়েছে সাহেবের ভাড়া জুটিয়ে। সাহেব গাড়ীর ফুটবোর্ডে পা দিয়েই তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—তুমি আগে ইমামবাজারে থাকতে না? ইমামবাজারের সুধাংশুবাবুদের বাস সার্ভিসে ড্রাইভার ছিলে না?

সুধাংশুবাবু ইমামবাজারের মেজবাবু।

নরসিং এবার সায়েবকে চিনতে পারলে। ইনি যে সেই 'গুপ্তি' সায়েব। ইমামবাজার অঞ্চলে সার্কেল অফিসার ছিলেন। ছিপ্ছিপে শরীর অল্পবয়সী

ফুটফুটে চেহারার গুপ্ত সায়েব মাসে অন্তত দুবার ক'রে ইমামবাজারে আসতেন। মেজবাবুর সঙ্গে দোস্তি হয়েছিল। সে দোস্তি গলায় গলায় হয়ে উঠল একদিন। নরসিংয়ের মোটর বাসেই ঘটেছিল ব্যাপারটা। মনে আছে নরসিংএর।

হোলীর দিন। মেজবাবুর হঠাৎ ঝোঁক উঠল—খুব ধুমধাম ক'রে হোলী খেলবেন এবার। সকালেও কোন কথা ছিল না। জংসন থেকে ন'টার ট্রিপ দিয়ে ফিরবামাত্র হুকুম এল মেজবাবুর, গাড়ী, লে আও। বাস নিয়ে নরসিং বাবুদের বৈঠকখানার সামনে এসে দাঁড়াল। আরে বাপ রে বাপ! বিলকুল সব লালে লাল হো গেয়া। মাথায় মুখে আবীর মেখে খুনখারাবী রঙে জামা কাপড় রাঙিয়ে মেজবাবু বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; বালতী বালতী রঙ, পিচকারী, আবীর আর সঙ্গে বেতের বোনা সোডা কেরিয়ারে বোতল। বাবুদের চোখ লালচে। গ্রামের যাত্রার দলের কয়েকজন গাইয়ে ছেলে নিয়ে ঢোল বাঁশী হারমোনিয়ম বাজিয়েরা এক পাশে বসে আছে।

বাস নিয়ে দাঁড়াবামাত্র মেজবাবু বললেন—নেমে আয়।

নামবা মাত্র নরসিংকে আবীর রঙে রাঙিয়ে দিলে একজন। মেজবাবু হুকুম দিলেন—যা, ও ঘরে যা। সে ঘরে মেজবাবুর চাকর তাকে কাচের গেলাসে আধ গেলাস ঢেলে দিলে বিলিতী মদ। 'রম্'; রম্ মদটার নাম।

তারপর বার হ'ল মেজবাবুর হোলীর হল্লা।

লাগাও গান।

যাত্রার জেলেরা গান ধরলে—"কেন রঙ দিলি ঢঙ করে? সাদা কাপড় রঙিয়ে দিলি পিচকারী মেরে।"

বাবুরা চেঁচাতে লাগল—ইয়া! ইয়া! হোলী হায়!

গাড়ী চলতে লাগল! দু'পাশে চলতে লাগল পিচকারীর মুখে রাঙা ফোয়ারা। গোটা গাঁ মাতিয়ে—থানা, সবরেজিষ্ট্রি আফিস, বাজার পার হয়ে গাড়ী চলেছিল বাবুদের বাগানের দিকে, পথে বাইসিক্লে যাচ্ছিলেন—গুপ্ত সায়েব।

হো-হো-হো-হো ক'রে মেজবাবু স্ফূর্ত্তিতে নেচে উঠলেন—মিল গিয়া বাবা নয়া আদমী মিল গিয়া। রোখো, রোখো'গাড়ী।

বাস্। গাড়ী থেকে নেমে গুপ্ত সায়েবকে আবীরের রঙে লাল বানিয়ে দিয়ে তাকে টেনে তুললেন গাড়ীতে। বাইসিক্লটা তুলে দিলেন গাড়ীর ছাদে। হুকুম হ'ল—চলো ডাকবাংলো। গুপ্ত সায়েব ইমামবাজারে এসে ডাকবাংলোতেই ছিলেন। ডাকবাংলোয় এক দফা মজলিশ হ'ল। পূর্ণিমার রাত্রে ময়ূরাক্ষী নদীর বালুচরে হোলী হবে। রাত্রি আটটায় গাড়ী ছাড়ল।

কোঁচানো কাপড়ে, গিলে-করা পাঞ্জাবিতে, সাবান দেওয়া খসখসে চুলে, এসেন্স আতরের খুশবয় ছড়িয়ে উঠলেন মেজবাবু আর এই গুপ্ত সায়েব। আর যারা তারা কায়দায় এঁদের মত দুরস্ত নয়। আর উঠল খাবার। লুচির ঝুড়ি, মাংসের ডেকচি, কাটলেটের ট্রে, বোতলে ভরা সোডা-কেরিয়ার—ছটা খোপে ছটা বোতল। হোলীর জন্যে পুরো একটা কাঠের বাক্স ভরে বোতল এনেছিলেন মেজবাবু। অধিকাংশই ওই রম্। দুটো বড় বোতল ছিল সাদা ঘোড়া মার্কা হুইস্কি। আর চড়ল হারমোনিয়ম ডুগি তবলা।

মেজবাবু তারই একটা বোতল খুলে গেলাসে ঢেলে ধরলেন গুপ্ত সায়েবের মুখের কাছে।

সায়েব হাত জোড় করলেন প্রথমটা।

মেজবাবু বললেন—এক চুমুক অন্ততঃ।

এক চুমুক, দু চুমুক, তিন চুমুক—গেলাস খালি। হোলী হায়, হোলী হায়! মেজবাবু ঢাললেন দোসরা গেলাস।

সাদা ধোয়া ফিনফিনে মসলিনের মত 'চাঁদনী' গায়ে জড়িয়ে বালুচর যেন দাঁড়িয়ে ছিল নাগরের অপেক্ষায়, পিয়ারীর মত চুপ ক'রে, অনড় হয়ে। গাড়ী থেকে বাবুরা লাফিয়ে পড়ল বালুচরের উপর। সে কি মাতামাতি! শেষ পর্য্যন্ত গড়াগড়ি। নদীর ওপার থেকে আনা হয়েছিল চার পাঁচটি মেয়ে, মেজবাবু দিনের বেলায়ই বাইসিক্লে লোক পাঠিয়েছিলেন; তারাও শুয়ে

পড়েছিল। ঠিক ছিলেন শুধু তিনজন। মেজবাবু, রজনীবাবু আর এই গুপ্ত সায়েব। রজনীবাবু মেয়েগুলোর দিকে চেয়ে বলেছিলেন, মরল নাকি শালীরা ?

আকাশের দিকে চেয়ে গুপ্ত সায়েব বলেছিলেন, মরুক। ওরা পুণ্যবতী। এ মরণ স্বরগ সমান।

মেজবাবু হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে গান ধরেছিলেন—"এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো সে মরণ স্বরগ সমান।" গুপ্ত সায়েব উঠে নাচতে শুরু করলেন। হাঁ, সে দিন গুপ্ত সায়েবের নাচবার একতিয়ার ছিল। কি ছিপছিপে চেহারা! ভারী ভাল লেগেছিল নরসিংয়ের।

গুপ্ত সায়েব তারপর গান গেয়েছিলেন—সে গান আজও মনে আছে নরসিংয়ের।—"হেসে নাও দু'দিন' বৈ তো নয়। কে জানে কার কখন সন্ধ্যে হয়!"

মেজবাবু নাম দিয়েছিলেন সেই দিন—তুমি বাবা 'গুপ্তি' সাহেব। গুপ্তি যেমন লাঠির খাপের মধ্যে লুকানো থাকে তেমনি চাঁদ তুমি লুকিয়ে থাক।

সেদিনও নরসিংয়ের রাজপুত রক্তে দোলা লাগত এই সবে। সেদিন তারও মনে হয়েছিল—এর চেয়ে ঠিক কথা আর হয় না। সচ্ বাত হ্যায়। এর চেয়ে সুখ আর দুনিয়ার কি আছে? এই দোলে—হোলীর পর নরসিং গোপনে দু'চার জন বন্ধু নিয়ে গভীর রাত্রে বাবুদের অগোচরে বাস নিয়ে ওই বালুচরে এসে ওই খেলা খেলেছে। কিন্তু সে সব পাল্টে গিয়েছে আজ। জানকী—না, একা জানকী নয়, এই ট্যাক্সিটাও আছে জানকীর সঙ্গে। বাবুদের বাস ছিল—বাবুদের বাস, বাবুদের পেট্রোল ; আর এ ট্যাক্সিটা তার নিজের। পেট্রোল যাবে নিজের, ট্যাক্সিতে ধূলো লাগবে, টায়ার ক্ষয় হবে—তার নিজের যাবে। মাইনের টাকা, উপরি আয় খরচ করতে মায়া হ'ত না। এখন নিজের ব্যবসার টাকা খরচ করতে মায়া লাগে। তা ছাড়া তখন ছিল অল্প বয়স, গিরবরজার ছত্রি বংশে জ'ন্মে রক্তের মধ্যে যে তেজ, যে নেশা ছিল—তখনও পর্য্যন্ত তা বেঁচে ছিল। আজ আর সে বেঁচে নাই। যদিই থাকে সে সামান্য। গিরবরজার বর্কআন্দাজ

গিরধারী সিংয়ের বংশের ছেলেরা লক্ষ্মী হারিয়ে পুরুষে পুরুষে ছোট কাজ-কাম ক'রে পাল্টে যেমন আজ দারোয়ান আর চাষীতে দাঁড়িয়েছে—সেও তেমনি মোটর ড্রাইভারী করতে করতে পাল্টে পাল্টে আজকের এই খাঁটি মোটর ড্রাইভার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ষ্টীয়ারীং থেকে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে নরসিং একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললে।

যাক। তামাম দুনিয়া পাল্টাচ্ছে—সে পাল্টাচ্ছে তার জন্য নরসিংয়ের দুঃখ নাই। রাজা ফকীর হয়, ফকীর রাজা হয় দুনিয়ায়। নরসিং কোন রাজাকে ফকীর হতে দেখে নাই, ফকীরকেও রাজা হতে দেখে নাই, কিন্তু জমিদারকে জমিদারী হারাতে দেখেছ, হাঁটুর উপর কাপড় তুলে যে লোক মাথায় ক'রে তামাক বেচে বেড়াত তাকে শেঠ হতে দেখেছে।

শুখনরাম আজ শেঠ, তার তিন মহলা বাড়ি।

* * * *

তবু তার ভাগ্য ভাল যে হঠাৎ এইভাবে 'গুপ্তি' সায়েবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। গুপ্তি সায়েবের এখন আর সে চেহারা নাই। মোটা হয়েছেন গুপ্তি সাহেব। রঙ ময়লা হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে। গলার আওয়াজ ভারী হয়েছে। আগের মত আর প্রাণ খুলে হাসেন না। অল্পস্বল্প হাসেন, আওয়াজ হয় না, চোখে দেখে বুঝতে হয় সায়েব হাসছেন। পাক্কা সায়েব হয়েছেন—সে এক নজরেই বুঝে নিয়েছে নরসিং।

খুব খাতিরের সঙ্গে সেলাম ক'রে সে বলেছিল, হুজুর, আপনি ভাল আছেন?

—হ্যাঁ।

সায়েব গাড়ীতে উঠে শহরে যাওয়ার পথে অনেক খবর নিলেন। মেজবাবুর মৃত্যু-সংবাদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সুধাংশুবাবু যে বেশিদিন বাঁচবেন না এ আমি জানতাম। এত অত্যাচার কি মানুষের দেহে সহ্য হয়!

তারপর আবার বললেন—আর তিনি যে অল্প বয়সেই গিয়েছেন এও তাঁর পক্ষে ভাল হয়েছে। বেশি বয়স পর্য্যন্ত বাঁচলে হয়তো সবই নাশ ক'রে ফেলতেন। নিজেও দুর্দ্দান্ত মাতাল হয়ে পথে ঘাটে পড়ে থাকতেন। কেলেঙ্কারী হ'ত, লোকে ঘেন্না করত।

আবার একটু পর বললেন—এমন মানুষ আর হয় না।

নরসিং কোন কথার জবাব দিলে না। সে জানে জবাব দেওয়ার চেয়ে চুপ ক'রে থাকা ভাল। এ জাতকে সে চেনে, কিন্তু ওরা যে কিসে তুষ্ট হয় কিসে রুষ্ট হয় সে নরসিংয়ের বুদ্ধির অগম্য। অনেক সময় সায় দিলেও এরা চটে।

গুপ্তি সায়েব আবার বললেন—ট্যাক্সি তোমার নিজের?

আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

কতদিন কিনেছ গাড়ী।

অনেকদিন হ'ল হুজুর। মেজবাবু মারা গেলেন—তারপর বাবুরা বছর দেড়েক রেখেছিলেন বাসের কারবার। তারপর তুলে দিলেন। তখনই আমি—। তা আজ হ'ল পাঁচ-ছ বছর।

সায়েব প্রশ্ন করলেন—এতদিন কোথায় সার্ভিস ছিল তোমার? ওখানেই?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওখানকার সার্ভিস এখন আর ভাল চলছে না বুঝি?

নরসিং চুপ ক'রে রইল। সত্য কথা বলা উচিত হবে কি না বুঝতে পারলে না।

ওখানে এখন ক'খানা গাড়ী চলে? অনেকগুলো, না?

আজ্ঞে।

ক'খানা গাড়ী ওখানে চলে?

নরসিং সত্য কথা বলে ফেললে।—আজ্ঞে গাড়ী একখানাই ছিল। আমারই গাড়ীখানা।

তবে?

তবে—। আজ্ঞে—। নরসিং ঘামতে লাগল।

ট্রেনের সঙ্গে কম্পিটিশনে স্থবিধে হচ্ছে না বুঝি? অনেকগুলো গাড়ী দিয়েছে বুঝি রেল কোম্পানী? শুনেছিলাম বটে শাটল্ ট্রেন দিয়েছে, ওখানে। ইমামবাজার থেকে জংসন একখানা ইঞ্জিন দু'খানা গাড়ী; যায় আর আসে।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল নরসিং। বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই—

গুপ্তি সায়েব একটু ভাবলেন—তাই তো হে, পাঁচমতী পর্য্যন্ত সার্ভিস তোমার চলবে তো? কাঁচা রাস্তা; বর্ষার সময় গরুর গাড়ী পর্য্যন্ত চলে না—

আজ্ঞে দেখি। না চলে তো তখন—। তখন যে কি করবে নরসিং জানে না। নরসিংয়ের ধারণা তখন যে কি হবে সে জানে একমাত্র ভাগ্য। এখানে সে আসবে তাই কি সে জানত? জল ফুরাল, দাঁড়াতে হ'ল। না দাঁড়ালে মোটরের পিছনে যে গাড়ী আসছিল তার সঙ্গে দেখা হ'ত না। গাড়ীখানা উল্টালো। শুখনরাম বার হ'ল সেই গাড়ী থেকে, তামাকের ছোট পেটী আর ফট্‌কিকে নিয়ে। ফট্‌কি সঙ্গে না থাকলে শুখনরামের উপর তার মেজাজ গরম হত না। আর তা না হলে শুখনরাম তার গরম মেজাজের উপর মেজাজ দেখাবার জন্য পঞ্চাশ টাকা ভাড়া হেঁকে বসত না। সুতরাং এখানে যদি না চলে সার্ভিস, তখন যে কি করবে সে তা জানে না।

গুপ্তি সায়েব বললেন—তা ভাল, দেখ। একখানা দরখাস্ত ক'রে দিয়ো।

নরসিং আবার তোষামোদ করবার চেষ্টা করলে—হুজুরই তো মালিক। আপনি যা করবেন তাই হবে।

গুপ্তি সায়েব বললেন—ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানদের ক্ষতি হবে। তা—। একটু ভেবে বললেন—সে হবে' খন। জনকতক ভদ্রলোকদের দিয়ে মোটর সার্ভিসের স্থবিধা দেখিয়ে দরখাস্ত করিয়ে দেবে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করব।

গঙ্গার তটভূমি নিকট হয়ে আসছে। বনঝাউ দেখা দিয়েছে রাস্তার পাশে। বড় বড় আমবাগান দেখা যাচ্ছে। দু'পাশের সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে

রাস্তাটা ক্রমশ বাঁধের মত উঁচু হয়ে উঠেছে; সাঁকোর সংখ্যা বাড়ছে। যাত্রী-গাড়ীর সংখ্যা বাড়ছে। নরসিংয়ের হাতে গাড়ীখানা চলেছে পাকা জকির হাতের ঘোড়ার মত।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে ছিলেন গুপ্তি সায়েব। সিগারেটের ধোঁয়া ভারী চমৎকার ভাবে ছাড়েন তিনি, গোল কুণ্ডলী পাকিয়ে ক্রমশ ফাঁদলে বড় হয়ে প্রায় ছুটে চলে সামনে। মেজবাবুও ধোঁয়া ছাড়তেন এমনি ভাবে; বলতেন—ধোঁয়ার রিং। বড় লোকের বড় কায়দা!

* * * *

বড় বেশি ভেবেছিল নরসিং। কিন্তু অতি সহজে লাইসেন্স হয়ে গেল। সুতরাং এ নসীব ছাড়া আর কি হতে পারে? তার নসীব নয়—এ হয়েছে শুখনরামের নসীবে। সে দিন সদর শহর থেকে ফিরে যখন এই কথাটা সে বড় গলা ক'রে জাহির করলে তখন শুখনরাম হেসে বলেছিল—আরে ভাই, হামার নসীবের সাঁথে আপনি নসীব যখন জড়াইয়ে দিলেন তখুন এ তো হোবেই হোবে। বলে সে হা-হা ক'রে হেসে উঠেছিল।

শুখনরাম সেইদিন সকালে এক সওদায় পাঁচ হাজার মুনাফা ক'রে দিল-দরিয়া মেজাজ নিয়ে বসে ছিল। শুখনরামের কথাটা নরসিংয়ের মনে লাগল। কথাটা অত্যন্ত সত্য বলে মনে হ'ল তার। গিরবরজার যে ঘর থেকে মা-লক্ষ্মী চলে গিয়েছেন আগুনের আঁচে ঝলসে—সেই লক্ষ্মীছাড়া ঘরের ছেলে সে। দিদিয়ার কথা শুনে সে একদিন বেরিয়েছিল—লেখাপড়া শিখে সে মানুষ হয়ে মা-লক্ষ্মীকে ফেরাবে ব'লে। কিন্তু নসীব কপাল যে সঙ্গে সঙ্গে যায়। দিদিয়া একটা ছড়া বলত—

“গোপাল যাচ্ছ কোথায়?
ভূপাল।
কপাল?
সঙ্গে।”

কপাল মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই চলে। তাই তো বিয়ে-সাদির সময় মানুষ সব চেয়ে আগে দেখে কনের কপাল।

ভেবে চিন্তে কথাটা ধ্রুব সত্য বলে মনে হ'ল নরসিংয়ের।

শুখনরাম বললে—তব্ তো সব ঠিক হইয়ে গেল। এখুনি আপনি টাকা লিয়ে তুরন্ত গাড়ীঠো ঠিক বানাইয়ে ফেলেন।

তারপর গলা নামিয়ে বললে—আজ রাতে একবার পাঁচমতী যাবেন? দুঠো পেটী ছুঁয়া পৌঁছা দেনে হোগা।

দু'পেটী বলতে নরসিং বুঝেছিল অনেক। কিন্তু আসলে দুটো পাঁচসেরি ঘিয়ের টিনের কৌটায় আড়াই সের ক'রে পাঁচ সের মাল। এবার গাঁজা নয়—আফিং। গন্ধ নিবারণের জন্য ঘিয়ের আবরণ দিয়ে টিনে পুরে পাঠানো হচ্ছে। চালানের রকমারি ব্যবস্থা আছে। পাঁচমতীর বাজারে জগুবাবু, জগবন্ধু বাঁড়ুজ্জে বাবুলোক, বড় জমিদার ঘরের ভাগ্নে, বাবুদের ম্যানেজার, আবার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘিয়ের ব্যবসাও করেছে। খাঁটি গাওয়া ভয়সা ঘি এই গঙ্গার ধারের সরস অঞ্চল থেকে সংগ্রহ ক'রে কলকাতা চালান দেয় এবং বাইরের আড়ং থেকে বাজারে ঘি এনে ওখানকার দোকানে সরবরাহ করে। সঙ্গে সঙ্গে আছে এই গোপন কারবার। পাঁচমতী থেকে ওদিকে তার বাঁধা খুচরা কারবারী খরিদ্দার আছে। তারা নিয়ে গিয়ে সরবরাহ করে গাঁওলা গাঁয়ে। ভরি পিছু অল্প কিছু সস্তা দেয়। নেশাখোরদের কাছে একটা পয়সা, একটা আধলাও মূল্যবান। তা'ছাড়া এই লুকিয়ে কেনার একটা আলাদা নেশা আছে। এই মালের যা তেজ, সে সরকারী মালে নাই। নেশাখোরেরা বলে—সরকারী মালের আরক বের ক'রে আর কিছু থাকে না। এ মালের জোর চাহিদা।

মাল নিয়ে এসেছিল একজন পাঞ্জাবী মুসলমান। আমীরের মত চেহারা। তেমনি তার বেশভূষা। নরসিং তাকে দেখেছে। সে এসে উঠেছিল ডাক-বাংলোয়। চামড়ার খোঁজে সমস্ত দিন কাটিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে এসে উঠল শুখনরামের গদীতে। শুখনরাম রাত্রে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল।

অন্দরমহলেরও ওধারে একখানা ঘর। সেই ঘরে কারবার, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। গোলক-ধাঁধার মত ঘুরে ঘুরে পথ। নরসিংকে ডেকে শুখনরাম ঘিয়ের টিন দুটো হাতে দিলে। বললে—হাজার রূপেয়ার মাল। জগুবাবুর পাশে পানশো রূপেয়া গুনে লিবেন। কুছ ডর নেহি। বড়া জমিদারের কাছাহরী, একদম ঘুসে যাবেন গাড়ী লিয়ে। দিল চাহে তো হুঁয়া থাকবেন রাতমে।

কারবারী মুসলমান ভদ্রলোক বললেন, নেহি। রাত্তিরেই চোলে আসবেন। রাত্তিরেই আমি যাব—ট্রেন ধরব, গাড়ী চাই আমার।

নরসিং আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল; চমৎকার বাংলা বলেন ভদ্রলোক। সামান্য টান, আর দু'একটা কথার বাঁকা উচ্চারণ ছাড়া ধরাই যায় না যে, ভদ্রলোক বাঙালী নন।

শুখনরাম বলেছিল, আরে না—না। সো হবে না সাব। তারপর অশ্লীল কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলে সে; যার অর্থ হল শুখনরাম তাঁকে একটি অতিসুন্দরী নারী উপহার দিতে চায়।

নরসিং চমকে উঠল। কে সে? সে কি—?

পরমুহূর্ত্তেই শুখনরাম বললে, আচ্ছা, পহেলে দেখেন। বলেই সে চলে গেল অন্দরের দিকে। নরসিং দাঁড়িয়ে রইল।

মুসলমাম ভদ্রলোক বললেন—শিগ্‌গির শিগ্‌গির চলে যান। শিগ্‌গির শিগ্‌গির ফিরবেন। রাত্তিরেই আমি যাব। যান দেরী করবেন না।

নরসিং তবু গেল না। বললে—হ্যাঁ, যাই। বলেও সে দাঁড়িয়ে রইল।

ঠিক এই সময় তার অনুমানকে সত্য ক'রে ফট্‌কিকে সুমুখে নিয়ে উপস্থিত হ'ল শুখনরাম। ঘরের মধ্যে ফট্‌কিকে ঠেলে কুৎসিত বীভৎস হাসি হেসে শুখনরাম বললে, দেখেন।

নরসিং আর দাঁড়াল না। চলে এল। গাড়ীতে চেপে নিতাইকে বললে—মার্ হাণ্ডেল।

নিতাই জানে ব্যাপারটা। রাম জানে না। রাম বিস্মিত হয়ে বললে—প্যাসেঞ্জার কই ?

দুর্দ্দান্ত ক্রোধে নরসিং যেন ফেটে পড়ল—চোপরও শালা হারামী কাঁহাকা। সে খবরে তোর দরকার কি ?

গাড়ীখানা গোঙাচ্ছিল। সুইচ টিপে হেড লাইট জেলে দিয়ে নরসিং গাড়ী ছাড়লে। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ধূমকেতুর পুচ্ছের মত তীব্র আলো সামনে ফেলে গাড়ীখানা ছুটছিল। জনহীন পথ। হঠাৎ নিতাই বললে—সাপ, সাপ যাচ্ছে।

রাস্তার পার থেকে একটা কালো সাপ চলে যাচ্ছে ওপারে ; নরসিং বাড়িয়ে দিলে গতিবেগ, একটা কঠিন আক্রোশে পূর্ণশক্তির পথ পায়ের চাপে মুক্ত করে—গাড়ীখানাকে ছেড়ে দিলে। দেবে—ওটাকে সে চাপা দেবে। গেল, গাড়ীর সামনে থেকে বেরিয়ে গেল! ক্ষিপ্রহাতে ষ্টীয়ারিং অল্প বেঁকিয়ে দিলে নরসিং। বেঁকে গাড়ীখানা প্রায় রাস্তার প্রান্তে এসে পড়ল, আর হাত দুয়েক পরেই নেমে গিয়েছে রাস্তার ঢাল। আবার বেঁকল গাড়ীখানা। রাস্তার মাঝখানে এসে আরও খানিকটা গিয়ে থামল। ব্রেক কষে নরসিং বললে—দেখতো টর্চ্চটা জেলে।

নিতাই টর্চ্চ জ্বাললে। সাপটার মাথার দিকটাই ছেতরে গিয়েছে মোটা রবার টায়ারের চাপে। ধূলোর উপর টায়ারের ছাপ এঁকে বসে গিয়েছে। পিছনের দিকটা এখনও নড়ছে।

শালা!

মোটরটা এবার অপেক্ষাকৃত সংযত গতিতে চলল।

জগবন্ধু বাঁড়ুজ্জের একটা পা নাই। বগলে ঠুঙি লাগিয়ে এসে দাঁড়াল। এক নজরে নরসিং তাকে চিনে ফেললে—লোকটা শুখনরামের চেয়েও হারামী। ওর দুটো ঠ্যাঙ থাকলে দুনিয়ার সর্ব্বনাশ করে ফেলতে পারত। ওর চেয়েও সয়তান ওই পাঞ্জাবী লোকটা। রাত্রে স্টেশনের পথে বললে—

এসব কারবারে সঙ্গে পিস্তল রাখতে হয়। নিজে পিস্তল বার ক'রে দেখালে।

নরসিং দেখলে পিস্তলটা। দেখবামাত্র তার বুকের ভিতরটা লালসার আগ্রহে চঞ্চল হয়ে উঠল। মারণাস্ত্রের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। ওঃ, ওই জিনিষটা কাছে থাকলে দুনিয়ায় আর কিসের ভয়! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে আবার গাড়ী চালাতে লাগল।

সকাল বেলা উঠে মনে হল মনটা তার অত্যন্ত খারাপ হয়ে আছে। নিতাই রাম গাড়ী নিয়ে পড়েছে। খুলে আগাগোড়া সাফা করতে হবে, রদ্দি পার্টস দেখে সেগুলো বিলকুল পাল্টাতে হবে। শুখনরাম আজই টাকা দেবে। দলিল তৈয়ার হচ্ছে তার উকীল সাহেবের দপ্তরে। এখানকার সব চেয়ে ভাল উকীল তার উকীল। বুড়া উকীলটার গোঁফ জোড়াটা দেখে মনে হয় লোকটা একটা উকীলের মত উকীল। কিন্তু ঠিক ভাল লাগছে না নরসিংয়ের। জোসেফ বলেছে, শুখনরামের সঙ্গে লেন-দেনের কারবার করে ভাল করলেন না আপনি।

নিতাই বলেছে—বেটা হাড়ির মতলব ছিল আপনাকে ওর বহিনের টোপ দিয়ে মুফতে আপনার গাড়ীর ভাগীদার হতে—

ধমক দিয়েছে নরসিং। নিতাই গুম্ হয়ে আছে। দুঃখিত হয়েছে একটু। তা হোক। কিন্তু এমন অন্যায় কথা কখনই বরদাস্ত করবে না সে। মেরী নীলিমা বড় ভাল মেয়ে। প্রথম দিন তাকে দেখে তাদের পূর্ব্বপুরুষের যে গল্প তার মনে পড়েছিল, সে গল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আজ আর নরসিং নীলিমাকে নিয়ে কল্পনা করতে সঙ্কোচ মনে করে। অন্যায় মনে হয়।

নরসিংয়ের মনে কেমন একটা আফশোষ হচ্ছে। শুখনরামের সঙ্গে জড়ানোটা ভাল হয় নাই। গত রাত্রির কথা মনে হচ্ছে। ফট্‌কীর উপরে ঘেন্না হচ্ছে। আবার মনে হচ্ছে সে করবে কি? সে নিজে কি করলে? কাল রাত্রে সে যা করেছে—না ক'রে তার যেমন উপায় ছিল না, তেমনি ফট্‌কিরও

ছিল না কোন উপায়। ও মেয়ের ওই নসীব। নরসিং মোটর ড্রাইভার—তার ওই নসীব। গেজেট খবরের কাগজ পড় না—দেখতে পাবে—মোটর ড্রাইভারের নসীব তাদের কোন্‌পথে নিয়ে যায়! হরদম দেখতে পাবে মোটর ডাকাতির কথা। ড্রাইভারের নসীব পাক লাগিয়ে তাকে ডাকাঁতদের সঙ্গে জড়িয়ে দিচ্ছে। দেখতে পাবে পথ থেকে জবরদস্তি তুলে নিয়ে গেল জেনানী—কারও বহু, কি কারও বেটী। নসীবের ফের—ড্রাইভার কি করবে! হাঁ, টাকার লোভ একটা অপরাধ বটে—আর এ সব কাজের নেশাও বটে। কিন্তু নরসিংয়ের বিশ্বাস—এ সব হল মোটর ড্রাইভারী নসীবের ফের। তার যে কিছুতেই ইচ্ছা হচ্ছে না শুখনরামের এই পাপ কাজ করতে। কিন্তু কি করবে, উপায় নাই যে।

মোটা মুনাফা আর এই কাজের নেশা। গড়ের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকে বাবু-লোক সায়েবলোক ট্যাক্সী নিয়ে, পিয়ারী এসে ওঠে। মোটা ভাড়া মেলে, চোখ সামনে রেখে বসে থাকে ড্রাইভার—পিছনে চলে—অশ্লীল কাণ্ড। কি করবে ড্রাইভার? দু দশ দিন পরে এ কাজে নেশাও একটা জমে যায়, তখন মজা লাগে। নরসিংয়েরও সয়ে যাবে। মজা লাগবে। পাঞ্জাবী কাল রাত্রে ষ্টেশনে পৌছে করকরে দুখানা দশ টাকার নোট দিয়ে গিয়েছে। [illegible] কুড়িটা টাকা ছাড়া যায়! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে।

—সিংজী! শুখনরামের কর্ম্মচারী ডাকছে।—চলুন উকীল-বাড়ী। শেঠজী বললেন।

—চলুন। না গিয়ে উপায় কি!

বিকেলে শেঠজী দু বোতল মদ দিলে। কাল রাত্রের ভাড়াটা শুখনরাম দেয় নাই। এটা তারই বদলে দিচ্ছে বোধ হয়। উপায় নাই—ডুবতেই হবে, ফট্‌কীও ডুববে। কোন্ দিন দেবে বিক্রী করে কাউকে মোটা টাকায়।

পাঁচমতী—পাঁচমতী! পাঁচমতী!

শ্যামনগর থেকে সার্ভিসের প্রথম ট্রিপে ছাড়বে।—পাঁচমতী খেয়া ঘাট ছ আনা। মোটর ট্যাক্সী।

ট্যাক্সীর ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে হাঁকছে রামচন্দর। নিতাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। গেঁয়ো প্যাসেঞ্জারদের ধরে আনতে হয়। দরকার হলে পুঁটলী পোঁটলা মোট ঘাট বয়ে এনে চাপিয়ে নিতে হয়। নামিয়ে দেবার সময়—ও দায়িত্ব নাই। গাড়ী থেকে পথের ধারে নামিয়ে দিলে খালাস। বিরক্তি ধরলে—মেজাজ খারাপ থাকলে—ছুঁড়ে ফেলে দিলেও দোষ নাই।

গাড়ী মেরামত হয়ে গিয়েছে। সার্ভিস খুলেছে নরসিং। মন্দ চলছে না। মন্দ কেন, ভালই চলছে। কিন্তু শেঠকে নিয়ে মনটা খুঁতখুঁত করছে। লোকটা ভয়ানক ঘড়িয়াল। কি ভাবে, কে জানে? বোধ হয় ওই টাকা ক'টা দিয়ে ভাবছে টাকাটা নরসিং দেবে না। রোজ সন্ধ্যার পর—গাড়ী ট্রিপ শেষ করে ফিরলেই আসবে।—কি মশা, আজ কেত্‌না হ'ল সেল আপনার? হিসেবটি নিয়ে ফিরবে। সপ্তাহ শেষে বলবে, দিয়ে দিন না খরচ বাদে যা আপনার বাঁচল। কি করবেন নিজের কাছে রেখে? বাচ্চা তো হবে না আপনার রূপেয়ার।

আশ্চর্য্য মানুষ! যে মানুষ গদ্দিতে বসলে কথা বলতে ভয় হয়, মনে হয় একটা [illegible] মত ভয়ানক লোক বসে আছে, সেই মানুষ নরসিংয়ের কাছে এসে দিব্যি তার সতরঞ্জিতে পাশে বসে হেসে কথা বলে। হাসি তামাসা করে। মধ্যে মধ্যে বলে, কত নিজের হাতে আর রান্না করবেন মশা? একটা সাদী করেন—না তো একঠো মেয়েলোক রাখেন। কাম কাজ করবে, থাকবে। উসমে কেয়া দোষ? খুব গম্ভীর ভাবে বলে। নরসিংয়ের ইচ্ছা হয় ফট্‌কির কথা বলে। কিন্তু আশ্চর্য্য, সাহস হয় না। নিতাই প্রথম দিনে শুখনরামকে ঠাট্টা করে বলেছিল—দাদা নয়, উনি আমার ঠাকুরদাদা। ঠাকুরদাদা পেয়ারা খায়! সেই নিতাই এখন কথাই বলতে পারে না, শুখনরাম এলে চুপ করে বসে থাকে। লক্ষ্য ক'রে দেখেছে নরসিং—নিতাই আপনা আপনি হাত জোড় ক'রে বসে।

নরসিং একদিন বলেছিল নিতাইকে—হাত জোড় করিস কেন ?

নিতাই আশ্চর্য্য হয়ে উত্তর দিয়েছিল—না তো।

রাম বেরিয়ে চলে যায় ঘর থেকে শুখনরাম এলে।

অবসর পেলেই এই সব কথা ভাবে নরসিং।

ষ্টিয়ারিংয়ের উপর বুক রেখে অলস দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে নরসিং ভাবে, কোথা থেকে সে কোথায় এসে পড়ল! দুশোর জায়গায় চারশো টাকা দিয়েছে শুখনরাম। কতকগুলো পার্টস বদলে গাড়ীখানা অবশ্য মজবুত হয়েছে, তাজা হয়েছে। দুশো টাকা এষ্টিমেট ক'রে গাড়ীখানাকে ভাল করবার ঝোঁকে নরসিং চারশো টাকা খরচ ক'রে ফেলেছে। শুখনরাম তাতে আপত্তি করে নাই। সে বলে—আপনি হামার কাম দিবেন আপনার কাম হামি জরুর চালাইয়ে দিব।

কোন রকমে টাকাটা উপায় ক'রে শুখনরামকে ফেলে দিতে পারলে সে তখন খালাস হতে পারবে এ বন্ধন থেকে।

কখন ছাড়বে গাড়ী ? পিছনের সিটে তিনজন প্যাসেঞ্জার বসে আছে। তারা বিরক্ত হয়ে উঠেছে।—পাবলিক সার্ভিসের গাড়ী। তার ছাড়বার একটি ধরা-বাঁধা সময় থাকা উচিত। যখন খুশি তখন ছাড়ব বললে চলবে না। এগুলো অত্যন্ত বে-আইনী ব্যাপার।

ঘোড়ার গাড়ী কখন ছেড়ে চলে গিয়েছে।

তাড়াতাড়ি যাবে বলে এক আনা বেশি ভাড়া দিয়ে মোটরে এলাম।

নরসিং ষ্টিয়ারিং ছেড়ে খাড়া হয়ে বসল। বললে—ঘোড়ার গাড়ীর আগে পৌছলেই হ'ল তো আপনাদের ?

ঘোড়ার গাড়ীর আগে কি পরে সেটা কোন কথাই নয়। পাঁচমতী কোন্ টাইমে পৌছবার কথা সেইটাই হ'ল কথা। ঠিক টাইমে যদি না পৌছয় তাতে যদি আমার ক্ষতি হয়, তার দায়ী হতে হবে তোমাকে।

নরসিং এ কথার কোন জবাব দিলে না। জবাব দিতে গেলে চলে না।

ঘোড়ার গাড়ীওয়ালা তাকে তাড়াবার জন্মে উঠে পড়ে লেগেছে। ভাড়া নামিয়েছে পাঁচ আনায়। বাধ্য হয়ে নরসিং ভাড়া করেছে ছ'আনা। রাস্তায় চলবে এমনভাবে যে, কোন রকমে যেন ঘোড়ার গাড়ীর সারি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় না থাকে। ঝগড়া একটা বাধাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। পরন্তু রামাকে বাজারের পথে একা পেয়ে গালাগাল করেছে, মারতেও এসেছিল। কোন রকমে সে দিনটা রক্ষা হয়েছে।

পাঁচমতী-শ্যামনগর, পাঁচমতী-শ্যামনগর। মোটর টেক্সি। ছ'আনা—ছ'আনা। হি-হি ক'রে হাসতে-হাসতে রামা এল দু'জন প্যাসেঞ্জার নিয়ে।

ছাড়ুন মশায়। ছাড়ুন। এই তো পাঁচজন হয়ে গিয়েছে।

এই তো বিপদ এদের গাড়ীতে চাপার! না আছে ছাড়বার ধরা-বাঁধা সময়, না আছে ক'জন প্যাসেঞ্জার নেবে তার কোন আইন! গরু ছাগলের মত ঠেসে ভরে দিলে—সে তোমরা মর আর বাঁচ, ওদের পয়সা হ'লেই হ'ল!

নিতাই এল। রামা হি-হি ক'রে হেসে বললে—শুধু হাতে এলি? হি-হি-হি। আমি আজ—

হ্যাঁ—হ্যাঁ। তোরই জিৎ—। হ্যাণ্ডেল মার্।

নিতাই বললে—আপনার পাশের সিট খালি রাখেন। নেসপেক্টারবাবু যাবেন।

ভেতরে জায়গা কোথায় হে বাপু? তিন জন তো বসেছি।

নরসিং আবার রূঢ় দৃষ্টিতে ভিতরের দিকে চেয়ে বললে—চার জনের সিট ওটা—চারজন বসবে ভেতরে।

কক্ষণও না। তিনজনের সিট।

আজ্ঞে না। চারজনের।

চারজনের সিট কিসে তোমার লেখা আছে দেখি? কোন্ আইনে আছে?

মাথা গরম হয়ে উঠল নরসিংয়ের। এক একজন আইন জানা লোক

আছে, প্রতি কথাতেই তারা আইন দেখায়। নরসিংয়ের ইচ্ছা হ'ল লোকটাকে নামিয়ে দেয়। কিন্তু তাতে এই সার্ভিস চালু হওয়ার মুখে বদনামী হবে। একটু চুপ ক'রে থেকে নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে নরসিং বললে—আজ্ঞে বাবু, এই তো একটুখানি পথ—সাত মাইল। আধ-ঘণ্টার মধ্যে চলে যাব। একটু কষ্ট না করলে উপায় কি? সবারই তো যাওয়া চাই। তা ছাড়া পুলিস ইন্সপেক্টার যাবেন—কি করব আমরা? ভাড়া যা পাব সে তো জানেনই। কিন্তু সিট না রেখে তো আমাদের উপায় নাই!

তবু লোকটা গজগজ করে।—হলেই বা পুলিস ইন্সপেক্টার। আইন মেনে চলতে হবে তো তাঁকে? না, পুলিস ব'লে সাতখুন মাপ তাঁর? না, মানুষের মাথায় পা দিয়ে যাবেন!

একটা লোক ক্রমাগত তার পুঁটলি নিয়ে ব্যস্ত। সামনে বনেটের পাশে একটা মোট রাখা হয়েছে—বার বার সে উঁকি মেরে দেখছে আর প্রশ্ন করছে—ওটা পড়ে যাবে না তো?

না—না। ঠিক আছে।

একটু সোজা ক'রে দাও দেখি ভাই। একটু টিপে খাঁজে বসিয়ে দাও। ও মশাই—পোঁটলাটায় পা দেবেন না। আঃ ছি-ছি-ছি। এই দেখ দেখি কি ক'রে দিলে মোটটাকে—মুখের বাঁধনটা আলগা হয়ে গেল যে!

নিতাই বললে—ও মশাই বকের মত গলা বাড়াবেন না। মোট আপনার ঠিক আছে।

বসুন মশাই, বসুন ঠিক হয়ে। গাড়ীতে যাওয়া-আসারও কতকগুলো নিয়ম আছে। সেগুলোও আইন। বসুন।

গাড়ী ছাড়ল নরসিং।

থানার সামনে থামল। ইন্সপেক্টারবাবু উঠবেন।

নিতাই বললে—চা খাবেন? পাশেই চায়ের দোকান।

থাক্, পাঁচমতীতে দাসজীর ওখানে খাব।

দাসজী, সেই সুরেশ দাস। চায়ের ষ্টলওয়ালা বৈষ্ণব। যে বলেছিল—তুম বি মিলিটারী হাম বি মিলিটারী।

পাঁচমতী-শ্যামনগর। পাঁচমতী-শ্যামনগর মোটর সার্ভিস। ছ'আনা ভাড়া।

বারো

সুরেশ দাসের চা-খাবারের দোকান পাঁচমতীতে নরসিংয়ের আস্তানা। সুরেশ দাসের সঙ্গে নরসিংয়ের দোস্তিটা জমে উঠেছে। দাসকে বড় ভাল লেগেছে। দিলখোলা লোক, মিলিটারী মেজাজ। চড়া কথা, কড়া মেজাজ, রাঙা চোখ—এ তিনটের একটাও তার সহ্য হয় না। লাঠি দেখালে সে ডাণ্ডা দেখায় লোহার রড, উনোনের ধারেই সেটা পড়ে থাকে; মধ্যে মধ্যে সেটা দিয়ে উনোনে খোঁচা দিয়ে আগুনের আঁচ তাজা এবং তেজালো করে তোলে সুরেশ। কিন্তু ভাল কথা মিষ্টি কথা বললে সে খুসী; প্রাণ খুলে হা-হা ক'রে হাসে তখন। তুমি ভাল তো সুরেশ দাস মাটির মানুষ, তার উপরে দোস্তি হলে আর কথাই নাই, দোস্তের গোলাম সে।

মোটরের হর্ন পেলেই দাস দাওয়া থেকে নেমে গিয়ে চেঁচায়, আ-গিয়া—আ-গিয়া পাঞ্জাব মেল—বোম্বাই মেল—তুফান মেল! আ গিয়া।

লোহার ডাণ্ডাটা দিয়ে আগুনের আঁচ জোরালো করে দিয়ে জল গরমের পাত্রটার ঢাকনী খুলে—জলের অবস্থাটা একবার দেখে নেয়, তারপর আরও খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয়; অনেকক্ষণ ধরে যে জল ফুটছে সে জলে চা ভাল হয় না, তাই ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে নতুন ক'রে ফুটিয়ে নেয়। টেবিলের উপর সারবন্দী কাপ সাজিয়ে ফেলে চিনি পরিবেশন করতে থাকে। ছোট

ভাই ভবেশকে বলে—কেটলীতে গরম জল ঢাল্। সিগারেটের টিনে একটা বাখারী লাগানো হাতা ডুবিয়ে ফুটন্ত জল কেটলীতে ঢালে ভবেশ। স্থরেশ হাঁকে—আ গিয়া পাঞ্জাব মেল! গরম চা! চা-গ্রম! সিঙাড়া নিমকি—টাটকা তাজা ভাজা—দেশী চপ্ কাটলেট!

নরসিংয়ের গাড়ী এসে ব্রেক কষে দাঁড়ায় দোকানের সামনে। খুব একরাশ ধোঁয়া বার ক'রে দিয়ে এক চোট গর্জ্জন ক'রে ইঞ্জিনটা থেমে যায়। প্যাসেঞ্জাররা নামে। অনেকে চা খাবার খায়, নরসিং নিতাই রাম এরা বসে দোকানের এক পাশে একটা স্বতন্ত্রভাবে ঘেরা জায়গায়; স্থরেশ ওটা তৈরী করিয়েছে দোস্তদের জন্য। ওইখানে আড্ডা পড়ে নরসিংদের। আড্ডা চলে ট্রিপের ফাঁকে ফাঁকে। শ্যামনগর থেকে ভোর ছটায় ছাড়ে—সাত মাইল পথ আসতে লাগে পঁয়ত্রিশ মিনিট, পঁচিশ মিনিট পাঁচমতীতে থেকে সাতটায় ছাড়ে পাঁচমতী থেকে শ্যামনগর। ফের আটটায় শ্যামনগর থেকে পাঁচমতী সেকেণ্ড ট্রিপ। এ দফায় তিন কোয়ার্টার আড্ডা দেবার সময়। পাঁচমতী থেকে সোয়া ন'টায় ছাড়তে হয়; দশটা থেকে সাড়ে দশটায় যাদের আপিস তারা যায় ওই ট্রিপে। এই ট্রিপে ভিড় বেশী। দশজন পর্য্যন্ত চাপায় নরসিং। আরও বেশী চাপাবার উপায় থাকলে আরও বেশী প্যাসেঞ্জার হতে পারে এই ট্রিপে। পান চিবুতে চিবুতে আদালত, ট্রেজারী, মিউনিসিপ্যাটির কেরাণীবাবুরা হন্তদন্ত হয়ে আসে। জন দুয়েক ইস্কুল মাষ্টার আছে। সবশুদ্ধ জন বিশেক ডেলী প্যাসেঞ্জার। বিশজনের মধ্যে আটজন পাকা বন্দোবস্ত করে নিয়েছে নরসিংয়ের সঙ্গে। বাকী বারোজনের মধ্যে অধিকাংশই যায় ঘোড়ার গাড়ীতে। যাওয়া আসায় দৈনিক এক আনা ক'রে দু'আনা—তিরিশ দিনের চারটে রবিবার এবং ছুটি-ছাটা নিয়ে আর দুদিন, এই ছদিন বাদ দিয়ে চব্বিশ দিনের চব্বিশ দু'আনা—আটচল্লিশ আনা—তিন টাকা তাদের কাছে অনেক; আরও চব্বিশ বারো আনা আঠারো টাকা একসঙ্গে নরসিংকে দেওয়ায় তাদের সামর্থ্যে কুলায় না। এই বারোজনের মধ্যে যাদের যে দিন ভাত হয়ে ওঠে না, কি কোন

জরুরী কাজে আটকে যায়—তারাই সে দিন অগত্যা নরসিংয়ের গাড়ীতে যায়। পিছনে তিন জনের সিটে চার জন বসে—সামনে তার নিজের পাশে বসায় দু'জনকে, দুটো ছোট মোড়া পেতে দেয় পিছনের সিটের সামনে, তাতে দু'জন বসে; এতেই তার বাঁধা খদ্দের আট জন বসতে পায়। বাকী দু'জন বা একজন যারা আসে তাদের বসিয়ে দেয় সামনে মাডগার্ডের উপরে। বসতে আপত্তি করলে নেমে যেতে হবে। নরসিং কি করবে? বাঁধা বারোমাসের ডেলী-খদ্দেরদের বাদ দিয়ে ছুটো প্যাসেঞ্জারকে বসতে দিতে পারে না। এই ট্রিপে গাড়ী চলে ভর্তি মালঠাসা মহাজনী নৌকার মত। সাত মাইল যেতে পঞ্চাশ মিনিট লেগে যায়। খানাখন্দ দূরে থাক্ ছোটখাট গচকায় গাড়ী পড়লে ঘটাং শব্দ ক'রে স্প্রিংয়ের উপরের পাটীখানা নীচের পাটীতে ঠেকে যায়। স্পীড বেশী দিলে স্প্রিং খতম হয়ে যাবে। সাত মাইলের মধ্যে চার মাইল রাস্তার অবস্থা প্রায় মাঠের রাস্তার মত—এই চার মাইল সে চলে ঘণ্টায় আট মাইল স্পীডে, জায়গায় জায়গায় পাঁচ মাইলে কমাতে হয়; বাকী তিন মাইল শ্যামনগরের মুখটায় রাস্তাটা ভাল, এখানে সে দশ মাইল দমে গাড়ী ছাড়ে, মধ্যে মধ্যে পনের মাইলেও ওঠে। শ্যামনগরে ঢুকেই সেই তেমাথাটা, যেখানে ব'সে সে প্রথম দিন গাড়ী আর পায়ে-হাঁটা যাত্রী গুনেছিল—সেইখানে গাড়ী থামিয়ে প্রথমেই নামিয়ে দেয় ছুটো প্যাসেঞ্জার—যাদের বসতে হয় মাডগার্ডের উপর, তাদের। খানিকটা গিয়েই নেমে যায় ইস্কুলের মাস্টারবাবু দুজন। ব্যস—তারপর আবার কি? আর ধরে কে? থানা কোর্টের সামনে দিয়ে গাড়ী নিয়ে চলে নরসিং। এতেও অবশ্য সেপাইদের মাস মাস কিছু কিছু দিতে হবে। একটা কথা আছে—"ভাল করতে নাই পারি মন্দ করতে তো পারি, এখন কি দিবি তা বল্?" আইন মেনে চললেও কিছু না পেলে ছুতোনাতা করে একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে ফেলবে। কিছু না পারলে মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় পাঁচ আইন আছে। আর পাঁচ আইনের মামলায় সাক্ষী-সাবুদ প্রমাণ প্রয়োগ এসব কিছু নাই, আছে জরিমানা। দাঁড়ানো মাত্র জরিমানা দু'টাকা, প্রতিবাদ ক'রে

"অপরাধই করি নাই' বললে জরিমানা তিন টাকা হয়ে যায়, আবারও কিছু বলতে গেলে তিন টাকা পাঁচ টাকায় লাফিয়ে ওঠে। তার চেয়ে মা-শেতলা, ওলাইচণ্ডী, বাবা-ব্রহ্মদৈত্যের মত প্রণাম করে পূজো দেওয়াই ভাল। ঘোড়ার গাড়ীওয়ালারা গাড়ী পিছু চার পয়সা দেয়, সকালে সর্ব্বাগ্রে চৌমাথার সিপাহীজীকে দিয়ে তবে গাড়ী ছাড়ে। সে দেয় চার আনা হিসাবে। পাঁচমতীতেও দিতে হয় দু'আনা। এই সাড়ে নটার ট্রিপটি ছাড়বার ঠিক আগেই একজন ওদের আসবেই। সুরেশ দাসের দোকানে বসবে।—"চা হৈলো ভাই সুরেশ? দেখি একঠো বিড়ি।"

বিড়ি ধরিয়ে দোকানের সামনে বেঞ্চিটাতে চেপে বসবে। নরসিংকে আপ্যায়িত করবে—"কেয়া ভাই সিংজী, কেমন আছেন মশা?" তারপরই বলবে, "মরসুম তো সিংজীর। আরে বাপ রে! বাদুড়কে মাফিক পেসিঞ্জর ঝুলকে ঝুলকে যাচ্ছে রে বাবা!" তারপর একদফা অট্টহাসি। হাসি থামিয়ে বলবে, "তা বেশ, বহুৎ ভালা, আপকে উন্নতিমে হামি লোক খুসি আছি।"

সুরেশ চায়ের কাপটি হাতে দিয়ে বলে, লেন।

—দুঠো নিমকি তো দেও রে ভাই।

সুরেশ নিমকি দিয়ে আর একটি বিড়ি বার ক'রে পাশে নামিয়ে দেয়—তারপর দেয় দুটি সুপারী কুঁচি। এবং চোখ টিপে নরসিংকে ইসারায় বলে, ফেলে দেন দু'আনি একটা। নরসিংয়ের কাছে বিদায়ী নিয়ে সুপারী চিবিয়ে বিড়ি ধরিয়ে নরসিং এবং সুরেশের কিছু হিতসাধন ক'রে আস্তে আস্তে খসে পড়ে। তবে মধ্যে মধ্যে উপকার পায় নরসিং। এস-ডি-ও, ডি-এস-পি কি ম্যাজিষ্ট্রেট, এস-পি এ রাস্তায় যাবার কথা থাকলে সেটা তারা জানিয়ে দেয়। শ্যামনগর চৌমাথাতেই বলে দেয়, আজ থোড়া হুঁসিয়ারীসে যাবেন ভাইয়া, পুলিস-সাব যায়েগা পাঁচমতী।

পাঁচমতীতে বলে, এ ভাই, নরসিং দাদা, ডি-এস-পি কো আনে কা বাত হায়।

নরসিং সেদিন আর মাডগার্ডের উপর কাউকে বসায় না। ভিতরের আট জনের মধ্যেও জন দুইকে কোন রকমে ফাঁকি দিয়ে গাড়ী ছেড়ে দেয় ; ছ'জন এসে জুটবা মাত্র নিতাইকে বলে, মার্ হ্যাণ্ডেল্। রামকে রেখে যায় সুরেশের দোকানে।

নিতাই অর্থপূর্ণ স্বরে ডাকলে, সিংজী !

নরসিং উত্তর দিলে, হুঁ। অর্থাৎ সে দেখেছে এবং ঠিক আছে।

ঘোড়ার গাড়ীগুলো সামনে চলছে পাঁচমতী থেকে শ্যামনগর। চারখানা গাড়ীর একখানা আছে আগে তারপর পাশাপাশি দু'খানা, তাদের পিছনে একখানা। বেশ বন্দোবস্ত ক'রে সাজিয়ে রাস্তা বন্ধ ক'রে চলেছে। ওদের পাশ কাটিয়ে অতিক্রম ক'রে যাবার উপায় নাই। হর্ন দিলেও সরবে না। অর্থাৎ ঝগড়া করবার মতলব। অবশ্য নরসিং ইচ্ছা করলে পিছনের গাড়ীখানাকে ডাইনে রেখে ওদের মেরে এখুনি বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভয় হয় মাডগার্ডে যারা ব'সে আছে তাদের জন্য। নিতাই রাম হলে 'কুছপরোয়া নেহি' বলে সে হাঁকিয়ে দিত গাড়ী। কিন্তু এ সব হচ্ছে বচনবাগীশ 'ডরফোক্না' দল। মুখে লম্বা লম্বা বাৎ, রাজা উজীর খতম করে দেয় কিন্তু গাড়ীটা একটু টলুক, কাত হোক—ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে থাকবে, এ ওকে আঁকড়ে ধরবে আর চীৎকার ক'রে উঠবে মেয়েছেলের মত।

মন্থর গতিতেই গাড়ী চলছে। পুরানো গাড়ী, স্পীডোমিটার অনেকদিন আগে খারাপ হয়ে গিয়েছে। বার কয়েক মেরামত করিয়েছিল—তারপর সে একবারেই জবাব দিয়েছে, এখন কাঁটাটা নড়েও না চড়েও না, পাঁচ মাইলের দাগের উপর কাত হয়ে পড়ে আছে ; গাড়ীখানা খুব জোর ঝাঁকি খেলেও নড়ে না—একটু আধটু কাঁপে। নরসিং কাঁটাটার দিকে তাকিয়ে বলে—উয়ো শারোয়া মর্‌গিহিস। খুব রাগ হলে এক এক সময় ওটার উপর স্টার্টিং হ্যাণ্ডেলটা মেরে চুরমার করে দিতে ইচ্ছা হয় নরসিংয়ের। কিন্তু গাড়ীখানার শোভা বাড়িয়ে রেখেছে বলে ভাঙে না। যাক সে কথা। স্পীডোমিটার

খারাপ হয়ে গেলেও নরসিং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে গাড়ী কত মাইল জোরে চলছে। ছ-সাত মাইল। এর চেয়ে কমিয়ে শেষ পর্য্যন্ত পাঁচ মাইলে নামালেও উপায় হবে না। ছ্যাকড়া গাড়ীর পক্ষীরাজেরা তার চেয়েও কম জোরে চলেছে। ওদের আর দোষ কি? আকারে রামছাগলের চেয়ে একটু বড়, খেতে না পেয়ে এবং খাওয়ার অভাবে অষ্টপঞ্জর ঝরঝর করছে, নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে, চোখের কোণে পিঁচুটি জমেছে; লোহা এবং কাঠ দিয়ে গড়া ওই গাড়ী তার উপর পাঁচ থেকে সাত জন সোওয়ারীর ওজন টানবার, ওদের ক্ষমতা কোথায়? টানে চাবুকের চোটে—জান দিয়ে কলিজা ফাটিয়ে টানে, দাঁড়াতে পেলেই হাঁপায়। কতকগুলোর পিঠে গাড়ীর সাজের ঘর্ষণ লেগে ছাল চামড়া উঠে দগদগে ঘা হয়েছে। মধ্যে মধ্যে মায়া হয় নরসিংয়ের। মনে হয় ওই কোচম্যানগুলোকে ধরে ওই চাবুক কেড়ে নিয়ে চাবকায়। আবার কখনও কখনও দয়াও হয়। মনে হয় সে মোটর নিয়ে আসাতেই ওদের মন্দ দশা আরও মন্দ হয়ে গিয়েছে। কোচমানদের রুটি ঘোড়াগুলোর দানা-পানিতে সেই ভাগ বসানোর জন্যেই ওদের ওই দশা। এর আগে বোধ হয় আরও একটু গায়ে-গতরে ছিল ঘোড়াগুলো। কিন্তু সে কি করবে? এই তো দুনিয়ায় ধারা-ধরন। একজন ওঠে একজন পড়ে। মানুষের মত এই সব ব্যাপারেও ঠিক ওই এক ধারা-ধরন। কেরোসিন এসে রেড়ির তেলকে ওঠালে। লণ্ঠন এসে ডিবিয়াকে ওঠালে। দুম্‌ড়ে ভাঁজার চাকু ছুরির আমদানী হল, কামারে ছুরির দিন গেল। ক্ষুরের মাথা খেতে বসেছে, বাজারে 'বেলেড' ক্ষুর এসেছে। গাঙের বুকে নৌকার রেওয়াজ উঠতে বসেছে ইষ্টিমারের ধাক্কায়। তামাকের ব্যবসাতে মন্দা পড়েছে, সিগারেট চলছে মুখে মুখে। কলকাতাতে ট্রামগাড়ী ঘোড়ার গাড়ীর মাথা খেয়েছিল, সেই ট্রামগাড়ী কায়দা হয়ে গেল—দোতালা বাসের রেওয়াজে। শ্যামনগর পাঁচমতীতে সে এসেছে মোটর নিয়ে, ঘোড়ার গাড়ী নাজেহাল হবেই; সে না এলে আর কেউ আসত। সে হয়তো অন্য লোক আসত দু'দিন পরে। তফাত এইটুকু।

ঘন ঘন বার কয়েক হর্ন দিয়ে নরসিং মুখ বাড়িয়ে বললে—কি হে পথ দেবে, না দেবে না? মতলব কি?

উত্তর দিল না ওরা। কষের দাঁতে জিব ঠেকিয়ে ক্যা-ক্যা শব্দ করে মাথার উপর চাবুক ঘুরিয়ে শব্দ করতে লাগল।

এদের সঙ্গে লড়াই একদিন দিতেই হবে। না দিয়ে উপায় নাই। নিতাই পাশে দাঁড়িয়ে আপন মনেই গাল দিতে স্থরু করেছে। নরসিং ছত্রির ছেলে—লড়াই দিতে পিছপাও নয়। কিন্তু সে তাকালে গাড়ী-ভর্ত্তি প্যাসেঞ্জারদের দিকে। কেরাণীবাবু আর ইস্কুল মাস্টার সব। বিপদ এদের নিয়ে। একটা কিছু হলে ওরা গাড়ী থেকে নেমে ছুটতে স্থরু করবে। তারপর ওরাই দেবে তার ব্যবসার গায়ে জল। ইতিমধ্যে ওরা অধীর হয়ে উঠেছে। হাতের বিড়ি সব নিবে গিয়েছে, ধরেই আছে; উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে ঘোড়ার গাড়ীগুলোর দিকে তাকিয়ে—উঃ—আঃ করছে। নরসিং আবার হাঁকলে—এই ঘোড়ার গাড়ী!

ঘোড়ার গাড়ীর একজন কোচোয়ান বললে—রাস্তা তো কারু বাবার নয়, এস না তুমি পিছু পিছু।

নিতাইয়ের অন্তর সহ্য হ'ল না, সে লাফিয়ে নেমে এগিয়ে গিয়ে বললে—মটরের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ী যেতে পারে না। তাকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হবে।

একজন—এ সেই সোভান, সোভান আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে, তারপর বললে সকলের পিছনের গাড়ীওয়ালাকে—এ কাদির, দে না বে চাবুকটা হাঁকড়ে শালার মুয়ে।'

নিতাই ক্ষেপে উঠল। গাড়ীর প্যাসেঞ্জারদের সকলেও গরম হয়ে উঠেছে। একজন বললে—আজই গিয়ে একটা দরখাস্ত করতে হবে। এ তো ওরা অত্যাচার আরম্ভ করেছে।

একজন মুখ বাড়িয়ে বললে—কি হে, তোমাদের গাড়ী তোমরা এক পাশ করবে কি-না?

সোভান হেসে দাঁত বার করে কাদিরকে বললে—আবে কাদির, শালা চুনো পুঁটিরা কি বলেছে রে ?

কাদির জবাব দিলে—বেইমান হারামী সব আজ মোটর পেয়েছে। সা-লা—মোটর—! সালা—!

নিতাই এগিয়ে চলল ঘোড়ার মুখের কাছে—গিয়ে লাগাম ধরে টেনে এক পাশে সরিয়ে দেবে জোর করে। নরসিং হঠাৎ ডাকলে—নিতাই !

নিতাই জবাব দিলে—থামুন, আমি দিচ্ছি ঠিক ক'রে।

ফিরে আয়।

ফিরে যাব ? নিতাই বিস্মিত হয়ে থমকে ঘুরে দাঁড়াল।

হ্যাঁ। নরসিং ষ্টিয়ারিংয়ে পাক দিয়ে গাড়ীর মুখ ঘোরাচ্ছে বাঁ পাশে। বাঁ পাশের ঢালটা বেশ চওড়া। বেশ ক্রমে ক্রমে ঢালু হয়ে পাশের মাঠের সঙ্গে মিশেছে। নরসিং সামনে স্থির দৃষ্টি রেখে ডাকলে—নিতাই !

নিতাইয়ের মন বিদ্রোহী হলেও উপায় নাই। গাড়ী নামবে ঢালের মুখে, সিংজীর বাঁ পাশে দুজন লোক বসেছে। মাডগার্ডে লোক বসেছে, বাঁ পাশটায় সিংজীর নজর পুরো চলবে না। ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে তাকে ওপাশটা দেখতে হবে, বলতে হবে সিংজীকে—"ঠিক আছে। চলুক, চলুক। হুঁসিয়ার, গচকা আছে, হুঁসিয়ার। আচ্ছা—ঠিক হ্যায়।"

গাড়ী নামল ঢালের মুখে।

ও বাবা, মাঠে নামছে কোথা হে ? আরে ওহে—ওই, কি বিপদ ; এই এই ! ওহে ! মাডগার্ডের একজন চীৎকার করে উঠল।

চুপ করুন, ঠিক আছে। ভয় নেই।

সোভান চেঁচাচ্ছে—চল—চল জলদি। সাপাসপ চাবকাচ্ছে ঘোড়াগুলোকে। ওরা বুঝতে পেরেছে নরসিং মাঠে নেমে মাঠের উপর উঠবে। ঘোড়াকে প্রাণপণে মারছে ওরা।

গ্রীষ্মকালে শস্যশূন্য ক্ষেত, সমতল মাঠে মাটি কঠিন হয়ে আছে। নরসিংয়ের

গাড়ীর চাপে মাটির উপরের স্তরটা শুধু মুড় মুড় করে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। গাড়ী ছুটছে—অন্তত পনের মাইল বেগে ছুটছে। শড়কের চেয়ে মাঠ অনেক ভাল।

গতির প্রতিযোগিতার একটা কৌতুক লেগেছে প্যাসেঞ্জারদের মনে। সকলেই চেষ্টা করছে দেখতে—ডান দিকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ক্রমশ পিছনে পিছয়ে যাওয়া ঘোড়ার গাড়ীগুলোর দিকে। দাঁতে দাঁত ঘষে ওরা ঘোড়াগুলোকে ঠেঙাচ্ছে। নরসিংও দেখে একটু হেসে দৃষ্টি ফিরিয়ে সোজা গাড়ীর সামনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে—হবে একদিন ওদের সঙ্গে।

আজই না-হাওয়ার জন্য নিতাই একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সে বললে—আপনি ভয় পেয়ে গেলেন নইলে আজই হয়ে যেত একটা হেস্তনেস্ত।

ভয়? নরসিং রুক্ষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রূঢ়স্বরে বললে—ভয়?

নইলে—আজই তো—

হ্যাঁ—হ্যাঁ। কিন্তু প্যাসেঞ্জারদের কথা আমাকে আগে ভাবতে হবে। ওঁদের আপিস আছে, আদালত আছে, ইস্কুল আছে। ওদের টাইম মাফিক পৌঁছে দিতে হবে আমাকে। তা ছাড়া মারামারি হলে—ওঁদের কারও কিছু হলে তখন কি হবে?

ঠিক কথা।

হাজার হলেও তুই হলি হোঁৎকা। বুঝলি? ঝগড়া ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ানদের সঙ্গে আমাদের। ওঁদের কিছু নয়। সে ঝগড়া মারামারি করব আমরা। একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে—হবে সে ঝগড়া, আলবৎ হবে, দেখবি সেদিন।

লজ্জিত নিতাই পিছনের দিকে তাকিয়ে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানদের দেখছিল, আর চেঁচিয়ে ডাকছিল—আও—আও—জলদি আও। নিজের খুসীকে সে ঠিক যেন ব্যক্ত করতে পারছিল না। তাই হিন্দী বন্ধ করে—তার মাতৃভাষায় প্রাণপণে চীৎকার করে ডাকলে—আয় রে—শালারা—আয়।

তারপর সে দেখাতে আরম্ভ করলে বুড়ো আঙুল। তারপর সে আবার চীৎকার করে উঠল—পাঁচমতী শ্যামনগর, শ্যামনগর পাঁচমতী মোটর সার্বিস।

অকস্মাৎ সে চীৎকার করে উঠল, গেল রে—মল রে—গেল রে। আ—শালা!

নরসিং সন্ত্রস্ত সতর্ক হয়ে উঠল, গাড়ীর ব্রেক কষতে আরম্ভ করলে। প্যাসেঞ্জারেরা কেঁপে উঠল। বুক তাদের ঢিপ-ঢিপ করছে।

ছোট্ শালারা, ছোট্। রাস্তা বন্ধ ক'রে ছুটবে। শা—লা!

কোন বিপদ তাদের সামনে আসে নাই। বিপদ ঘটেছে ঘোড়ার গাড়ী-গুলোর। পাশাপাশি গাড়ীগুলো ছুটছিল প্রাণপণ গতিতে। হঠাৎ দুটো গাড়ীর চাকায় চাকা বেধে গিয়ে বিপদ ঘটেছে। একখানার চাকা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়ে আর একখানার গায়ে হেলে প'ড়ে কোন রকমে মারাত্মক বিপদ থেকে বেঁচেছে।

নরসিং একবার তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তারপর সে অধিকতর সতর্ক দৃষ্টি নিজের গাড়ীর সামনে নিবদ্ধ করে ষ্টিয়ারিং ঘোরাতে আরম্ভ করলে। এইবার মাঠ ছেড়ে আবার সে শড়কে উঠবে।

শড়কে উঠে সে প্যাসেঞ্জারদের দিকে তাকিয়ে বললে—পন্থর মন্দ, বুঝলেন কিনা, এ যে করতে যাবে, বিপদ তারই হবে। আপন ধর্ম্মে যে থাকবে, ভগবান তাকে রক্ষা করবেনই।

রাস্তার উপর উঠল গাড়ী। খোলা রাস্তা। সামনে আর ঘোড়ার গাড়ী নাই। নিতাই বললে, লেন—লাইন কিলিয়ার।

মাইল দেড়েক অতিক্রম করেই শ্যামনগরের তিন মাইল ভাল রাস্তা। নরসিং গাড়ীতে স্পীড দেবার আগে মাঠের দিকে তাকিয়ে আর একবার দেখে নিলে। গ্রীষ্মের ধূলিসমাচ্ছন্ন কাঁচা শড়ক, ধুলোর রাশি উড়িয়ে চলল গাড়ী। পাঁচমতী-শ্যামনগর মোটর সার্ভিস।

* * *

আজ কিন্তু পঞ্চাশ মিনিট লাগে নাই। লেগেছে সাতচল্লিশ মিনিট। তিন

মিনিট আগে এসে পৌঁছে গিয়েছে। প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিয়ে গাড়ী চলল—হাই ইস্কুল—পোস্টাপিস হয়ে মোড় ফিরে কোর্টের সামনে দিয়ে একসাইজ আপিসের সামনে আবার মোড় ফিরে বাজারের মধ্যে মোটর পার্টসের দোকানের কাছে।

পাঁচমতীর প্যাসেঞ্জারেরা আজকাল ওই দোকানের সামনেই অপেক্ষা করে। সকালের দিকে প্যাসেঞ্জার খুব বেশী হয় না। রাত্রে যারা গঙ্গার ঘাট ইষ্টিশানে ট্রেনে নেমে ওদিকের মোটর সার্বিসে শ্যামনগর আসে তারা এক দফা যায় প্রথম টি্রপে। তারপর দুটো টি্রপ—একটা আটটায়, শেষটা সাড়ে দশটায়। এ দুটো টি্রপে লোকজন বেশী হয় না। কোন টি্রপে তিন, কোনটায় চার। বিকেল বেলা থেকে পাঁচমতী যাবার লোক বেশী। সকালে যারা এল তারাই ফেরে। সাড়ে তিনটে থেকে টি্রপ সুরু; সাড়ে তিনটেয় ছেড়ে চারটে পাঁচ বা দশ মিনিটে পাঁচমতী; সাড়ে চারটেয় পাঁচমতীর তিন চারজন নিয়ে শ্যামনগর পাঁচটায়। এবার পাঁচটা পনের মিনিটে বোঝাই গাড়ী নিয়ে পাঁচমতী। সকালের সেকেণ্ড টি্রপে যে কেরাণীবাবুরা আসে—তারাই ফিরবে। একেবারে হাঁ-হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। চেপেই বলে—চল—চল। কিন্তু তবু সকালের সেকেণ্ড টি্রপের মত ভিড় হয় না। মাডগার্ডে কেউ বসে না। ভেতরেই বসে আট জন। সকালে যাদের কোন রকমে দেরী হয়ে যায় অথচ আপিসে ঠিক সময়ে পৌঁছুতেই হবে, তারাই দায়ে প'ড়ে মাডগার্ডে বসে। বিকেলে আপিসের তাড়া নাই; আপিসের সায়েব নাই বাড়ীতে; কাজেই তারা ঘোড়ার গাড়ীতে এক আনা পয়সা বাঁচিয়ে একটু আরাম না হোক আমিরী করে বাড়ী ফেরে।

গাড়ীখানা এসে দাঁড়াল মোটর পার্টসের দোকানের সামনে। নিতাই রেডিয়েটারের ঢাকনীটা খুলে দিলে। এক ঝলক টগবগে ফুটন্ত জল উছলে পড়ল, ধোঁয়া বার হচ্ছে। ভিতর থেকে মগ বার ক'রে ঠাণ্ডা জল ভরে দিলে। গরমের দিন, ইঞ্জিন তেতে উঠেছে, একটু হাওয়া লাগার প্রয়োজন।

রামেশ্বর আর তারক বসে আছে তেল-কালী মেখে। সেলাম করে রামেশ্বর বললে—কি সিংজী কেমন ?

হাসলে নরসিং, সেও সেলাম করে বললে—ভাল। আপনি ভাল ? এলেন কখন ?

রামেশ্বর এবং তারককে বদলী করেছে মোটর সার্ভিসের মালিক। তাদের সদর শহরে নিয়ে গিয়েছে, সেখানকার মেরামতী কারবারে কাজ দিয়েছে। এখানকার পাদরী সাহেব চিঠি লিখেছিল। সেই মেরী নীলিমার ব্যাপার। কোম্পানী ওদের বদলী তো করেইছে উপরন্তু শাসিয়েও দিয়েছে।

মেরী নীলিমা আশ্চর্য্য মেয়ে! চোখ রাস্তার উপর রেখে সেই যে বাড়ী থেকে বার হয়—ইস্কুলে পৌঁছুবার আগে চোখ তোলে না।

সাড়ে দশটা বাজে। এখন এখানে মর্নিং ইস্কুল চলেছে। এইবার সে ফিরবে। পাঁচমতী ট্রিপ নিয়ে যাবার পথে রোজ দেখা হয় তার সঙ্গে। এই ট্রিপে যাবার সময় নরসিং ইচ্ছা করেই একটা রাস্তা ঘুরে যায়। ব্যাপারটা নিতাই বুঝেছে। সে হেসে বলে—সিংজীর এই 'টিরিপে' 'দিগভ্রম' হয়।

নরসিং কিছু জবাব দেয় না। গোপনে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। নীলিমা দাস বড় ভাল মেয়ে। তাকে তার ভাল লাগে। তার বেশী কিছু নয়। জোসেফ মোটর ড্রাইভার কিন্তু নীলিমা পাশ করেছে ইস্কুলে মাস্টারী করে। নসীবের খেয়াল। গিরবরজার সিংহরায় বাড়ীর ছেলে সে, আর গিরবরজার হাড়ি, যাদের—। যাক, দুনিয়ার হাল-চাল! আপশোষ করে লাভ নাই। নসীবের খেয়ালে আজ সে মোটর ড্রাইভার। তার ওই ফট্‌কীই ভাল।

ফট্‌কীও আজ ক'দিন আসে নাই। শাহজী শুখনরাম কিছু আঁচ পেয়েছে বোধ হয়। কাঠেঘেরা বারান্দায় যে জানালাগুলো ছিল তাতে আজকাল সন্ধ্যার সময়েই মজবুত তালা চাবী বন্ধ হচ্ছে। শাহু একদিন বলেছিল হাসতে হাসতে—আওরংকে কভি বিশোয়াস করবেন নাই সিংজী।

আরও খবর পেয়েছে, একদিন নাকি ফট্‌কীকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করেছে।

অন্যমনস্ক ভাবে নরসিং একটু সরে এসে নির্জ্জনে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। এখান থেকে নীলিমা দাসের আসবার পথটা দেখা যায়।

হর্ন দিচ্ছে নিতাই। নিজের পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে দেখলে নরসিং। পকেটে একটা মোটা ওয়াচ্‌ রাখে সে। মেজবাবু দিয়েছিলেন। সাড়ে দশটা বাজে। নরসিং সেখান থেকে এসে দাঁড়াল গাড়ীর পাশে। তিনজন প্যাসেঞ্জার এ ট্রিপে গাড়ীতে চেপে বসল। নিতাই হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে স্টার্ট দিলে।

পাঁচমতী! পাঁচমতী! পাঁচমতী! লাষ্ট টিরিপ, লাষ্ট টিরিপ!

গাড়ী চলল। ঘুরল নরসিংয়ের দিগ্‌ভ্রমের রাস্তায়। কই, কোথায় আজ মেরী নীলিমা দাস? দূর থেকে ছাতা দেখা যাচ্ছে না তো?

পথে একটা গরুর গাড়ীর আড্ডা। এখান থেকে তিন মাইল দূরে এক জাগ্রত মা-কালীর স্থান। সেখানে যাত্রী যায় শনি মঙ্গলবার। একটা হাটও সেখানে আছে—আলু কলাইয়ের আড়ত আর গরুও বিক্রী হয়। গরুর গাড়ী এই পথে ভাড়া খাটে। শনি মঙ্গলবার মা-কালীর যাত্রী নিয়ে যায়। সোম শুক্রবারে হাট।

আজ এখানে ভূপা মাহাতো আর সখিরাম কাহার তাদের ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে এসে জুটেছে দেখা যাচ্ছে। গরুর গাড়ীওয়ালাদের সঙ্গে যাত্রী নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। এখানে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে না দাঁড়িয়ে নরসিং পারলে না। ভূপা আর সখিরাম এসেছে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের রুটি মারতে। চলবে—তা চলবে। যাত্রীরা ঘোড়ার গাড়ী পেলে গরুর গাড়ীতে যাবে কেন?

পাঁচমতী! পাঁচমতী! পাঁচমতী! লাষ্ট টিরিপ! গাড়ী শ্যামনগরের মিশন গার্ল স্কুলের সামনে দিয়ে ধুলো উড়িয়ে এসে পড়ল তে-মাথায়। গার্লস স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মেরী নীলিমা। শহর পার হয়ে মাঠের মধ্যে

এসে নরসিং বললে—রবিবার দিন মনে ক'রে রাখবি নিতাই, একখানা টামনা নিতে হবে সঙ্গে।

* * * *

রবিবার এ লাইনেও ট্রিপ কম। ইমামবাজারের মত এখানেও রবিবারে আরাম করে নরসিং নিতাই রাম। ঘাটরোড-শ্যামনগর সার্বিসের কোম্পানীর কারবারেও রবিবার দুটো ট্রিপ কম। জোসেফের কিন্তু রবিবার ছুটি নাই। এস-ডি-ও সাহেব টুরে বার হন শুক্র শনিবার থেকে রবিবার পর্য্যন্ত। টুরে না বার হলে যান ঘাটরোড—একবার সদর শহর ঘুরে আসেন। যে সপ্তাহে টুরে যান না সেই সপ্তাহের রবিবারটা তার ছুটি।

এ রবিবার নরসিং সকালবেলায় দিকে লাস্ট ট্রিপ মেরে নিতাইকে বললে—সাহজীকে বলে রেখেছি দুখানা টামনা নিয়ে যাব। চাইল দেবে।

টামনার প্রয়োজন সম্বন্ধে নিতাই কোন প্রশ্ন করলে না। সে কথা হয়ে গিয়েছে ওদের রাত্রির আলোচনার মধ্যে। শুকনো ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে নরসিং যে নতুন রাস্তাটা আবিষ্কার করেছে—ধান তোলার প্রয়োজনে গরুর গাড়ীর চাকার দাগ ধরে—সে রাস্তার জমির আলগুলো ছেঁটে সমান করে নেবে; কাজ খুব বেশী নয়, তিন জন ঘণ্টা কয়েক পরিশ্রম করলেই হয়ে যাবে। পঞ্চাশ মিনিট ক'মে এসে পঁয়তাল্লিশে নেমেছে এই কয়েক দিনের মধ্যে; কেটে ছেঁটে বেশ সমান করে নিলে চল্লিশ মিনিটে ট্রিপ এসে যাবে।

নিতাইয়ের সঙ্গে শুখনরামও বেরিয়ে এল। বললে—চলেন আমাকে ওকীলবাবুর মোকামে ছেড়ে দিয়ে যাবেন। দরকার আসে। নিজেই সে গাড়ীর দরজা খুলে ভিতরের সিটে বসে পড়ল ধপ ক'রে। গাড়ীটা দুলে উঠল তাঁর ভারী দেহের আকস্মিক পতনে। উপায় নাই। মহাজন। তার উপর তারই বাড়ীতে রয়েছে। এ বেগারটুকু দিতেই হবে। সাহুজী সিগারেট বার করে বললে—খান।

হঠাৎ বললে—ওই কেরেস্তানটার বাড়ীমে আপনি যান সিংজী ?

নরসিং বিরক্ত হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে সাহুজীর দিকে চেয়ে আবার তখনি সামনে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

সাহু বললে—আরে রাম-রাম। কেরেস্তান উলোক। না—যাবেন না আউর। 'আরে ছি! এর পর সে অনর্গল অশ্লীল কথা প্রয়োগ ক'রে যায় জোসেফ এবং মেরী নীলিমা সম্পর্কে। নরসিংকে উপদেশ দেয়—ওই কেরেস্তান মেয়েটির মোহে যেন কদাচ না পড়ে।

নরসিং চুপ ক'রে গাড়ী চালিয়ে যায়, কোন উত্তর দেয় না। বিশেষ করে আজ এই রবিবার দিন—সাহুর কথাগুলো তার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিজনক হয়ে উঠছে। রবিবার বিকেল বেলা জোসেফের বাড়ীতে চমৎকার একটি চায়ের আসর বসে। রবিবার দিন জোসেফদের সাজ পোষাকের ঘটাটা একটু বেশী। খাওয়ার-দাওয়ার আয়োজনেও বেশ একটি পারিপাট্য থাকে। রীতিমত মাখন দিয়ে টোষ্ট, বাড়ীর তৈরী কেক, ডিম, তার সঙ্গে চা। বিকেলের আসরে জোসেফও প্রায় সাহেবের টুর সেরে ফিরে আসে; দু এক রবিবার থাকে না। কিন্তু সে না থাকলেও ক্ষতি হয় না। নরসিং বেশ স্বচ্ছন্দেই যায়। মেরী নীলিমার সাহচর্য্য তার ভাল লাগে। সে মনে মনে ধন্যবাদ দেয় ভগবানকে যে ভাগ্যিস জোসেফ মোটর ড্রাইভার হয়েছে নইলে নীলিমার মত মেয়ের সঙ্গে ত তার কথা বলার সুযোগই জুটত না! আরও ভাবে—দুনিয়ার মালিকের মজার খেয়ালের কথা। জোসেফের ঠাকুর্দ্দার বাপ ছিল গিরবরজার হাড়ি। ছত্রিদের বাড়ীর সবচেয়ে ছোট কাজ করত। কেন ক্রশ্চান হয়েছিল সে কথাও খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছে নরসিং।

তেরো

জোসেফ থেকে তিন পুরুষ আগে তার ঠাকুর্দ্দার বাপ অর্থাৎ প্রপিতামহ কৃশ্চান হয়েছিল। কৃশ্চান হয়েছিল আত্মরক্ষার জন্য। গিরবরজার সিংহদের উচ্ছিষ্ট একটি গোপকন্যা রোগজীর্ণ হয়ে অকাল-বার্দ্ধক্যে কুৎসিত হয়ে পড়ায় রক্ষক সিংহটি তাকে ত্যাগ ক'রে পথে বার ক'রে দিয়েছিল। একটা প্রবাদ আছে যে, পশুরাজ সিংহ কখনও রোগা জানোয়ার খায় না। গিরবরজার সিংহরা সে প্রবাদ মেনে চলত। শুধু গিরবরজার সিংহরাই নয়, যৌবন-বিলাসী পশুরাজ মাত্রেরই এই এক স্বভাব। এ পশুরাজেরা শুধু গুজরাট বা আফ্রিকায় বাস করে না, এ নরসিংহেরা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বাস করেন। থাক্ সে কথা। ওই রোগজীর্ণ অকালবৃদ্ধা গোপকন্যাটিকে সিংহমশাই পরিত্যাগ করার পর তাকে আশ্রয় দিয়েছিল জোসেফের প্রপিতামহ। সে ছিল ওই সিংহমশায়টিরই অনুচর; পুরাকালের গল্পের সিংহ ব্যাঘ্রের অনুচর শৃগাল বললে ঠিক হবে না, তবে সেনাপতি বন্যবরাহ বললে ভুল হবে না। সেও ছিল শক্তিশালী লাঠিয়াল। সুস্থ যৌবনধন্যা ওই মেয়েটির প্রতি তার একটু আকর্ষণ ছিল, প্রভুর ভয়ে দমিত আকর্ষণ; সেই আকর্ষণেই কঙ্কালসার মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়ে তার অতৃপ্ত মালিকানা স্বত্বের কামনা পরিপূর্ণ করতে চেয়েছিল। নিছক মালিকানা স্বত্ব ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ উর্ব্বর জমিতে বালি প'ড়ে মরুভূমি হয়ে গেলে যে অবস্থা হয়—মেয়েটিরও তখন ঠিক সেই অবস্থা। সিংহ তাতে তখন আপত্তিও করে নাই। ছেঁড়া জুতো পথে ফেলে দিলে যদি কেউ কুড়িয়ে নেয়—তাতে আপত্তি কেউ করে না, কিন্তু জোসেফের প্রপিতামহের অধ্যবসায় ছিল অপরিসীম। সে মেয়েটার সেবা আরম্ভ করলে। সেবা আর অন্য কিছু নয়—তাকে দিলে সে পরিপূর্ণ বিশ্রাম আর আহার। আহার তাও আঙ্গুর বেদানা ডালিম এসব নয়—সে তাকে খেতে দিলে তারা যা খায়, পাঁকাল মাছ, শামুক, গুগলি, ডাল, ভাত আর বাড়ির গরুর খাঁটি দুধ। মাস কয়েকের মধ্যেই

মেয়েটার মাথার চুল উঠে গেল, গাল দুটো হয়ে উঠল কাঁচা টমেটোর মত। ক্রমে মাথায় চুল গজাল, কাঁচা টমেটোর মত গাল দুটোয় যেন পাক ধরলো। কপালের কালচে ভাবটা কেটে গেল, ফুটে উঠল তার সাবেকের রঙ। মেয়েটাকে নিয়ে জোসেফের প্রপিতামহ প্রায় পাগল হয়ে উঠল। মেয়েটাও, কৃতজ্ঞতাই হোক আর প্রেমই হোক, একটা কিছুর বশবর্ত্তী হয়ে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করলে রক্ষাকর্ত্তার কাছে। জাতি বিচার করলে না, রূপ বিচার করলে না, অবস্থা বিচার, কি অন্য কোন বিচারই করলে না। মেয়েটার নব কলেবরের কথা গিয়ে পুরাতন সিংহ মালিকের কানে পৌছল। সিংহজাতীয় পুরুষেরা চায় যৌবন, রূপ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য কি ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার করে না, দুষ্কুলোদ্ভবা স্ত্রীরত্ন স্পর্শ করতে কোন দ্বিধা তাদের নাই—পূর্ব্ব মালিকও সিংহ—সেও এ বিচার করলে না। একেবারে সরাসরি গিয়ে সিংহ মহাশয় জোসেফের প্রপিতামহের বাড়ির দরজায় কেশর ফুলিয়ে দাঁত বার করে থাবা গেড়ে বসল। জাতিগৌরবে বঞ্চিত জোসেফের প্রপিতামহ সাহসের অভাবে সিংহপদবাচ্য ছিল না বটে, কিন্তু গোঁ এবং শক্তিতে সে কম ছিল না—এদিক দিয়ে বিচার করলে অনায়াসেই তাকে ভীম-বরাহ বা মহিষাসুর বলা যেতে পারত। দ্বন্দ্ব যুদ্ধও বাধত, কিন্তু এই মেয়েটি তাকে সুবুদ্ধি দিলে। রাত্রির শেষ প্রহরে দু'জনে উঠে গ্রাম ত্যাগ করলে। আশ্রয়স্থল আবিষ্কার করেছিল অবশ্য জোসেফের প্রপিতামহ নিজেই। পাদরীরা তখন এ অঞ্চলে ধর্ম্মপ্রচার করতে উঠে-পড়ে লেগেছিল। তুলসী-মাহাত্ম্যের কদর্য্য ব্যাখ্যা ক'রে—উলঙ্গিনী কালীমূর্ত্তির বর্ব্বরতা ও অসভ্যতা লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কালা-আদমীকে গোরা বানাচ্ছিল। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সমাজে ও রাষ্ট্রে অবহেলিত নিপীড়িতেরাই মজ্জমানের তৃণ থেকে তৃণান্তর আশ্রয় গ্রহণের মত ধর্ম্ম থেকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রে থাকে; জোসেফের প্রপিতামহও সটান এসে উঠল শ্যামনগরে পাদরীদের আশ্রয়ে। মুসলমান হওয়ার কথাও ভেবেছিল, সে তখন মরিয়া, ওই মেয়েটিই তখন তার সব; কিন্তু তার বিবেচনায় মুসলমান হওয়া ভাল মনে হয় নাই। মুসলমানেরা

ঠিক ওই পাদরী সাহেবের মত ঐশ্বর্য্য বা জোরালো আশ্রয় দিতে পারে না—আরও একটা কথা মনে হয়েছিল—সেটা আশঙ্কার কথা—সিংহদের মত খাঁদের মধ্যেও নারী-শিকার নিয়ে মারামারি বেশী; ওদের মধ্যেও শের মর্দ্দানার প্রাদুর্ভাব অনেক। আরও ছিল। জোসেফের প্রপিতামহ জানত যে মুসলমান হলেও মীরজা, মল্লিক, খাঁ ওরা তার সঙ্গে চলবে না, ভাল কুলের সেখেরাও তার সঙ্গে চলবে না, তাকে চলতে হবে এই সব ঘরানা ঘরের বাড়িতে যারা চাকর, খেটে খায়, যাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা ভোরবেলা গ্রাম গ্রামান্তরে কাঠ ভেঙে আনে, পাঁকাল মাছ ধরে—তাদের সঙ্গে। কেরেস্তান ধর্ম্মে এ সব নাই বলেই তার ধারণা ছিল। তাই সে মেয়েটিকে নিয়ে সটান এসে উঠল শ্যামনগরে; পাদরীদের গীর্জ্জার সিঁড়ির পাশে আস্তানা গাড়লে। শ্যামনগরে তখন একজন ব্রাহ্মণ, দুজন কায়স্থ এবং ঘর দুয়েক মুচি—এই নিয়ে সবে খ্রীশ্চান-পল্লীর পত্তন হয়েছে। ব্রাহ্মণ যুবকটি তখন দাড়ী রেখেছে এবং সে দাড়ী বেশ বড়ও হয়েছে। পাদরীদের মত আলখাল্লা প'রে বুকে লোহার 'করস' ঝুলিয়ে সে বেড়ায়। কায়স্থেরা চাকরী করে। একজন সকলকে লেখাপড়া শেখায়। অন্যজন সাহেবদের হিসাবনিকাশ করে।

ব্রাহ্মণ ছেলেটি বিয়ে ক'রে নিয়ে এল মুরশিদাবাদ থেকে, চমৎকার মেয়েটি—বৈদ্য কেরেস্তানের মেয়ে; কায়স্থেরাও বিয়ে করলে; একজন কায়স্থ বিয়ে করলে কলকাতায়, বিয়ে ক'রে সেইখানেই সে থেকে গেল। অন্যজন বাধ্য হয়ে বিয়ে করলে ওই মুচি কেরেস্তানদের একটি মেয়েকে। বাধ্য হয়ে বিয়ে করলে, তার কারণ মেয়েটি তখন সন্তানসম্ভবা।

*　　*　　*　　*

তার পর তিন পুরুষ ধ'রে অর্থাৎ জোসেফ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন অনেক হয়েছে। ব্রাহ্মণ কৃশ্চানের বংশের একটি শাখা এখনও এখানে আছে। বাকী তিনটি শাখা এখান থেকে চলে গিয়েছে। একটি শাখা কলকাতায়, এক শাখা মাদ্রাজ অঞ্চলে, অন্যটির খোঁজ কেউ জানে না; কায়স্থের যে ছেলেটি বিয়ে ক'রে

কলকাতাতেই থেকে গিয়েছিল তাদের বংশের ছেলেদের কয়েকজন পুলিশ সার্জ্জেন্ট হয়েছে। ব্রাহ্মণ ছেলেটির যে শাখাটি এখানে আছে তাদের বাড়ির কর্ত্তা এখানকার পাদরী রেভারেণ্ড ব্যানার্জ্জী। ব্যানার্জ্জীর দুই ছেলে, এক ছেলে এম-এ পাশ ক'রে ডেপুটিগিরি পেয়েছে। অন্যটি বি-এ পাশ করে বসে আছে। বসে আছে তার কারণ ছেলেটি কানা এবং খোঁড়া দুইই। ছেলেবেলায় পায়ে অপারেশন হয়ে একটা পায়ের গোড়ালী গিয়েছে অকেজো হয়ে, তারপর এই কয়েক বৎসর আগে স্মলপক্স্ হয়ে একটা চোখ গিয়েছে। ছেলেটির সম্ভবত বিয়ে হবে না। কে দেবে ওকে মেয়ে? যে সমাজে ওদের করণ-কারণ সে সমাজে কেউ বিয়ে করবে না ওকে। ওদের বাড়ির ছেলে-মেয়ের বিয়ে আজও এখানে হয় নাই। ছেলে-মেয়েরা কলেজে পড়তে যায়—কলকাতাতে, সেখানে ওদের জানাশুনা বনেদী ঘর আছে, বেশ একটি গোষ্ঠীর গণ্ডীতে ঘেরা সমাজও আছে। তারই মধ্যে চলাফেরা করতে করতে ছেলে মেয়ের আলাপ পরিচয় হয়। সে পরিচয় ঘন হয়ে প্রেমে দাঁড়ায়—বিয়ে হয়। ক্রমে অবশ্য গণ্ডীর পরিধি বাড়ছে। মধ্যে মধ্যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যাদের বলে, তাদের সঙ্গেও দু-একটা করণ হচ্ছে। একজন বিলেতে গিয়েছিল, সেখান থেকে সে খাঁটি ইংরেজ মেয়ে বিয়ে ক'রে এনেছে।

বাকী ঘর কয়েকটির কয়েকটি শাখাও এখান থেকে চলে গিয়েছে; যারাই লেখাপড়া একটু ভাল শিখে ভাল উপার্জ্জন করছে, তারাই চলে গিয়েছে কে কোথায় ঠিক সন্ধান জানা নাই। বেশ নাম-করা বড় কেউ হয় নাই, তাই কেউ সন্ধানও রাখে নাই। বাকী কয়েক ঘর এখানে পড়ে রয়েছে, মিশনের কাজকর্ম্ম আঁকড়েই আছে। দু-চারজন ছোটখাটো ব্যবসা বাণিজ্য করে; কয়েকজন বেকার—সামান্য লেখাপড়ায় পাঠ্য জীবন শেষ ক'রে মদ খেয়ে গুণ্ডামী করে কাল কাটাচ্ছে; প্রথম জীবনে জোসেফও ছিল তাদের মধ্যে একজন; পরে সে নিজেকে সংশোধন ক'রে মোটর-ড্রাইভিং শিখে ড্রাইভারী করছে। মেয়েরা অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখে এখানকার ছেলেদের কাউকে বিয়ে

ক'রে ঘর-সংসার করে। সকলেই অবশ্য চায় এদের মধ্যে যে ছেলেটি ভাল তাকেই ভালবাসতে, কিন্তু ভাল ছেলেরা এখানকার মেয়েদের দিকে তাকায় না, তারা অবসর খোঁজে বাইরে যাবার, সেখানে গিয়ে তার মনোমত জীবনসঙ্গিনী খুঁজে নিতে চায়।

যে কায়স্থ ছেলেটি বাধ্য হয়ে মুচির মেয়েটিকে বিয়ে করেছিল তাঁদের উপাধি ঘোষ; ঘোষ-বাড়ির একটি ছেলে ম্যাট্রিক পাস ক'রে রেলে গার্ড হয়েছে, তার দিকেই এখন সব বাড়ির গৃহিণীদের নজর, অবিবাহিতা মেয়েগুলিও মনে মনে তাকেই কামনা করে; নীড় বাঁধার স্বপ্ন দেখে—লাল পেন্টিং করা রেলের বাংলো, সামনে এক টুকরো বাগান, দুয়ারে জানালায় রঙীন ছিটের পরদা, বারান্দায় কিছু আসবাব, একজন খানসামা ইত্যাদি। আরও দুটি ছেলে এখানে কোর্টে কেরানীর কাজ করে। তাদেরও তারা অবহেলা করে না কিন্তু ধরা দিয়ে বাঁধা পড়তেও চায় না। জোসেফের বোন মেরী নীলিমা কিন্তু স্বতন্ত্র ধরনের মেয়ে। কালো মেয়েটির মনে যে কি স্বপ্ন তা সে-ই জানে। সে এদিক দিয়ে একেবারে হিম-শীতল নিস্পন্দ অর্থাৎ মৃত বললেই হয়। সে ওই গার্ড সাহেবের বাড়িও কোন দিন যায় না। সে বাড়ি এলেও আয় না। এখানকার মেয়েদের মধ্যে সেই কেবল ম্যাট্রিক পাস। তাও থার্ড ডিভিশনে পাস করেছে। রেভারেণ্ড ব্যানার্জ্জীর চেষ্টায় এখানকার এম-ই গার্লস স্কুলে সব চেয়ে ছোট শিক্ষয়িত্রীর চাকরী পেয়েছে। ম্যাট্রিক পাসও করেছে সে, ওই রেভারেণ্ড ব্যানার্জ্জীর কৃপায়। তিনি তাঁর ওই কানা খোঁড়া ছেলেটিকে বলে দিয়েছিলেন নীলিমার পড়াশুনা একটু দেখে দিতে। নীলিমার অসীম ধৈর্য্য তাই ওই বসন্তের দাগে ক্ষতবিক্ষত একচক্ষু লোকটার কাছে মাসের পর মাস বসে থেকে পড়া বলে নিয়েছে। এখনও দিনে একবার যায় তার কাছে, ইচ্ছে—প্রাইভেটে আই-এ দেবে। কেরানী ছেলে দুটি অত্যন্ত ব্যগ্র তার মনোরঞ্জনের জন্য। নীলিমার মত স্ত্রী তাদের কাছে আদর্শ স্ত্রী। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের পরিশ্রমের উপার্জ্জনে বেশ একটি স্বচ্ছল সুখের সংসারের

স্বপ্ন দেখে তারা। কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে নীলিমার এ দিক দিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা যায় না। অথচ এখানে সহর জুড়ে নীলিমাকে নিয়ে নানা অবাঞ্ছনীয় আলোচনা এবং আলোড়ন চলছে।

এখানকার হিন্দু এবং মুসলমান তরুণ সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ অংশ সতৃষ্ণ নয়নে নীলিমার দিকে চেয়ে থাকে। কৃশ্চান-সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত—এই বিধানকে তারা স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগের বিধান মনে করে এবং কৃশ্চান মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলা-ফেরার কুৎসিত ব্যাখ্যা করে, প্রলোভন দেখায়, বিরক্ত করে। কখনও কখনও দু-একটা নিন্দনীয় কাণ্ডও ঘটে যায়। দু-চারটি মেয়ে এদের নিয়ে খেলাও করে। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশের দৃষ্টি এখন পড়েছে গিয়ে এই কালো মেয়েটির উপর। সকল কুরূপক্ষে উপেক্ষা ক'রে তার প্রতি আকর্ষণের কারণ—সে লেখাপড়া শিখেছে। বাংলাদেশে আজও পর্য্যন্ত শিক্ষিতা মেয়েদের জীবন-দর্শনের যে বিকৃত ব্যাখ্যা সর্ব্বত্র প্রচলিত, এখানে সে ব্যাখ্যা হয়তো একটু জোরালো। শুধু হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা অংশই নয়, ওদের নিজেদের সমাজের বেকার ছেলেগুলিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। তারাও শিস কাটে, ইঙ্গিতে রসিকতা করে। তাকে রাস্তায় একা দেখলে মুসলমান ছোকরারা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চিৎকার ক'রে বলে 'জানি'। হিন্দুর ছেলেরা গান ধরে; তাদের মধ্যে কবি-কবি ভাবটা একটু বেশী। কৃশ্চান বেকার পাশ দিয়ে যাবার সময় মৃদুস্বরে বলে, ডার্লিং। দু-চার জন তরুণ উকীল মোক্তারও নীলিমাকে ইঙ্গিতে নিজেদের প্রেমনিবেদন করে। এরাই সবচেয়ে কুৎসিত এবং অশ্লীল।

নীলিমা কিন্তু নিস্পন্দ হিমশীতল এদিকে।

নীলিমার মা এর জন্য বিরক্ত। মেয়ের বয়স হয়েছে; মা আর ইঙ্গিতে কথা বলে না, সোজা খুলেই বলে, তোর মতলবটা কি? রেভারেণ্ডদের বাড়ির কানা ছেলেটাকে বিয়ে করবি নাকি? তা হ'লে কিন্তু আমি গলায় দড়ি দোবো।

নীলিমা বলে—কেন সে নিরীহ লোককে নিয়ে পড়লে বল তো?

মা বলে—তবে? তবে ব্যারিষ্টার-ম্যাজিষ্ট্রেট কে তোকে বিয়ে করতে আসবে?

নীলিমা লেখাপড়া শিখে কথাবার্ত্তাগুলো একটু বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বলে, শুধু বাঁকাই নয় অত্যন্ত ধারালোও বটে। মায়ের কথায় সে একটুও বিচলিত হয় না, যদিই বা হয় তা অন্ততঃ বাইরে থেকে বুঝা যায় না। সে নির্ব্বিকারের মতই হাতের কাজ ক'রে যায়, সেলাইয়ের কাজ করতে থাকলে সেলাই থেকে চোখ না তুলেই সে বলে—মস্ত বড় আয়নাখানা দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছ, আমিও আমার ব্যাগে আয়না রেখেছি একখানা,—কানাও নই, চোখের কোনো ডিফেক্টও নাই। আর তোমাকে দিব্যি গেলে বলতে পারি, সারাদিন খেটেখুটে রাত্রে কোনদিন স্বপ্ন দেখবার মত ঘুম পাতলা হয় না, সুতরাং—। বাকীটা আর সে বললে না, মুখ তুলে মায়ের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল।

এই ধরনের জবাব বুঝতে মায়ের কষ্ট হয় না বটে, কিন্তু এই ধরনের জবাব দিতে পারে না বলে মায়ের রাগ বেড়ে যায়। সে বলে—কিন্তু বিয়ে তো করতে হবে, না কি? এর পর বয়স গেলে ওই পোড়া কাঠের দিকে কেউ ফিরে চাইবে আরে? পাস করার গুমোর, বিশ টাকা মাইনের গুমোর তখন বুকে যে পাথর হয়ে বসবে!

নীলিমা তবুও হাসে।

হাসছিস যে? তখন করবি কি?

কি আর করব! জর্দ্দন নদী অনেক দূর, কিন্তু গঙ্গা কাছে। গঙ্গাকেই জর্দ্দন ভেবে নিয়ে রোজ গঙ্গাস্নান করব আর মথি-লিখিত সুসমাচার পড়ব; বাইবেলও পড়ব।

মা এবার দৃঢ়ভাবে বললে—কিন্তু ওই সিংয়ের গাড়ীতে চেপে যে রোজ ইস্কুলে যাচ্ছিস, লোকে যে দশ কথা কানাকানি করতে আরম্ভ করেছে!

রোজ?

সে তুই জানিস, আর যারা বলছে তারা জানে।

যাক। তুমি যখন জান না, তখন—

বাধা দিয়ে মা বললে—লোক যে বলছে।

লোকের কথায় যদি বিশ্বাস কর তবে আমার উত্তরে তো তুমি বিশ্বাস করবে না, সুতরাং কথা বলে তো কোনো লাভ নেই আমার।

মা বললে—লাভ না হোক, লোকসান তো হবে না।

হেসে নীলিমা বললে, হবে বইকি। কথা ক'টা বলার পরিশ্রমটাই লোকসান হবে।

মায়ের মুখ দেখে মনে হ'ল, মা এবার রাগে ফেটে পড়বে। তবে কি ভাবে ফেটে পড়বে তাই বোধ হয় ভাবছে মা। কেলেঙ্কারী ঝামেলা ভালবাসে না নীলিমা, তাই সেটা নিবারণের জন্য কিছু বলবার আগেই বললে, পাঁচ দিন গিয়েছি ওর মোটরে। তিন দিন দাদা সঙ্গে ছিল। দু'দিন অবশ্য একা গিয়েছি। তাতে যদি আমার দোষ হয়ে থাকে, তবে দাদার সঙ্গে লোকটি বাড়িতে এলে তাকে খাতির কর কেন?

আর খাতির করব না। স্পষ্ট বলে দোব। লোকে পাঁচ কথা বলছে।

নীলিমা হেসে বললে—লোকের কথা ছেড়ে দাও। লোকে চায় ওর মোটরে না গিয়ে তাদের সঙ্গে গায়ে গা দিয়ে ইস্কুলে যাই, তারা এস্কর্ট ক'রে নিয়ে যায় আমাকে। দাদাও ড্রাইভার—ও-ও ড্রাইভার, দাদার বন্ধু, লোকটিকে বেশ লাগে আমার। আরও ভাল লাগে কি জান? গিরবরজার ছত্রি—যারা এককালে আমার ঠাকুরদার বাপকে জুতো মেরেছে, এঁটো খাইয়েছে—তাদের বাড়ির ছেলে এসে—। নীলিমা হাসে। হাসি থামিয়ে আবার বলে—দাদাও ওকে খুসী করতে চায়। কিছু যদি বলবার থাকে তো দাদাকে ব'লো।

জোসেফ নরসিংকে যে একটু খুশি করবার চেষ্টা করছে এটা সত্য। নরসিং শুধু ড্রাইভারই নয়, সে গাড়ীর ওনার অর্থাৎ মালিকও বটে; মাইনের চাকর নয় সে, সমস্তটা লাভেরই হকদার। সুতরাং সমস্ত ড্রাইভার-মহলেই সে হয় খাতিরের লোক, নয় তো ঈর্ষার পাত্র। রামেশ্বরপ্রসাদ, রসিদ—এরা তাকে

ঈর্ষা করে, তারা বলে ড্রাইভার-ওনার চামচিকে পক্ষী। জোসেফ কিন্তু ওকে খাতির করে। সে নিজে এমনি একখানি গাড়ীর মালিক হতে চায়। সব দিক দিয়ে নরসিং তার আদর্শ। নরসিংয়ের যেমন অতি অনুগত দু'টি লোক—নিতাই আর রাম আছে, তেমনি একটি লোক রাখবার কল্পনা তার। দু'জন লোকে খরচ বেশি, একজন লোক রাখবে সে। ধোয়া মোছা, টুকিটাকি মেরামত, চাকা পাংচার হলে ষ্টেপনী অর্থাৎ বাড়তি চাকাটা খুলে পরানো, জগ দিয়ে ঠেলে গাড়ীটাকে উঁচু ক'রে তোলা—এসব কাজে দুজন লোক হলে ভাল হয়, নিজেকে বেশি খাটতে হয় না, কিন্তু তেমনি তার খরচও আছে। সে নিজে বেশী খাটতে প্রস্তুত। এ ছাড়া নরসিং গিব্বরজার সিংহ-বাড়ির ছেলে—তারও পূর্ব্বপুরুষ একদা গিব্বরজার অধিবাসী ছিল—এই হিসাবেও খানিকটা তার ভাল লাগে। তার পূর্ব্বপুরুষ ছিল সিংহদের গোলাম—অস্পৃশ্য, সিংহদের কাছে হাত জোড় ক'রে থাকত; আর সে নরসিংয়ের বন্ধু, নরসিংয়ের সমান পদস্থ হয়ে ঘোরাফেরা করে এটাও তার বেশ লাগে। মেলামেশার মধ্যে এটা অবশ্য অহরহ মনে পড়ে না—কখনও কালে কস্মিনে প্রসঙ্গ উঠলে, হঠাৎ মনে হলে বিচিত্র ধরণের তৃপ্তি অনুভব করে সে। আরও একটা কারণ আছে। রামেশ্বর, রসিদ প্রভৃতি এখানকার ডাইভারদের সঙ্গে তার সদ্ভাব নাই। সে নিজে কৃশ্চান, লেখাপড়া ওদের চেয়ে বেশি জানে, সভ্যতা-ভব্যতার আইন-কানুনও বেশি জানে—নিজে সরকারী অফিসারের ড্রাইভার, সেই হেতু সে ওদের অসভ্য বর্ব্বর ভাবে এবং নিজেকে ওদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। রামেশ্বর, রসিদ এরাও ওকে ঘৃণার চোখে দেখে—কেরেস্তান শব্দটাকেই ওরা অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারণ করে। মেয়েদের স্বাধীনতা আছে, তারা লেখাপড়া শেখে, সেজেগুজে পথে বেড়ায়, এজন্য তাদের অশ্লীল কথা বলে; বিশেষ ক'রে জোসেফের সঙ্গে মনোমালিন্য হেতু এবং ম্যাট্রিক পাস ক'রে ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে ব'লে নীলিমার উপরেও তাদের আক্রোশটা বেশি। ওই সব নানা ধরনের সূত্র একসঙ্গে পাকিয়ে একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এই

জটিলতার মধ্যে জোসেফ নরসিংয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। প্রীতির আধিক্য হেতুই সে প্রীতিকে অকপটে প্রকাশ ক'রে নরসিংকে বুঝিয়ে দেবার অভিপ্রায়েই জোসেফ প্রতি রবিবারে নিজের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছে, তাদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী মায়ের সঙ্গে নীলিমার সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে নীলিমার প্রতি রসিদ রামেশ্বরের অভদ্র বর্ব্বর আচরণের প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত দেখাতেই সে বাইরেও নীলিমাকে সঙ্গে নিয়ে নরসিংয়ের সঙ্গে বেড়ায়, বাজারে দেখা হলে দাঁড়িয়ে আলাপ করে। নীলিমার ইস্কুলে যাওয়ার সময় নরসিংয়ের পাঁচমতী যাওয়ার পথে গাড়ী খালি থাকলে গাড়ীতে চড়ে বসে। বয়সের ভাল লাগায় নরসিংয়েরও এটা ভাল লাগে। না, তার চেয়েও অনেক বেশি ভাল লাগে। অনেক—অনেক বেশি। রূপ এবং যৌবনকে ভাল লাগা এক; এ ভাল লাগা আর এক ভাল লাগা। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মেয়ের মধ্যে শিক্ষিত কালো মেয়েকে সেই ভাল লাগার চোখে অশিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ের চেয়ে অনেক বেশি ভাল লাগে। ফট্‌কী তো তার উপর উচ্ছিষ্ট!

ড্রাইভার নরসিং জীবনে নীলিমার মত মেয়ের সাহচর্য্য কখনও কল্পনা করতেও পারে নাই। তার স্ত্রী জানকীর মৃত্যুর পর বিবাহের বাসনা তার মনে যখনই জেগে উঠত তখনই তার মনে পড়ত শহরে ইস্কুলে-যাওয়া কিশোরী মেয়েদের ছবি। তাদের সমাজে এ ধরনের মেয়ে নাই; যদিই দূরে দূরান্তরে কোথাও থাকে তবে তার মত ড্রাইভারকে সে মেয়ে সমর্পণ করবে কেন তার অভিভাবক? কখনও কখনও মদের নেশায় উত্তেজিত মস্তিষ্কে কল্পনা করত তার দ্রুতগামী এই মোটরে এমনি একটি মেয়েকে হাতে ধরে টেনে তুলে নিয়ে তিরিশ চল্লিশ মাইল স্পীডে পালিয়ে গেলে কি হয়? মনে পড়ে যেত তার গিরবরজার সিংহ-বংশের আদি পুরুষের কথা। আবার নেশা ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তার ওটা স্বপ্নের মত মনে হত।

শিক্ষিতা কালো কুরূপা নীলিমার সঙ্গে আলাপ, তাকে গাড়ীতে চড়িয়ে ইস্কুলে পৌছে দেওয়ার ভাগ্যটা তাই তার কাছে অকল্পিত সৌভাগ্য। সাধারণ

ড্রাইভার-জীবনে এটা ব্যতিক্রম। সে অবশ্য গল্প শুনেছে দু' দশজন বড়লোকের ঘরের মেয়ে-বউ ড্রাইভারের প্রেমে পড়েছে, জানাজানি কানাকানি হতেই ড্রাইভারের চাকরী গিয়েছে। দু' এক ক্ষেত্রে মেয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়েও গিয়েছে, কিন্তু সেও ব্যতিক্রম। এবং সে ব্যতিক্রমের সঙ্গেও এ ব্যতিক্রমের পার্থক্য আছে। জোসেফ নীলিমাকে নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে, সামনে গাড়ীতে চড়ে, পরিহাস করে, হাসে। সে সমস্তই প্রকাশ্য—সহজ, তার এতটুকু অংশও কোন শাসনে কোন বাধায় পীড়িত অথবা সঙ্কুচিত নয়। এ যে অকল্পিত সৌভাগ্য!

জানকীর কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—চরিত্রহীনা কসবী জাতীয় নারীর সঙ্গে ব্যাভিচার করবে না। কিন্তু অপরূপ রূপযৌবনসম্পন্না এই ফটকী মেয়েটার কাছে সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারত না, যদি না নীলিমা এসে তার গা ঘেঁষে না দাঁড়াত।

এ রবিবারটা কাটল পাঁচমতীতে সুরেশ দাসের ওখানে। খরচ অবশ্য নরসিংয়ের কিন্তু বন্দোবস্ত সব সুরেশের। দাসজীর বন্দোবস্ত পাকা। হাঁসের মাংস—খিচুড়ী—মদ—মাছভাজা থেকে আরম্ভ করে—একজন বাউলের দেহতত্ত্বের গান এবং নূপুর পায়ে নাচ পর্য্যন্ত। হেসে সে বললে—সব ঠিক ক'রে রেখেছি বন্ধু, নাচ-গান পর্য্যন্ত।

নরসিং হাসলে।

নিতাই বললে—আর যান মশাই। ডাবী নিয়ে আবার নাচ গান হয়?

দাস বললে—হুঁ-হুঁ। বিনা ডারী—লাল শাড়ীও হতে পারে—তবে সুরেশ দাসের এলাকায় নয়, সুরেশ দাস দেখিয়ে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে আসবে কিন্তু নিজে সেখানে থাকবে না।

নিতাইটা কেমন যেন গজগজ করছে ভেতরে-ভেতরে। খেটেছেও আজ খুব। মজুরের কাজ করেছে। ওকে খুসী করার প্রয়োজন আছে। নরসিং সুরেশকে বললে—ওর ব্যবস্থা একটা ক'রে যদি দিতে পারেন তো ভাল হয়।

সুরেশ বললে—আপনার ?

—না।

—বহুৎ আচ্ছা। খুব খুসী আমি এতে। আচ্ছা, ও বেটার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি। ওই ছোঁড়াটা ? রামটা ?

একটু চুপ করে থেকে নরসিং বললে—ওর কথা নিতাইকে জিজ্ঞাসা করুন।

নিতাই রাম দুজনেই গেল।

নরসিং সুরেশের সঙ্গে বসে সুখ দুঃখের কথা কইলে। সুরেশের দুঃখ নাই। সে বলে—যো হোগেয়া সো যানে দো। সে সব ভেবে মন খারাবি করো না। আনন্দ করো। ব্যস। বেশ কয়েক পাত্র পান ক'রে সুরেশ নরসিংয়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে বসল। ওই এক বাতিক সুরেশের। বিশেষ করে মদ খেলে তখন দুহাত পাঞ্জা লড়াই চাই। লোক না পেলে দুটো ম্যাড়া আছে, তাদের নিয়ে ঢুঁ খেলে। নরসিংয়ের কিন্তু সমস্ত কিছুর মধ্যে নীলিমাকে বার বার মনে পড়ল। বেশ কাটল রবিবারটা।

তবে উৎসাহ যেন বেড়ে গিয়েছে।

গিরবরজা থেকে পাঁচমতির পথে শড়ক ছেড়ে মাঠের বুকের পথ কেটে সমান করে নেওয়ার পর হিসেব মত সময় বাঁচার কথা তিন থেকে পাঁচ মিনিট। কিন্তু নরসিং আজকাল এত জোরে গাড়ী চালাচ্ছে যে সময় বাঁচছে আট মিনিট। পঞ্চাশ প্রথমে নেমেছিল পঁয়তাল্লিশে, কেটে নেওয়ার পর নামবার কথা চল্লিশে, কিন্তু সাঁইত্রিশের বেশী লাগছে না এখন। রামা নিতাইয়ের ধারণা—তাড়াতাড়ি ফেরার মূলে নরসিংয়ের আছে নীলিমাকে গাড়ী করে ইস্কুলে পৌছে দেওয়ার সময় করে নেওয়ার চেষ্টা।

রামা বলে—দাদাবাবু আজকাল উড়ে চলছে। শালা তুফান মেল !

নিতাই কিন্তু অসন্তুষ্ট, সে বলে—হ্যাঁ, যেদিন গোঁত্তা খেয়ে ঘাড় গুঁজে পড়বে সেই দিন হবে।

রামা একটু বিস্মিত হয় নিতাইয়ের মুখে এ ধরনের কথা শুনে। কি হ'ল

নিতাইয়ের? নরসিংও সেটা অনুভব করলে ক্রমে। কিছু একটা হয়েছে নিতাইয়ের। সে একদিন স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করলে—কি হল তোর বল্ দেখি?

নিতাই বললে—হবে আর কি বলেন? গাড়ী 'ডেরাইব' করা যে ভুলে গেলাম মশাই!

নরসিং স্বীকার করলে—তা বটে। নিতাইকে এখানে এসে অবধি ষ্টীয়ারিং ছেড়ে দেয় নাই। সে বললে—ঠিক হ্যায়, কাল থেকে একবেলা তোর, একবেলা আমার।

নিতাই খুসী হয়ে গেল।

নিতাই কিন্তু জবরদস্ত ড্রাইভার হবে। বেটার হাতটা একটু কড়া এই যা। বেটা যে রকম মোড় নেয় জোরে! নরসিং বার বার ওকে সাবধান করে—খবরদার, মানুষের জীবন তোর হাতে।

রামটাও মধ্যে মধ্যে ষ্টীয়ারিং ধরছে। নিতাইয়ের পাশে বসে ষ্টীয়ারিং ধরে।

রাম হঠাৎ একদিন নরসিংকে চুপিচুপি বললে—নেতাই শালার পোকা ঢুকেছে দাদাবাবু! রামেশ্বরোয়ার সঙ্গে পরামর্শ করছে—ড্রাইভিং লাইসেন্স নেবে। আমাদের কাজ ছেড়ে ড্রাইভারী চাকরী করবে।

নরসিং বিস্মিত হয় নাই। এ পথের এই ধারা। সে নিজেও জানে। সে যখন মেজবাবুর গাড়ীতে কণ্ডাক্টারের কাজ করতে করতে মোটর চালাতে শিখেছিল, তখন সে ড্রাইভিং শিখে লাইসেন্স নেবার জন্যেই শিখেছিল। রহমৎ ড্রাইভারের কাছে কাজ শিখে সে রহমতের জায়গাতেই ড্রাইভার হয়ে বসেছিল। নিতাইকে ড্রাইভিং সে যখন শিখিয়েছে, তখন সে মনে মনে ভেবেছিল—নিতাইকেও সে লাইসেন্স নেওয়াবে। এখানে এসেও সে-কথা সে ভেবেছে। সে নিয়ে কথাও হয়েছে। এ ছাড়াও তার মনে আরও অনেক কল্পনা আছে। সামনে বর্ষা এগিয়ে আসছে। একটু জোর বৃষ্টি নামলেই প্রথমে মাঠের পথ বন্ধ হবে, তারপর ক্রমে কাঁচা মাটির শড়কও বন্ধ হবে। সে মধ্যে মধ্যে ভাবে—এই শ্যামনগরে সে ছোটখাটো একটা মেরামতী কারখানা খুলবে; তার লাইসেন্সটা

পাঁচমতির রাস্তা ছাড়াও ওই শহরের ঘাট পর্য্যন্ত বাড়িয়ে নেবে। তাতে এখানকার মোটর কোম্পানীর সঙ্গে একদফা ঝগড়া বাধবে। নরসিংয়ের ক্ষমতা নাই মোটর কোম্পানীর সঙ্গে ঝগড়া করবে। সে ভাবছে শুখনরামকে যদি নামানো যায়। সাহুজীর টাকা আছে। এ কাজে লাভ আছে। সাহুজী যদি গাড়ী কেনে—একখানা বাস, একখানা মোটর; সবচেয়ে ভাল হয় যদি তার সঙ্গে একখানা ট্রাক কেনে। তাহলে জোর চলবে কোম্পানী। সে আর জোসেফ দু'জনে ভাগে কিনবে একখানা মোটর। একটাতে ড্রাইভার হবে নিতাই, একটাতে জোসেফ, অন্যটায় রামাকে বসালে চলে কিন্তু সে এখনও ছেলে মানুষ, রামকে সে নিজের গাড়ীতে রেখে তালিম দেবে, অন্যটায় বসিয়ে দেবে হাফিজকে। হোটেলে জুয়ার আসরে যে রামেশ্বরের অন্যায়ের প্রতিবাদ ক'রে বলেছিল—পরসাদ সাহেব এ অন্যায় আপনার। হাফিজ লোকটি ভাল।

আজ সকাল থেকে নিতাই ট্রিপে নাই। ছুটি নিয়েছে। বলেছে—আমার শরীর আজ ভাল নাই সিংজী। আমি আজ আর যেতে পারব না।

গায়ে হাত দিয়ে নরসিং দেখেছিল—গায়ে তাত তো নাই!

সর্ব্বাঙ্গ বেথা করছে, মাথা টিপটিপ করছে। আমি কি মিছে কথা বলছি মশায়?

অবিশ্বাস করে নাই নরসিং, অবিশ্বাসবশত পরীক্ষা করবার জন্যও গায়ে হাত দিয়ে দেখে নাই, মমতাবশতই দেখেছিল, তাই নিতাইয়ের মেজাজ খারাপ দেখে তার বিশ্বাস হ'ল বেশী। নিশ্চয়ই বেচারার শরীর খারাপ, নইলে মেজাজ খারাপ কেন হবে! সস্নেহে হেসে সে ছ' আনা পয়সা দিয়ে বলেছিল—যাক্, শুয়েই থাক্। দোকান খুললে চার আনার মদ আর দুটো কুইনিন খেয়ে নিস। আমি রামাকে নিয়ে চললাম।

পাঁচমতী থেকে ট্রিপ নিয়ে ফিরে দেখলে, নিতাই বাসায় নাই। মদের দোকানে, চায়ের দোকানেও পেলে না। পথে হাফিজ বললে—নিতাই রামেশ্বরোয়ার সঙ্গে বোধ হয় শহরে গিয়েছে।

শহরে? আশ্চর্য্য হয়ে গেল নরসিং। এতক্ষণে চুপি চুপি রামা বললে—হয়েছে দাদাবাবু। আপনাকে বলতে আমার মনে ছিল না।

রামার মুখে নিতাইয়ের এই কথা শুনে সে আশ্চর্য্য অবশ্য হ'ল না, পাখীর ছানার ডানা গজায় উড়বার জন্যই, নিতাই ড্রাইভিং শিখেছে লাইসেন্স নেবার জন্যই; কিন্তু তাকে লুকিয়ে তার শত্রু ওই রামেশ্বরোয়ার সঙ্গে দোস্তি ক'রে ষড়যন্ত্র ক'রে নিতে চলেছে—এ জন্য তার দুঃখ হ'ল। ড্রাইভারের মেজাজে দুঃখ নীরব বিষণ্ণতায় আত্মপ্রকাশ করে না, করে ক্ষোভের মধ্য দিয়ে। নরসিং বললে—শালা হারামী কাঁহাকা! ও, এই জন্যে বুঝি? তাই শরীর খারাপ?

ক্ষুব্ধ মনের তাড়নায় সে গাড়ীটাকে মোড় ফিরাবার মুখে নিয়ে গিয়ে ফেললে রাস্তার ধারে, রাস্তা মেরামতের জন্য গাদা ক'রে রাখা পাথর-কুচির গাদার ওপর। কিন্তু ওস্তাদ ড্রাইভার নরসিং, শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলে ষ্টিয়ারিং, পায়ের চাপে গতি নিয়ন্ত্রিত করলে। ঠিক পার হয়ে গেল। শা-লা!

ফ-স্-স্-স্।

কি হ'ল? গিয়েছে একটা চাকা! পিছনের বাঁ দিকের কোণটা বসে যাচ্ছে। ব্রেক কষলে নরসিং। লাফ দিয়ে নামল রাম।

এঃ, একটা বোতল-ভাঙা কাচ দাদাবাবু। টায়ারটার পাশে ঠিক সেই ক্ষয়া জায়গাটাতে ঢুকে গিয়েছে। পাথর-গাদায় বোতল-ভাঙা কাচ ফেলেছে কে?

নরসিং নামল।

ট্রিপের সময় চলে যাচ্ছে। আপিসের সময়। এই ট্রিপে বাঁধা খদ্দের অনেক। তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকবে।

নিয়ে আয় জগ। নিজে লেগে গেল ষ্টেপনীটা খুলতে। মনটা খিঁচড়ে গিয়েছে, ফুটে-যাওয়া চাকাটার বোল্টগুলো খুলতে ক্রমাগত বাধা পাচ্ছে। শালা নিমকহারাম বেইমান! ছোটলোকের বাচ্চা তো হাজার হলেও!

কি হ'ল? পাংচার?

জোসেফ আর নীলিমা। নীলিমা ইস্কুলে যাচ্ছে। নরসিংয়ের মন খানিকটা

স্নিগ্ধ হ'ল। সে ওরই মধ্যেও নমস্কার করতে ভুললে না।—নমস্কার!

জোসেফ এসে দাঁড়াল নরসিংয়ের পাশে।

আঃ! করলেন কি? আঙুলটা জখম করে ফেললেন? সরুন, আপনি সরুন। আমি দেখি। নীলি, তুই বরং চলে যা আজ। আমি দেখি। সিংজী আঙুলটা জখম ক'রে ফেলেছেন।

নীলিমা আঙুলটা দেখে শিউরে উঠল। বেঁধে ফেলুন এক্ষুনি। রাম, তুমি চট ক'রে গিয়ে খানিকটা বরফ নিয়ে এস।

হেসে নরসিং বললে—ডাইভারদের ও রকম অনেক লাগে। রামের এখন যাওয়া চলবে না।

নীলিমা বললে—না, চলুন, ওই আগে বরফ পাওয়া যায়। আসুন।

উঁহু। আমার প্যাসেঞ্জার বসে আছে পাঁচমতীতে।

হন-হন ক'রে চলে গেল নীলিমা।

ঘটাং-ঘটাং-ঘট-ঘট-ঘট। জগ খুলে নিয়ে গাড়ীর ভিতরে ফেলে দিলে রাম। সেটাকে।

জোসেফ বললে, ও. কে., ঠিক হয়ে গেছে।

পানের দোকানের একটা ছোকরা ছুটে এল। তার হাতে নীলিমার রুমালে জড়ানো খানিকটা বরফ।

জোসেফ বললে—লাগান, উপকার হবে। রাম, তুমি ওর পাশে বসে আঙুলের ওপর ধরে রাখ। ডান হাতে দিব্যি ষ্টিয়ারীং চলবে ওঁর।

নরসিং সুস্থ হাতটায় সিগারেট বার ক'রে ধরলে। বললে—আপনি নিন, একটা বার ক'রে আমার মুখে দিয়ে ধরিয়ে দিন।

সিগারেট ধরিয়ে সে গাড়ীতে চেপে বসল। রাম হাতে বরফ ধরেছিল। নরসিং সেলফ্‌স্টার্টার ব্যবহার করলে। গাড়ীখানা গর্জ্জন ক'রে উঠল। রামকে বললে—হাঁক্।

পাঁচমতী—পাঁচমতী—পাঁচমতী।

ফু ক'রে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বরফ থেকে হাত টেনে নিয়ে সে গীয়ারের উপর রাখলে।

পাঁচমতী—পাঁচমতী—পাঁচমতী।

চৌদ্দ

আরও মাস খানেক পর।

শ্যামনগর, শ্যামনগর, শ্যামনগর।

বর্ষা আরম্ভ হয়েছে। এবার বর্ষা নেমেছে দেরীতে। শ্রাবণ মাস—গোটা আষাঢ় নরসিং গাড়ী চালিয়েছে। আকাশে মেঘ ঘুরছে। মধ্যে মধ্যে রিম-ঝিম বৃষ্টি নামছে। কাঁচা সড়ক হলেও নবাবী আমলে তৈরী রাস্তা, অন্তত তিন-চারশো বৎসর ধরে জমে তলদেশ 'বজ্রকঠিন' হয়ে গিয়েছে। নরসিং 'বজ্রকঠিন' শব্দটি ব্যবহৃত করে। 'বজ্র' নামক পদার্থটি আসলে কি এবং আসলে তার আকার-আয়তন আছে কিনা, সে সব বিশ্লেষণ করলে কথাটা দাঁড়ায় কিনা, এ সব প্রশ্নই তার কাছে নাই। সে শুনে আসছে কথাটা এবং কথাটা ভারী ভাল লাগে তার কাছে, তাই সে ব্যবহৃত করে। বজ্র বলতে নরসিং জানে, এ দেশে প্রবাদ প্রচলিত আছে—শাণিত এবং কঠিনতম একটা অস্ত্র। লম্বা তীরের ফলার মত আকার, সেটা আকাশে ক্রুদ্ধ দেবতা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়, ব্রহ্মশাপগ্রস্তের উপর এসে পড়ে। এমন কি, মধ্যে মধ্যে যে গাছের উপর বাজ পড়ে তার কারণ ওই অভিশাপ। ওগুলো ব্রহ্মশাপগ্রস্ত গাছ। বজ্রাস্ত্র এসে শাপগ্রস্তকে বিনাশ ক'রে আকাশে চলে যায়। একমাত্র কলাগাছের কাছে এই বজ্রাস্ত্র পঙ্গু। কলাগাছ হ'ল কলা-বউ, সে হ'ল স্ত্রীলোক, তার উপর যদি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বাজ এসে পড়ে তবে সে আর ফিরতে পারে না। কলাগাছের কোমল বুক চিরে ফেলবামাত্র তার শক্তি লোপ পায়, আগুন নিভে যায়, বজ্রাস্ত্রের টুকরো ওই

গাছের মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকে। সিঁধেল চোরেরা এর সন্ধানে থাকে। এ অস্ত্র যে পায়, তার আর ভাবনা নাই। ইট কাঠ পাথর এমন কি দেওয়াল যদি লোহারও হয় তবে এই ফলা দিয়ে কাটলে পাকা ফলের শাঁসের মত কেটে যাবে। ছেনিতে কাটে না, আগুনে গলে না, হাম্বর দিয়ে পিটলে ভাঙে না, একটা কণা পর্য্যন্ত খসে না, এমনি কঠিন এই বজ্রাস্ত্রের টুকরো। তিন চারশো বছরের সড়কটার তলাটা ঠিক তেমনি কঠিন। উপরে হাত দেড়েক মাটি, যেটা হাল আমলে ফেলা হয়েছে। তাই চাকায় চাকায় গুঁড়ো হয়, গ্রীষ্মে ধুলো হয়ে ওড়ে, বর্ষায় কাদা হয়ে এলিয়ে পড়ে, বর্ষা ফুরিয়ে গেলে শুকিয়ে ঘায়ের মামড়ির মত কদর্য্য হয়ে ওঠে। কোন রকমে যদি এক পুরু নুড়িপাথর আর লাল মোরাম এনে বিছিয়ে দিতে পারা যায় তবে আর ভাবতে হয় না। একেবারে—নরসিং বলে—একেবারে ফাষ্ট কেলাস মটর রোড হয়ে যায়। কিন্তু কে রাজা কে মন্ত্রী, কে গুরু কে গোঁসাই, এর পাত্তা করাই এক কঠিন ব্যাপার! গোটা রাস্তাটায় নুড়িপাথর মোরাম দেওয়া দূরে থাক্, এর মধ্যেই কয়েকটা বিশ্রী গর্ত্ত দেখা দিয়েছে। সেগুলিকে অন্তত ওইভাবে মেরামত করিয়ে দেবার জন্য নরসিং কণ্ট্রাক্টারের কাছে গিয়েছিল। কণ্ট্রাক্টার বলেছে—ওভারসিয়ারবাবু বললেই আমি করে দেব। ওভারসিয়ারবাবু বলেছে, নুড়িপাথর? ক্ষেপেছ নাকি তুমি? কাঁচা সড়কে নুড়িপাথর?

নরসিং বলেছিল—এখন কয়েক ঝুড়ি নুড়িপাথর দিলে আর গর্ত্ত হবে না। না হলে এক পশলা চেপে জল হলেই ও একেবারে 'জাওন গাড়া' হয়ে যাবে।

এখানে বর্ষণ হওয়াকে 'বৃষ্টি হওয়া' বলে না, বলে 'জল হওয়া'। 'জাওন গাড়া' বলে জলে কাদায় ভর্ত্তি খানাকে। ওভারসিয়ার হেসে বলে দিয়েছেন—তখন গাছের ডাল কেটে ফেলে দিয়ে তার ওপর মাটি দিয়ে দেব।

নরসিং ধরেছিল এস-ডি-ওকে। এস-ডি-ও ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডে দরখাস্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমার থ্রু দিয়ে দেবে, আমি রেকমেণ্ড ক'রে দেব।

তাও করেছিল নরসিং। ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান লিখেছেন—কাঁচা রাস্তার নুড়িপাথর দিয়ে মেরামতের বরাদ্দ কোন কালে নাই। যা নাই, তার রেওয়াজ আমি কি ক'রে করব? .

রেওয়াজ নাই। দেশে কি মোটরের রেওয়াজ ছিল কোন কালে? নরসিং ও নিয়ে আর মাথা ঘামাই নাই। ঘামিয়ে লাভ নাই। অল্পস্বল্প বৃষ্টি এখন, এ সময়ে প্যাসেঞ্জারের ভিড় বাড়ছে। গোটা রাস্তাটা চটচটে কাদায় ভরে গিয়েছে, পিছল হয়েছে, বর্ষায় ভিজতে হচ্ছে মানুষকে, হেঁটে যাওয়ায় অনেক কষ্ট, পথিকেরা এখন গাড়ীতে যেতে চায়। ঘোড়ার গাড়ীগুলো এর মধ্যেই ঘাল খেয়েছে, মোটরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। দশবারোখানা গাড়ীর কয়েক খানা শ্যামনগর শহরেই ভাড়া খাটে; খান দুই তিন গরুর গাড়ীর মাথা খেতে উঠে পড়ে লেগেছে। শ্যামনগর থেকে তিন মাইল দূরবর্ত্তী জাগ্রত মা-কালীর থান এবং গরু ছাগলের হাট—হাট দেবীপুরে ভাড়া খাটছে। খান পাঁচেক এখনও পথে চলছে। এ পাঁচখানা গাড়ীর ঘোড়া ভাল। কিন্তু রাস্তায় কাদা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবস্থাও কাহিল হয়ে পড়েছে। ছেলে-বেলায় নরসিং পড়েছিল, 'গরু মহিষাদির ক্ষুর চেরা বলিয়া কাদায় চলাচলের পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। এবং ঘোড়ার ক্ষুর জোড়া বলিয়া কাদার মধ্যে ঘোড়া ভাল চলিতে পারে না।' আজকাল রাস্তায় ঘোড়াগুলা যখন অতিকষ্টে চলে তখন নরসিং আপন মনেই বলে—'ঘোড়ার ক্ষুর জোড়া বলিয়া—।'

আজ বৃষ্টি কিছু বেশী হয়েছে; মোটরের চাকা পিছলে যাচ্ছে, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট গর্ত্ততে জল জমেছে, সমস্ত সড়কটার উপরেই চার পাঁচ আঙ্গুল পুরু কাদার একটা আস্তরণ পড়েছে; এখানকার মাটি অত্যন্ত আঠালো, টায়ারে মধ্যে মধ্যে এমন কাদা জমে যাচ্ছে যে মাডগার্ড পর্য্যন্ত পুরু হয়ে উঠে খস-খস শব্দ উঠছে। খুব সাবধানে যেতে হচ্ছে। মাঠের রাস্তা বন্ধ, সেখানে এখন কাদা এক হাঁটু সমান। ওদিকে নামলে আর রক্ষা নাই। রথচক্র গ্রাস হয়ে যাবে। ইঞ্জিন চলবে, চাকাও ঘুরবে, কিন্তু গাড়ী এক ইঞ্চি এগুবে না।

কাদার মধ্যেই চাকা সর-সর শব্দ করে পাক খেতে থাকবে। এইবার সার্বিস বন্ধ করতে হবে আর উপায় নাই। 'ঘোড়ার ক্ষুর জোড়া বলিয়া' আজ রাস্তায় একখানাও ঘোড়ার গাড়ী নাই। কেবল গরুর গাড়ীগুলো চলেছে সেই এক চালে। কিবা রাত্রি কিবা দিন, কিবা গ্রীষ্ম কিবা বর্ষা—সমান চালে চলছে ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে, পাড়াগাঁয়ের দা'ঠাকুরি চালে—এক হাতে ছাতা লাঠি, এক হাতে হুঁকো নিয়ে ভারিক্কী চালে চলার ভঙ্গিতে।

এই সময়টা কিন্তু ভাল রোজগারের সময় ছিল। ভাড়া বাড়িয়ে দিলেও কেউ আপত্তি করত না, ঝিপি-ঝিপি বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য সুড়সুড় করে হুডের তলায় এসে ঢুকত। পাঁচমতীর যারা ডেলীপাসেঞ্জারী করে তারা বর্ষার সময়টা শ্যামনগর বাসা গাড়তে বাধ্য হয়। মোটর চললে তারাও বাঁচত। মরুক অকর্ম্মার দল সব; লেখাপড়া শিখেছে, না, কচু শিখেছে। দরখাস্ত ক'রে তদ্বির ক'রে এই সাত মাইল রাস্তা পাকা করে নিতে পারে না? বড় বড় জমিদার আছে, তাদের না ভাবনা না চিন্তা, জমিদারী করে ঘি দুধ মাছ মাংস খায় আর ঘুমোয়, মামলা-মকদ্দমা লেগেই আছে। সে চালায় তাদের কর্ম্মচারীরা; রাস্তা পাকাই হোক আর কাঁচাই হোক বাবুদের কিছু আসে যায় না। নেহাৎ দরকার হলে পাল্কী আছে, ভিজতে ভিজবে বেহারা বেটারা, কাদা ভাঙবে তারাই, কয়েক বাড়ীতে বুড়ো হাতী আছে, বর্ষার সময় তাদের হাতী বার হয়। থপ-থপ ক'রে জল কাদা ভেঙে চলে।

—হুঁস ক'রে একটু হুঁসিয়ার হবেন সব। নরসিং হেঁকে উঠল।

সামনে একটা বড় খন্দক ঠিক একেবারে মাঝখানে, দু'পাশে দু'ফালি কাদাভরা জায়গা, খন্দক বাঁচিয়ে যে দিকেই যেতে যাবে সেই দিকেই এক পাশের চাকা একেবারে রাস্তার কিনারার উপর পড়বে। কোন রকমে যদি কিনারা ধ্বসে তবে মোটর নিয়ে 'মালকবাজী' অর্থাৎ উল্টে ডিগবাজী খেয়ে মাথা নিচু করে পড়বে। চাকা চারটে আকাশের দিকে উঠে যাবে। নরসিং অবশ্য ভয় খায় না, এ ভাবে মোটর চালানো তার নতুন নয়। মেঠো পাড়াগেঁয়ে যারা

সাইকেল চালায় তারা মাঠে আপথে সাইকেল চালিয়ে যায়; এও তাই। পাশে বসে রামা পাশে সামনে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বলে চলেছে—'চল চল, হুঁসিয়ারী হুঁসিয়ারী, বহুৎ আচ্ছা, বলিহারী, কেয়াবাৎ—জয় মা-কালী, ঠিক হ্যায়।' অতি সন্তর্পণে নরসিং চালিয়ে পার হয়ে আসে দুর্গম স্থানটা। আর কিন্তু সার্বিস চলবে না মনে হচ্ছে। বন্ধ করতে হবে। ওদিকে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড মেরামত্তির নোটিশ দিয়ে রাস্তায় ট্রাফিক বন্ধ করবে দু-চার দিনের মধ্যেই। একটা সিগারেট খাবার ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু উপায় নাই। রাস্তার যা অবস্থা তাতে ষ্টিয়ারিংয়ে এক হাতের জোর রেখে ভরসা হয় না। শালা শূয়ারকি বাচ্চা নিতাই! বেটা ভেগেছে। পাখীর বাচ্চার ডানা গজালে সে আর মা-বাপের বাসায় থাকে না। উড়ে পালায়। নিতাই পালিয়েছে। সে থাকলে তাকে ষ্টীয়ারিং ছেড়ে দিয়ে একটা সিগারেট খেয়ে নিতে পারত।

এবার রাস্তা ভাল। গাড়ীর স্পীড বাড়ালে নরসিং। রাস্তায় রাহী চলেছে এক পাশ ঘেঁষে। জন কয়েক চলেছে ঠিক মাঝখান বরাবর। হর্ন দিলে নরসিং।

জালালে রে বাবা! মোটর এল, না, আপদ এল!

পাড়াগেঁয়ে হালফ্যাশানি চাষা-ভূষো শহরে চলেছে মামলা করতে। দুচক্ষে দেখতে পারে না নরসিং। 'আধ আখুরে' যে বলে এদের, সে মিথ্যে বলে না। অ-আ-ক-খ অক্ষরগুলোর আধখানা চেনে না। ছাপা অক্ষর চিনতে পারে, বানান করে পড়ে কোন রকমে; কিন্তু হাতের লেখা হলেই—বাস্, 'আজমীর গেয়া'কে 'আজ মর গেয়া' এক প্রহর কসরতের পর।

রাম বলে উঠল—হাঁ, হাঁ—গর্ত্ত, গর্ত্ত—গচকা।

দেখেছি।—নরসিং গর্ত্তের উপর দিয়েই গাড়িটা চালিয়ে দিলে, স্পীড একটু বাড়িয়ে দিয়েই চালিয়ে দিলে। জলভরা গর্ত্তের উপর দিয়ে গাড়ি চলে এল কাদা জল ছিটিয়ে। নরসিং পিছনের দিকে চেয়ে বললে—শালা!

রাম এতক্ষণে বুঝেছে। সে হি-হি করে হেসে উঠল, সেই সর্ব্বনেশে হাসি।

সে হাসি আরম্ভ হলে আর থামতে চায় না। প্যাসেঞ্জাররাও হাসছে। ওই চাষী দুজনের জামা কাপড় কাদায় ভরে গিয়েছে। মাথায় মুখে পর্য্যন্ত কাদা লেগেছে। একজনের বোধ হয় মুখের ভিতরে চলে গিয়েছে কাদা। লোকটা থু-থু করে থুথু ফেলছে।

জল বৃষ্টি হলে এই একটা আমোদ পায় নরসিং। শুধু নরসিং কেন? সব ড্রাইভারেরই আমোদ লাগে। বিশেষ করে সাদা পরিষ্কার জামা কাপড় প'রে বেশ ফিটফাট বাবুটি সেজে যারা যায়, তাদের দেখলেই গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে জলকাদার উপর দিয়ে গাড়ী চালাতে ইচ্ছে করে। কাদায় যখন ধোপদুরস্ত জামা কাপড় ছিটেয় ভ'রে গিয়ে চিতে বাঘ হয়ে ওঠে, তখন ওদের মুখের চেহারা দেখে সব চেয়ে আমোদ লাগে।

রামা এখনও হি-হি করে হাসছে। নরসিং প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করেছিল, এবার সেও হাসতে আরম্ভ করলে।

শ্যামনগর এসে গিয়েছে। এইবার পাথর দেওয়া রাস্তা। চালাও। স্পীড বাড়ালে নরসিং। সময় সংক্ষেপের জন্য নয়, ভাল রাস্তায় জোরে চালাবার আরাম অথবা আনন্দের জন্য। সময় এখন পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁয়ষট্টিতে উঠেছে। কুড়ি মিনিট বেশি লাগছে। সে জন্য প্যাসেঞ্জারদের অভিযোগ নাই, চোখ আছে তাদের, তারা দেখতেই পায়, অবুঝ নয়, বুঝতেও পারে এবং বিবেচনাও আছে তাদের—বিরক্তি হয়ত বোধ করে, কিন্তু তাদের চেয়ে বিরক্তি বোধ করে নরসিং নিজে। সাত মাইল রাস্তা আসতে যদি পঁয়ষট্টি মিনিটই লাগে তবে আর মোটর চালিয়ে লাভ কি?

—রোখো, এই, রোখো।

পথের ধারে জামা-কাপড়ের উপর হ্যাট মাথায় দিয়ে সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে ওকে? ও! শ্যামনগরের মিউনিসিপ্যালিটির ওভারসিয়ার বাবু।

হুঁ। বুঝেছে নরসিং ব্যাপারটা। তখনই বার বার বারণ করেছিল নরসিং—

ওরে রামা, একটা গাদা থেকে নিস না। পাঁচ জায়গা থেকে নিলে ধরতে পারবে না।

—রোখো!

রুখলে নরসিং।—নমস্কার বাবু। কোথাও যাবেন না কি? সিট রাখতে হবে?

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠে ওভারসিয়ার এর উত্তরে বললেন—তোমার নামে আমি রিপোর্ট করব। তোমার সহিসের লাইসেন্সের মাথা খেয়ে দোব আমি। বদমাস পাজী লোক কোথাকার!

নরসিংয়ের পায়ের নখ থেকে মাথার চুলের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত একটা ক্রুদ্ধ বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। গিরবরজার ছত্রি-রক্তের এটা স্বভাব-ধর্ম্ম।

কিন্তু তার আর একটা অভ্যাস-ধর্ম্ম জন্মেছে। ড্রাইভারী কর্ম্ম করতে করতে ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, এস-ডি-ও, এস-পি, ম্যাজিষ্ট্রেট এদের ধমক খেয়ে সে ধমক হজম করার অভ্যাস। এই এখানে আসার যেটা হেতু; এস-ডি-ও বেত মেরেছিলেন। সেই বেত সে চেপে ধরে বলেছিল, মারবেন না স্যার! সেই হেতুটার মূলে তার যে অসহনশীলতা ছিল তার জন্য নরসিং মনে মনে অনুশোচনা করে। মনে হয় বেতটা এমন ভাবে চেপে না ধরলেই হ'ত। আরও দু'চার বেত হয়তো মারত এস-ডি-ও, তারপর ক্ষান্ত হ'ত—তাতে তার রাগটা পড়ে যেত। তা হলে এত কালের সহিস ছেড়ে এই কাদামাটির দুর্গম পথে তাকে আসতে হ'ত না। সাপ যে সাপ, তাকেও মানিয়ে চলতে হয় অবস্থার সঙ্গে। নরসিং এটা নিজের চোখে দেখেছে। একই দিনে একটা বেদে দুটো সাপ ধরেছিল, একটা ধরেছিল মাঠে—নরসিং সেখানে উপস্থিত ছিল, আর একটা ধরেছিল গ্রামে—নরসিংয়ের প্রতিবেশী বাড়ীওয়ালা গড়াঞী মশায়ের বাড়ীতে; দুটোই গোখরো, আকারে আয়তনে ঠিক এক। কিন্তু মাঠের সাপটার সে কি তেজ, বেদের হাতে ঢালের মত করে ধরা ঝাঁপিটার উপর ছোবলের পর ছোবল মেরে নিজের মুখটাকে রক্তাক্ত করে ফেললে। আর গ্রামের সাপটা

যেন মরা, মাথা ছ'একবার তুললে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথা নামিয়ে নিজের দেহের পাকানো কুণ্ডলীর মধ্যে মুখটা গুঁজে দিলে। নরসিং বলেছিল—ওটার জাত হ'ল আসল গোখরোর জাত। আর এটা হ'ল ঢোঁড়ার জাত বোধ হয়।

হেসে বেদে বলেছিল—আজ্ঞে না, মাঠের সাপ আর গাঁয়ের সাপের এমনি তফাতই হয় আজ্ঞে। মাঠের সাপকে মানুষের সঙ্গে তো ঘর করতে হয় না। মানুষের 'বেক্কম' জানে না। তাই একেবারে ফোঁসাচ্ছে। গাঁয়ের সাপ জানে, মানুষ কি! বুঝলেন আজ্ঞে, তাতেই ওরা মানুষের কাছে 'বেক্কম' দেখায় না। 'অ্যাবস্থার মত বেবস্থা' আর কি।"

গিরবরজার ছত্রির ছেলের রক্ত বংশধারা অনুযায়ী প্রথমেই চঞ্চল হয়ে উঠলেও পরমুহূর্ত্তেই সে শান্ত হয়। অভ্যাস হয়ে গিয়েছে ওটা। নরসিং নিজেকে সংযত করবার জন্য নির্ব্বাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত চেয়ে রইল ওভারসিয়ারের দিকে। ওভারসিয়ার বললে—অ্যাঃ, আবার চাউনি দেখ, যেন গিলে খাবে!

নরসিং এবার বললে—গিলে তো মানুষ মানুষকে খায় না; আপনি কিন্তু যে রকম করছেন তাতে মনে হচ্ছে ধরে মারবেন আমাকে। কেন বলুন দেখি? কি করলাম আমি?

কি করলে? মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তার পাথরের গাদা থেকে তুমি পাথর নিয়েছ কেন হে বাপু?

পাথর? ওই পাথর-কুঁচি?

হ্যাঁ হে। ন্যাকা সেজো না। কেন নিয়েছ বল?

খাবার জন্যে নিয়েছি। পাথর-কুঁচির ডালনা রেঁধে খেয়েছি। কি আর বলব বলুন? পাথর-কুঁচি চুরি! পাথর-কুঁচি চুরি করে আমি কি করব? আপনার কণ্ট্রাক্টরকে ধরুন গিয়ে। সে এখান থেকে সরিয়ে আর এক জায়গায় গাদা দিয়ে নতুন মাপ দেবে।

দেখ হে, বেশি চালাকী ক'রো না। যে দেখেছে, যে জানে, সে আমাকে

বলেছে। এখানকার পাথর নিয়ে তুমি গাড়ীতে তুলে নিয়ে যাও, ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের সড়কের ফাটলে দাও। আমি সব খরব পেয়েছি।

বেশ তো, যে দেখেছে সে আমার সামনে বলুক। আপনি তো দেখেন নাই, আপনার কথা তো প্রমাণ নয়।

ওভারসিয়ার এবার এগিয়ে এল। বললে—চল, মিউনিসিপ্যালিটির আফিসে যেতে হবে তোমাকে। চেয়ারম্যানের কাছে যা বলতে হয় বলবে।

একটু চুপ করে থেকে নরসিং বললে—এখন আমার সার্বিসের সময়। এখন তো যেতে পারব না, যাব এর পরে। এর পর আপনার সঙ্গে দেখা করব।

'দেখা করব' কথাটা ইসারার কথা। ওরই মধ্যে অনেক কথা বলা হয়ে গেল। গোটা পাঁচেক অন্ততঃ খসবে। পাঁচ টাকার কমে রাজী হবে না ওভারসিয়ার। কথাটা সত্য। একটা খন্দকে দেবার জন্য কয়েক ঝুড়ি পাথর-কুঁচি নিয়েছে নরসিং। মাথাবাথা তো ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের নয়, রাস্তা তো ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের মেম্বারদের কাছে ধোবির পরিষ্কার করতে নেওয়া কাপড়, ফাটে আর ছেঁড়ে তাদের কি আসে যায়? যারা হাঁটে রাস্তা তাদের, এখন সব চেয়ে রাস্তাটা আপনার হ'ল নরসিংয়ের। দিনে তিনবার তিনবার ছ'বার—এই সাত মাইল পথ তার মোটর ছোটে। একটা খন্দক ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠছিল, রাত্রের অন্ধকারে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার জন্য জমা-করা পাথরের গাদা থেকে কয়েক ঝুড়ি পাথর নিয়ে সে খন্দকটায় দিয়েছে। উল্লুক বেকুফ রামা! একটা গাদা থেকে বেশি পাথর নিয়েছে। বার বার সে বারণ করেছিল। কিন্তু রামা সেই হি-হি করে হেসেছে, বলেছে—আপনি যেমন দাদাবাবু! দায় পড়েছে ওভারসিয়ারের।

নরসিং বলেছিল—মেম্বাররা দেখে যদি কেউ কৈফিয়ৎ চায়?

তখন বলে দেবে—গরুতে খেয়ে নিয়েছে। বলে সেই হি-হি করে হাসি।

নরসিংও হেসে ফেলেছিল। কথাটা খুব মিথ্যে নয়। ও-জেলায় রাস্তায়

কাঁকর দেওয়া হয়। ঠিকেদারের সঙ্গে ওভারসিয়ারের বন্দোবস্ত আছে। রাস্তার কাঁকর আশী ফুট দিলে একশো ফুটের মাপ দেয় ওভারসিয়ার। চেয়ারম্যান কড়া হ'লে মধ্যে মধ্যে ইন্‌স্‌পেকশনে আসে, দু'দশটা গাদা চেক ক'রে দেখে। কম হয়ই। কৈফিয়তে ওভারসিয়ার বলে, তিন মাস পড়ে আছে, ঝড়ে উড়েছে, জলে গলেছে, তারপর ধরুন মানুষ গরু ছাগল এদের পায়ে পায়ে চলে গিয়েছে।

ওখানকার লোকে কথাটার উপর রঙ চড়িয়ে বলে—গরুতে খেয়ে নিয়েছে।

ওভারসিয়ারও এখানে একটা কিছু রিপোর্ট দেবে আর কি! লোকসানের মধ্যে নরসিংয়ের পাঁচটা টাকা। আর আফশোস, জাত গেল পেট ভরল না! ঝুড়িকয়েক পাথর দিয়ে একটা খন্দক বন্ধ করেও সাবিস চালানো গেল না। কাঁচা রাস্তা পাকা করতে গেলে যে পাথর লাগে সে চুরি করে সংগ্রহ করা যায় না।

* * *

কথাটা কিন্তু বলে দিলে কে? এইখানে কয়েক ঘর পশ্চিমা ডোম বাস করে। শহরে ঝাড়ুদারের কাজ করে। কিন্তু সন্ধ্যার পরই ওদের দুপুর রাত হয়ে যায়। মদের নেশায় খানিকটা হল্লা করে ঘুমিয়ে পড়ে। ওদের তো এ চুরি দেখার কথা নয়। মেয়েগুলো অবশ্য জেগে থাকে। এদের মেয়েগুলো অত্যন্ত বিলাসিনী। পুরুষেরা মদে অচেতন হয়ে গেলে ওরা কান পেতে থাকে বাইরের ইসারার জন্য। শিসের শব্দ ভেসে আসে, টুপ-টাপ করে ঢেলা পড়ে। নরসিংয়ের মনটা হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল—পাথর কোথায় গেল এর একটা ভাল কৈফিয়ৎ পাওয়া গেছে। ওই ডোমপাড়ার উঠানে এবং চারিপাশে ছড়িয়ে আছে। ডোম-মেয়েগুলোর সন্ধানে যারা আসে তারাই ইসারা জানাতে ঢেলা মেরে গাদা সাবাড় করে দিয়েছে। ওভারসিয়ার এ কথা শুনবে না, কিন্তু ওভারসিয়ারের এ কথা মিউনিসিপ্যালিটি শুনবে।

রামা হঠাৎ বললে—জানেন দাদাবাবু, এ কথা বলে দিয়েছে কে জানেন?

কে ?

নেতাই। এ আপনার ওই শালার কাজ।

নিতাই! নরসিং সোজা হয়ে বসল। ঠিক। এ আর কেউ নয়, ওই নিতাই। বেইমান নিমকহারাম হাড়ি ছোটজাতের বাচ্চা ওই শয়তানের কাজ। নিতাইয়ের ড্রাইভিং লাইসেন্স হয়ে গেছে; রামেশ্বরোয়া এখন তার পরামর্শদাতা হয়েছে, সেই এখন তার মুরুব্বি, গার্জেন। রামেশ্বরোয়ার তদ্বিরে ড্রাইভিং লাইসেন্স হয়েছে, একটা কাজও জুটিয়ে দিয়েছে রামেশ্বরোয়া। এখানকার এই শ্যামনগরের এক বাবু একখানা পুরানো 'লঝ ঝড়' ফোর্ড গাড়ী কিনেছে। বাবু মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বর, ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের মেম্বর, প্রচুর মদ খায় আর আমোদ ক'রে বেড়ায়, চেয়ারম্যানরা যা বলে তাতেই সায় দিয়ে যায়। এস-ডি-ও ডি-এস-পি ম্যাজিস্ট্রেটের তোষামোদ করে, রাত্রে ডোমনী নিয়ে আমোদ করে।

তারই সেই ফোর্ডগাড়ীতে খোরাক-পোষাক আর পনেরো টাকা মাইনেতে ড্রাইভার হয়েছে নিতাই। রাম কহো! পনের টাকা মাইনে যার, সে আবার ড্রাইভার! নরসিং তাকে কম কি দিত? খোরাক দিত, বারো টাকা মাইনে দিত। পোষাক আর তিন টাকা বেশি মাইনে সে চাইলে নরসিং তাকে নিশ্চয় দিত। আর সেও তো তাকে বলেছিল, লাইসেন্স করে দোব—দোব—দোব। নরসিংয়ের মনে হয়, নিতাইয়ের মত অকৃতজ্ঞ, এতবড় বেইমান দুনিয়ায় কখনও হয় নাই, হবে না। হাড়ির বাচ্ছা গরুর রাখালী ক'রে, নয়তো মাটি কেটে কিংবা লাঙল ঠেলে জীবন যেত। বড় জোর ইমামবাজারে বাবুদের বাড়ীতে ঘোড়ার সহিসের কাজ করত, ঘাস কাটত, ঘোড়ার ময়লা ফেলত মাথায় ক'রে। সে-ই তাকে মোটরের কাজ শিখিয়েছে, ড্রাইভিং শিখিয়েছে। সে তাকে ড্রাইভিং শিখিয়েছিল ব'লেই না এই লাইসেন্স সে পেয়েছে! সেই তো তার গুরু। কলিকাল, পাপের কাল। এ কালে বেইমানীই হ'ল গুরুদক্ষিণা। নিতাই তার যা করেছে—তার আনুগত্য, তার প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম, সে সমস্তই

নরসিংয়ের কাছে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। ঠিক কথা। ঠিক ধরেছে রামা। এ চুকলামী করেছে নিতাই। বেইমান নিমকহারাম ছোট জাতের বাচ্চা ওই নিতাই। নিতাই আসে ওই ডোমপাড়ায়। ডোমনী-সংগ্রহের জন্য আসে। নিজের জন্যও আসে—মনিবের জন্যও আসে। ওই কোন রকমে দেখে থাকবে। নিতাইই বলেছে তার মনিবকে, তার মনিব বলেছে ওভারসিয়ারকে। বলুক! ব'লে কি করে দেখবে নরসিং।

'পাঁচঠো রুপেয়াকে কিম্মৎ।' বাস্। "ডোমপাড়ায়—ডোমনীদের ইসারা দিবার জন্য ঢেলা মারিয়া মারিয়া পাথর গাদার পাথর শেষ করিয়া দিয়াছে। অমুক বাবুর ড্রাইভার নিতাইচরণ হাড়ি ইহাদের একজন। রামেশ্বরোয়া ড্রাইভারও যায়।"

নিতাইয়ের বাবু মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বার। বাবুর নামটা করতে পারে না ওভারসিয়ার। সে এখন থাক্। সময় হলে সে নামও চাউর হবে। মিউনিসিপ্যালিটির ভোট আসছে। কংগ্রেস নাকি এবার দাঁড়াবে। 'বন্দে মাতরম্, ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!' সে কি মাতন! নরসিং চিরদিন ভোটের সময় তার গাড়ী দিয়েছে কংগ্রেসকে। এবারও দেবে। কংগ্রেস এবার ডিস্ট্রীক্ট-বোর্ডেও ভোটে দাঁড়াবে। সেখানেও সে গাড়ী দেবে।

ঘ্যাচ করে ব্রেক টেনে গাড়িটা রুখলে নরসিং। সামনেই ওদের দোকানটা। রাম বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলে। এই তো সবে ছ'টা বাজে। এখনও দুটো ট্রিপ্ বাকী। একবার যাওয়া—একবার আসা। ফিরে এসে ন'টার সময় দাদাবাবুর বোতল নিয়ে বসবার কথা। রাস্তা খারাপ, টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, এই অবস্থায় নেশা ধরলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে। নরসিং সে দৃষ্টিকে গ্রাহ্য করলে না। গাড়ীর দরজা খুলে নেমে পড়ল। রামাকে ডাকলে—আয়।

আর ট্রিপ দেবেন না?

না।

এ ট্রিপে কিন্তু লোক হ'ত।

ভাগ্। আয়। পয়সা পয়সা করে তুই খেপে যাবি দেখছি। আয়। পয়সার ভাবনা আজ আর নরসিংয়ের নাই। মদ খেয়ে মেজাজকে তার চড়া স্বরে বাঁধবার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। পয়সা যেতেও আছে আসতেও আছে, দু'মাসে রোজগারও সে যথেষ্ট করেছে। খরচ-খরচা বাদে চারশো'র ওপর জমিয়েছে নরসিং। শুখনরামের টাকা সে ফেলে দিয়েছে। নরসিংয়ের আর কোন ঋণ নাই। পঞ্চাশের উপর টাকা তার হাতে। তা ছাড়া দরকার হলে শুখনরাম এবার তাকে পাঁচশো টাকা দেবে এক কথায়। টাকার জন্য আজ তার মেজাজ খারাপ নয়। আজ তার মেজাজ চায় গরম হয়ে উঠতে; এই দোকানে নিশ্চয় আসবে নিতাই রামেশ্বরোয়ার সঙ্গে। সে আজ নিতাইকে একবার দেখবে। এস-ডি-ও ডি-এস-পি দারোগা ও ওভারসিয়ার নয় নিতাই। হাড়ির ছেলেকে সে-ই ড্রাইভার বানিয়েছে; দরকার হয়েছে আবার সে তার হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দিয়ে ড্রাইভারী ঘুচিয়ে দেবে। ছেলেবেলায় হিতোপদেশে একটা গল্প পড়েছিল সে। এক মুনি তপস্যা করছিলেন—একটা ইঁদুরের বাচ্চা কাকের মুখ থেকে খসে পড়ল। বড় মায়া হ'ল মুনির। মুনি তাকে বাঁচালেন। কিছুদিন পর বিড়ালে তাকে তাড়া করলে। মুনি তাকে বিড়াল ক'রে দিলেন। বিড়ালটাকে তাড়া করলে কুকুরে। মুনি তাকে কুকুর করলেন মন্ত্রবলে। কুকুরটা বাঘের ভয়ে সারা হয়ে একদিন তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। মুনি তখন তাকে বাঘ করে দিলেন। বাঘ হয়ে ইঁদুরটার আস্পর্দ্ধা বাড়ল; সে একদিন এল মুনিকেই খাবার মতলবে। তার মতলব বুঝে মুনি হেসে মন্ত্র পড়ে বললেন—ফের ইঁদুর হয়ে যাও। বাস্! হয়ে গেল সে বাঘ থেকে সেই কুৎসিত ভীতু ইঁদুর, যে ইঁদুর গর্ত্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

* * *

নিতাইয়ের দেখা পেলে না নরসিং।

শালা! দু'টো ট্রিপ লোকসান। এমন নেশার আমেজটা বরবাদ! একটা

চরম উত্তেজনাপূর্ণ কিছু না করলে তার মেজাজ শান্ত হচ্ছে না। ন'টায় দোকান বন্ধ হ'ল। নরসিং অত্যন্ত আক্ষেপ নিয়ে এসে মোটরে বসলে। বিলকুল বরবাদ আজ। আজ রাত্রে শুখনরামের সঙ্গে দেখা করবে ভেবেছিল। ইচ্ছা ছিল শেঠকে একখানা ট্রাক কিনবার জন্য ভজাবে। এতগুলো টাকা দু' মাসের মধ্যে ফেলে দেওয়াতে শুখনরামও একটু বিস্মিত হয়েছে। সে যা বলেছিল সেটা তার কানে এখনও বাজছে। শেঠ বলেছিল—বাস্, আঁ? দু'মাহিনার অন্দরে টাকাটা শুধে ফেললেন সিংজী? কেয়াবাৎ! তবে শেঠ লোক ভাল, সুদ এক পয়সা নেয় নি। বলেছে, আপনি আমাকে অনেক কাম দিয়েছেন—আপনার পাশে সুদ নিলে ধরমকে কি কৈফিয়ৎ দিবে মশা?

নরসিং বলেছিল—নামুন না আপনি শুদ্ধু। দেখিয়ে দি একবার।

আচ্ছা।—হেসেই কথাটা বলেছিল শেঠজী।

শেঠ নামলে—এখানকার মোটর কোম্পানীর সঙ্গেও নরসিং পাল্লা দিতে পারে। ইচ্ছে ছিল কথাটা আজ পাড়বে। কিন্তু এখন সেও মদ খেয়েছে। শেঠও বসেছে নেশায়, সিদ্ধি খেয়েছে বিকেলে, তারপর চরস, তারপর গাঁজা। এখন আর কথাবার্ত্তার জুৎ হবে না। বরবাদ হয়ে গেল সব।

মোটরের হেড লাইটে দেখা যাচ্ছে ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডাটা। একটা গাড়ীকে ধাক্কা মারলে কি হয়? এক শিকারী শিকারে গিয়ে বাঘ ভালুক কিছু না পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত কাক মেরেছিল গুলি করে। তেমনি ধারা নিতাইয়ের বদলে ঘোড়ার গাড়ীটাকে—। কিন্তু হাত অভ্যস্ত কৌশলে গাড়ীগুলোকে পাশে রেখে নিরাপদে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যায়।

ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা বাঁয়ে রেখে মোটর কোম্পানীর আফিস পিছনে ফেলে গাড়ী মোড় ফিরল। ওই শুখনরামের গদীর পাশে তার আস্তানা। আঃ! টর্চ্চ ফেললে কে?—কে? কে? গাছতলায় একে দাঁড়িয়ে রয়েছে? —কে? এগিয়ে গেল নরসিং।

নরসিং! চিনতে পার আমাকে?

কে ?

ইমামবাজার থানার পাশে থাকতাম আমি। পুলিসের কন্‌স্টেবলরা ভাড়া দেয় না বলে—

বাবু! ডেটিনিউবাবু! অনন্তবাবু!

চুপ কর। আস্তে কথা বল।—বাবু নিজেই এগিয়ে এলেন নরসিংয়ের খুব কাছে।

এবার মুখে হাত আড়াল করে খানিকটা সরে এসে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে নমস্কার করলে নরসিং। ভদ্রলোক হেসে বললেন—মদ খেয়েছ তার জন্য লজ্জা করতে হবে না। কাছে এস।

বলুন।

আমাকে ট্রেন ধরিয়ে দিতে হবে। সাড়ে এগারটার ডাউন ট্রেন। ভাড়া কি নেবে বল ?

সে কথার জবাব না দিয়ে নরসিং বললে—আপনার জিনিষপত্র ?

এই যা আমার সঙ্গে।

আসুন।

ভদ্রলোক কাঁধের ওয়াটারপ্রুফটা গায়ে দিলেন, মাথায় চাপিয়ে নিলেন টুপিটা। চেপে বসলেন গাড়ীতে। চলো। তারপর বললেন—তোমাকে ত বলতে হবে না। আমার এখানে আসার কথাটা যেন—

নরসিং গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে বললে—ঠিক আছে বাবু।

গাড়ী ছুটল। নরসিংয়ের নেশা নরসিংকে আজ বাঘের মত সাহস এনে দিয়েছে। হেড লাইটের আলো ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তার উপর, পোকা উড়ছে আলোর মধ্যে। দু'ধারে বন। গঙ্গার তীরভূমির আগাছার জঙ্গল। হু-হু ক'রে গাড়ী চলছে। ডেটিনিউবাবু। নরসিং জানে, ওঁদের জিজ্ঞাসা করতে নাই, কোথায় এসেছিলেন, কোথায় যাবেন—এসব কথা। দু'তিন বার পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলে সে। এও সে জানে যে পুলিশ পিছনে আসতে পারে

মোটর হাঁকিয়ে। সামনে যদি আসে তবে সে যদি পয়দলে থাকে তাকে চাপা দিয়ে চলে যাবে নরসিং।

স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে এতক্ষণে নরসিং জিজ্ঞাসা করলে—বাবু, শরীর ভাল আছে?

হ্যাঁ। পাঁচ টাকার একখানি নোট বার ক'রে বাবু নরসিংয়ের হাতে দিলেন। নরসিং নিজের ব্যাগ খুলে বার করলে একটি টাকা। বাবুর কাছে এক পয়সা ভাড়া বেশী নিতে পারবে না সে। বাবু হেসে বললেন—না, রাখ।

আজ্ঞে না বাবু, আপনার কাছে—

মিষ্টি খেয়ো, আমি দিচ্ছি। মদ খেয়ো না কিন্তু। বাবু হেসে স্টেসনে ঢুকে গেলেন।

পনেরো

এই এরা এক মানুষ। দুনিয়ার মানুষের জাতের মধ্যে এদের জাত আলাদা। দেশের মধ্যে এমন মানুষ তো সে দেখলে না, যারা এদের না ভালবাসে, না খাতির করে! পুলিশ যে পুলিশ—যারা এদের ধরে, যারা এদের আটক রাখে, তারাই কি এদের কম খাতির করে, কম ভালবাসে? পুলিশ হলেই সে খারাপ লোক হয় না, ভাল আর মন্দ নিয়ে দুনিয়া, পুলিশের মধ্যে ভালও আছে মন্দও আছে; ভাল যারা তাদের কথা ছেড়েই দেয় নরসিং; চাকরী নিয়েছে পুলিশের—ডিউটি করতেই হয়, ডিউটি ক'রেও তারা এই সব বাবুদের ভালবাসে। ছোটখাটো অনেক দোষ ঢেকে নেয়। তা ছাড়া ছোট-খাটো ব্যবহারে যে ভালবাসা দেখায় সে সব নরসিং দেখে দেখেছে। নিজের বাসার ভাল জিনিষটির একটু ভাগ এদের না দিয়ে তারা খায় না। নজরবন্দী অবস্থার বাবুরা পুলিশের কাছে যে সব আবদার করে সে সব আবদার

রাখবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। ভাললোক পুলিশের কথা বাদ দেয় নরসিং। মন্দলোক পুলিশ—যারা বাঁকা পথ ছাড়া চলে না, নিজের চাকরী আর পকেট ছাড়া কিছু জানে না—তাদেরও দেখেছে এদের খাতির করতে। এই বাবুরই একবার জ্বর হয়েছিল—বেহুঁস হয়ে গিয়েছিলেন জ্বরে। সে এক বদমাস দারোগার আমল। সেই বদমাস দারোগাকে বাবুর মাথার শিয়রে বসে থাকতে সে দেখেছে চিন্তিত মুখে। নরসিংয়ের গাড়ীতে তিনি স্পেশাল মেসেঞ্জার পাঠিয়েছিলেন সদরে—বাবুকে সদর হাসপাতালে পাঠাবার মঞ্জুরীর জন্য। নিজের কানে দারোগা বাবুকে বলতে শুনেছে নরসিং—মরে গেলেও এ সব লোক তো আক্ষেপ করবে না, কিন্তু আমি চোখে দেখব কি ক'রে? পরকালে জবাবই বা কি দোব? আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল নরসিং। এই দারোগা বাবুটিরও পরকালের ভাবনা আছে, এর মুখেও এমন কথা বা'র হয়! অনেক ভেবে দেখেছে নরসিং। শুকনো গাছে ফুল কখনও ফোটে না। কিন্তু—"হরিনামের গুণে গহন বনে মৃত তরু মুঞ্জরে।" এ সব মানুষের গুণই এই।

বাবু এল প্রথম ইমামবাজারে। ক' দিন পরেই এক হুলস্থূল কাণ্ড। ইমামবাজারের জন চারেক বাবুভাই মদ খেয়ে গরীব বোষ্টমপাড়ার মেয়েদের স্নানের পুকুরের ঘাটে নেমে হল্লা করছিল। এটা ওরা বরাবরই করত। বোষ্টমরা নিরীহ ভিখারীর জাত—হাত জোড় করে ফল পায় নাই, ভদ্র মাতব্বরদের কাছে গিয়েও কিছু হয় নাই; পুলিশের কাছে তারা যায় না—ওখানে তাদের যাওয়ার অভ্যাসই নাই কোন কালে। শেষ ওরা সব সহ্য করে যেত। বাবুরা হল্লা করে পথ দিয়ে গেলে ঘরের মধ্যে ঢুকত, ঘাটে নামলে ঘাট থেকে উঠে আসত। উঠে না যাওয়া পর্য্যন্ত ঘাটে আর নামত না। অনন্তবাবু বেরিয়েছিলেন—হঠাৎ সেদিন তাঁর নজরে পড়ল এমনি ধারা কাণ্ড। চারজনে ঘাটে নেমে মুখ ধোয়ার অছিলায় হল্লা করছে, কয়েকটি মেয়ে ভিজে কাপড়ে রাস্তার এক পাশে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, একটি মেয়ে বেশী জলে ছিল। সে উঠতে পারে নি—মাথায় ঘোমটা টেনে নীরবে একগলা

জলে সে দাঁড়িয়ে আছে। এ দেশের লোক পুরুষ পুরুষ ধ'রে যে ব্যবহার সয়ে আসছে, অনন্তবাবুর তা সহ্য হল না। তিনি গিয়ে প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু এখানকার বাবুদের ছেলে—বনগাঁয়ের রাজা শেয়ালের বাচ্চা, তার উপর মদ খেয়ে মাতোয়ারা অবস্থা—তারা একেবারে মারতে এল অনন্তবাবুকে। ব্যস—লেগে গেল লড়াই। চার শেয়াল হলে কি হবে! এ বাবুরা হল শের—মানে বাঘের জাত। অনন্তবাবু বক্সিং জানেন। ঘুষির চোটে চার জনকে তিনি 'ভানমতীর খেল' দেখিয়ে দিলেন। তারপর সে অনেক হাঙ্গামা। দরখাস্ত, মামলা করবার হুমকী—অনেক কিছু। দারোগা তখন যে ছিল, সে ছিল ভাল লোক। সে অনন্তবাবুর পক্ষ নিলে। আর বাবুর কপাল জোর—কালেক্টর ছিলেন ভারী তেজী, অল্প বয়স, তিনি এসে সমস্ত শুনে বাবুদের ছেলেদের লাঞ্ছনার বাকী রাখলেন না। পুরুষ পুরুষ ধরে যে অনাচার চলে আসছিল, ওই বাবুটি একদিনে বন্ধ ক'রে দিলেন। শুধু তাই নয়। ওই জাতভিখারী বোষ্টমদের লাঞ্ছনা সহ্য করে যে পিঠ বেঁকে গিয়েছিল, সে পিঠ সোজা করে তারা দাঁড়াল।

তারপর বাবু ক'দিনের ভেতর প্রায় গোটা গ্রামকে জয় করে ফেললেন। হোমিওপ্যাথি ওষুধ আর প্রাণখোলা হাসি আর মানুষের সঙ্গে আলাপ করার ক্ষমতা—এই তিনটি মূলধন। তবে আসল মূলধন—অন্যায় হলে তাকে রুখে দাঁড়ানোর অভ্যাস আর ক্ষমতা। নরসিংয়ের নিজের—। সামনেই একটা বাঁক ঘুরে শহরে ঢুকবার তে-মাথার মোড়। মোড়টা দেখে বিদ্যুতের মত একটা কথা মাথায় খেলে গেল। ওই তে-মাথার মোড়ে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে। হেড লাইট নিবিয়ে দিলে সে। রাম বললে—দাঁড়ালেন যে?

হুঁ। নরসিং বললে—সহরে ঢুকব না।

ঢুকবেন না?

না। পাঁচমতী চলে যাব সটান।

পাঁচমতী?

হ্যাঁ। চুপ ক'রে বসে থাক্। নরসিং গাড়ী ঘুরিয়ে—একটা কদর্য্য গেঁয়ো রাস্তা ধরে শহরকে পাশে রেখে সতর্ক মন্থর গতিতে চলতে আরম্ভ করলে। রামাকে বললে—টর্চটা জ্বেলে মাঝে মাঝে পথটা দেখে নে।

আর একটু নেশা হলে ভাল হ'ত। কিন্তু উপায় নাই। পাঁচমতীতে পৌঁছে দোস্ত স্মরেশের কাছে গাঁজার ভরসা একমাত্র ভরসা। তবে আজ নজরবন্দী বাবুকে পৌঁছে দিয়ে মেজাজটা তার ভারী খুসী হয়েছে। ভারী খুসী। সমস্ত শরীর চন-চন করছে, মাথার ভিতরটা এই বাদলার মধ্যেও ঝাঁ-ঝাঁ করছে। এই ধরনের ট্রিপ না-হলে ট্রিপ!

শ্যামনগরের এলাকা পাশে-পাশে পার হয়ে সে এসে উঠল বাদশাহী সড়কে। এইবার জ্বেলে দিলে হেড লাইট। চলো পাঁচমতী। রাতটা কাটাতে হবে দোস্ত দাসের ওখানে। তাকে বলতে হবে—লাষ্ট ট্রিপে পাঁচমতী থেকে বেরিয়ে মাইল দুয়েক গিয়েই গাড়ীর মাথা বিগড়েছিল। সেই তখন থেকে টর্চের আলোয় খুট-খাট্ খুটুর-মুটুর ক'রে সয়তানকে সোজা ক'রে পাঁচমতীতেই ফিরে এল। শ্যামনগর পর্য্যন্ত ছ' মাইলের ঝুঁকি নিতে সাহস হল না। দু মাইল পথ পাঁচমতী আর দোস্ত যখন এখানে রয়েছে তখন আর ভাবনা কি? কথাটা পাখীকে শেখানোর মত শিখিয়ে দিতে হবে রামাকে।

নরসিং আন্দাজ করতে পারে, দোস্ত স্মরেশ দাস কি রকম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে। সে বলবে—আলবৎ, জরুর। নইলে আবার দোস্তি কিসের? আমার ঘরও যা তোমার ঘরও তাই। যা ঘরে আছে একমুঠো—একমুঠোই সই, তাই তিনজনে ভাগ ক'রে খাব, একটা বিছানায় তিনজনে শোব। ব্যস।

বলেও সে উনোনে নতুন ক'রে আঁচ দেবে। ময়দা মাখবে। আলু কুটবে। বেশী উৎসাহ হলে এই রাত্রেও সে একটা বোতল অন্তত জোগাড় করে আনবে।

রামা বলে উঠল—দাদাবাবু!

নরসিং তার আগেই দেখেছে। সমস্ত শরীরে তার রোঁয়াগুলি খাড়া হয়ে

উঠেছে। গাড়ী সে মুহূর্ত্তে থামিয়ে ফেললে; হেডলাইট নিভিয়ে দিলে। দুটো প্রকাণ্ড বড় সাপ। রাস্তার দু'মাথায় পরস্পরের দিকে মুখ ক'রে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নরসিং বুঝতে পেরেছে, ব্যাপারটা কি! এই আকাশভরা মেঘের অন্ধকারের মধ্যে ঝিমিঝিমি বাদলের আমেজে ওরা খানা-ডোবার কলরবমুখর ব্যাঙেদের লোভ ভুলে আর-এক টানে এসে রাস্তার দু মাথা থেকে পরস্পরের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাম ভয় পেয়ে গেল, বললে—আলো নিভিয়ে দিলেন কেন?

কড়া আলো চোখে লাগলে ভয় খাবে। সাপের চোখে পাতা নাই।

কিন্তু—

ধ্যাৎ, বুঝতে পারছিস না, জোট খেতে এসেছে! টর্চটা জ্বাল্। দে, আমাকে দে।

অত্যন্ত সাবধানে জ্বাললে সে টর্চটা। এমন ভাবে শূন্যলোকে ফেললে আলো যেন মাটির উপর না পড়ে, অথচ তার আভায় মাটি দেখতে পাওয়া যায়। হাঁ, ওই যে! ঠিক মাঝ রাস্তায় দুটো লতার মত পরস্পরকে পাক দিয়ে জড়াজড়ি করে লেজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পড়ে গেল মাটিতে। ওই আবার জড়িয়ে নিচ্ছে। ওই উঠে দাঁড়িয়েছে ফের লেজের উপর ভর দিয়ে। এমন খেলা নরসিং আর দেখে নাই কখনও। এর আগেও সে সাপের জোটখাওয়া দেখেছে। সে দিনের বেলা আর সে সাপ ছিল ছোট। এই এমন অন্ধকার বাদলা রাত্রে ঘন জঙ্গলে দুপাশ ভরা বাদশাহী সড়কের মত জায়গায় অজগরের মত সাপ-সাপিনীর এমন পাগলের মত খেলা করা সে নয়। হিস-হিস গর্জ্জনে একেবারে মাতিয়ে তুলেছে জায়গাটা। যেমন হোক আলোর আভা পড়েছে—তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। মোটরের ইঞ্জিনটা চলছে, তার শব্দ উঠছে, পেট্রোলের ধোঁয়া ভিজে ভারী বাতাসে নীচে-নীচেই ঘুরছে—কিছুতেই গ্রাহ্য করছে না তারা। আঁ-হা-হা, ওই আবার উঠে দাঁড়িয়েছে জড়াজড়ি করে—ফণা মেলে মুখে-মুখে যেন মুখে মুখ দিয়ে তুলছে!

নরসিংয়ের সমস্ত শরীরে একটা কি বয়ে যাচ্ছে, বুকের ভিতরটা কেমন করছে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওই বিষধর, বিষধরীর লীলাতরঙ্গায়িত দেহের দিকে। কি হিল্লোল!

রাম বললে—দাদাবাবু!

খেলতে-খেলতে সাপ ছুটো পাশের জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। আর দেখা যায় না। রাম নরসিংকে ডাকলে। নরসিংয়ের এখনও যেন হুঁস হয় নাই। তার মনের মধ্যে উন্মত্ত কল্পনা চলেছে; নীলিমা আর ফটকী, ফটকী আর নীলিমা।

রাম বললে—দাদাবাবু, চলুন।

তুই চালাতে পারবি গাড়ী?

রাম চমকে উঠল। এই অন্ধকারে এই রাস্তায় তাকে গাড়ী চালাতে বলছেন দাদাবাবু? কিন্তু সে দাদাবাবুর সাকরেদ, সে কি 'না' বলতে পারে? সে বললে—আপনি পাশে বসে থাকবেন,—ভয় কি? খুব পারব।

নরসিং তাকে সিট ছেড়ে দিয়ে বললে—ঘুরিয়ে নে গাড়ী।

ঘুরিয়ে নেব?

হ্যাঁ, শ্যামনগর।

কিছুদূর এসেই নরসিং আবার তাকে বললে—সর্, ছেড়ে দে আমাকে। এমন ক'রে যেতে রাত কাবার হয়ে যাবে। এবার গাড়ী ছুটল। নরসিং পাগল হয়ে গিয়েছে।

পরণাম গিরধারী সিং, পরণাম তোমাকে, জান্‌কী জান্‌কী, মাফ করিস তুই নরসিংকে—কসম সে রাখতে পারছে না। পারবে না।

গাড়ীটাকে নিয়ে সে ঝড়ের মত এল কৃশ্চান-পাড়া ঢুকবার রাস্তার মুখে। কিন্তু এখানে এসে খানিকটা দমে গেল। নীলিমাকে এই রাত্রে সঙ্গিনী কল্পনা

করতে তার মন কেমন ভয় পাচ্ছে। অসম্ভব মনে হচ্ছে। গাড়ীটাকে নিয়ে সে আবার ফিরল। এসে দাঁড়াল শেঠের বাড়ীর এলাকায় নিজের আস্তানায়। গাড়ী থেকে নেমে সে অকারণ হর্ন দিতে লাগল।

ঘুম ভাঙবে না ফটকীর?

শেঠের সিন্দুকের মত বাড়ীটা নিস্তব্ধ। কোন সাড়া নাই।

নরসিং বাড়ীটার চারিদিকে ঘুরতে লাগল। মধ্যে মধ্যে ঢেলা তুলে বন্ধ জানালায় ছুড়ে মারতে লাগল।

রামা গাড়ী তুললে—বাঁশের দরমা দিয়ে তৈরী গ্যারেজের মধ্যে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইল দাদাবাবুর জন্য। কিন্তু দাদাবাবু ক্ষ্যাপার মত ঘুরছেই। এবার সে সাহস করে দাদাবাবুর হাত ধরে বললে—আসুন, শোবেন।

ছাড়্।

না। শেষে কেলেঙ্কারী হবে একটা। আসুন শোবেন।

নরসিং চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরেটা তার যেমন মোটরের তেলে কালিতে পেট্রোলের ধোঁয়ার তাতে জলছে—ভিতরেও তেমনি দাহ। সে আজ নিজেকে সামলাবার এক্তিয়ার হারিয়েছে।

রাম বললে—কাল। কাল আমি তাকে এনে দোব।

নরসিং একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। রাম তার হাতে ধরে ঘরে এনে কলসী থেকে জল ঢেলে মাথা ঘাড় ধুইয়া দিলে। তারপর খাবার দিলে। খাইয়ে তাকে শোয়ালে।

পরদিন সকালে উঠেই সে গেল জোসেফের বাড়ী।

নীলিমা তাকে দেখে ভুরু কুঁচকে বললে—এমন চেহারা কেন আপনার?

নরসিং রাঙা চোখে তার দিকে চেয়ে হাসলে।

নীলিমা বললে—সমস্ত রাত্রি মদ খেয়েছেন বুঝি? আপনারা—। সে ঘাড় নেড়ে বললে—ড্রাইভারী করলে তাকে এই করতেই হবে? বসুন, দাদাকে ডেকে দিচ্ছি।

সে আর তার কাছেই এল না। নরসিং দশটা বাজতেই মদের দোকানে গিয়ে উঠল। আকণ্ঠ মদ গিলে বাড়ী ফিরল। সমস্ত দিন অজ্ঞানের মত পড়ে রইল। রামা তাকে স্নান করালে, খাওয়ালে, বিছানায় শুইয়ে দিলে। সন্ধ্যেবেলা উঠে সে স্নান করে পরিপাটি করে বেশভূষা করে আবার গেল জোসেফের বাড়ী। জোসেফ মাকে ডাকলে—মিষ্টার সিংকে চা খাওয়াও মা।

নীলিমা কোথায় ?

সে গেছে পড়তে—রেভারেণ্ড ব্যানার্জ্জীর বাড়ী।

একটু চুপ ক'রে থেকে নরসিং বললে—দোকানে যাবে না ?

না। আনিয়ে রেখেছি। খাবে না কি ?

অল্প। আজ অনেক খেয়েছি।

চা থাক্ মা। জোসেফ ভেতরে নিয়ে গেল নরসিংকে।

অল্প নয়। তবে সকালের তুলনায় অল্প খেয়ে বাসায় ফিরে নরসিং বিছানায় শুয়ে পড়ল। আর দাঁড়াতে পারছে না সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

অঘোরেই ঘুমোচ্ছিল সে। হঠাৎ তীব্রতর চাঞ্চল্য এবং শিহরণ খেলে গেল তার সর্ব্বশরীরে—একটা স্পর্শের আস্বাদে। সে রক্তরাঙা চোখ মেলে চাইলে। তার বুকের উপর মাথা রেখে শুয়েছে ফট্‌কী। বাইরে মেঘ ডাকছে। রিমিঝিমি বৃষ্টি হচ্ছে। রামা ডাকলে—দাদাবাবু, উঠুন, খান কিছু।

খাবারের থালা সামনে নামিয়ে দিয়ে সে বললে—আমি গ্যারেজে গাড়ীতে শুচ্ছি গিয়ে।

নরসিং উঠে বসল। চোখের সামনে তার সাপ দুটোর খেলা করার ছবি নাচছে।

ষোল

একটা বাদলা আসন্ন। 'দেবতা মুখ নামিয়েছে কাল থেকে'—অর্থাৎ আকাশে মেঘের ঘনঘটা, কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই; এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে, মধ্যে মধ্যে ফিনফিনে বৃষ্টি আসছে; 'ধরতি'র (ধরিত্রীর) চেহারা হয়েছে যেন অভিমানিনী কালো বউয়ের মত; কালো বউটি যেন মুখ নামিয়ে বসে আছে। আকাশের গায়ে জমাটবাঁধা মেঘের কোলে কোলে হাল্কা পেঁজা তুলোর মত ঘন কালো রংয়ের মেঘ ছুটছে, আসছে, চলে যাচ্ছে, আবার আসছে, সন-সন ক'রে যাচ্ছে, কলকাতার পিচের পথে 'থার্টি-ফর্টি' মাইল স্পীডে চলে যেমন 'লাইট ইঞ্জিন'-ওয়ালা দামী গাড়ী তেমনি ভাবে চলেছে। বাতাসটা বন্ধ হয়ে একবার গুমোট ধরলেই জোর বৃষ্টি নামবে।

সাহুজীর বারান্দায় ভিজে কাপড় হাওয়ায় উড়ছে। একখানা রঙ্গিলা ছিটের শাড়ী, দু'খানা মিলের—একখানা ডুরে, একখানা খুব চওড়া কালাপেড়ে। ওরই মধ্যে দু'খানা ধুতি সরুপাড় নিয়ে মিন্‌মিন্‌ করছে। এক পাশে একখানা আধময়লা থান কাপড়। ওখানা ফটকীর কাপড়, নরসিং চিনতে পারছে। সাহুজীর চিলের ছাদের আলসের কোণে একটা কাক বসে আছে, এদিক ওদিক ঘুরছে, মাথা কাত ক'রে নিচের জিনিষ দেখছে, মধ্যে মধ্যে স্থির হয়ে গলার নরম ফ্যাকাসে পালকগুলো ফুলিয়ে বসে থাকছে। নরসিংয়ের মনেও বেড়ে আমেজ লেগেছে। সকালে এখনও আবগারীর দোকান খোলে নাই; খুললেই একবার যাবে সেখানে, একটা পাঁট অন্তত নিয়ে আসতে হবে। একটা বোতলে এক ঢোক পড়ে ছিল, সেইটুকুই খেয়ে আমেজ ক'রে ব'সে নরসিং সিগারেট ফুঁকছে। একটা পাঁট আর আধ সের মাংস, তার সঙ্গে চালে ডালে খিঁচুড়ি। ভাবছে, ছাগল ভেড়ার মাংস না এনে একটা হাঁস আনবে কি না? হাঁস আনলে হাঙ্গামা আছে—পালক ছাড়ানো, কাটাকুটি করা, নাড়ীভুঁড়ি ঘাঁটা, এগুলি হাঙ্গামা তো বটেই, তার উপর নরসিংয়ের গা ঘিনঘিন করে।

গ্রিজ, মবিল, পেট্রোল, গাড়ীর তেল-কালি নাড়তে নরসিংয়ের গা ঘিনঘিন করে না, কিন্তু এই সব নাড়ী ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারে না সে। রামা থাকলে ভাবনা ছিল না, সে-ই সব করত। রামা নাই, আজ সাত-আট দিন হ'ল বাড়ী গিয়েছে। বাড়ী তো হতভাগার চুলোয়, গিয়েছে ইমামবাজার, সেই নেকড়ানী পিসী—নরসিংয়ের মামীর কাছে। ফিরবার পথে গিরবরজ্ হয়ে ফিরবে বলে গিয়েছে।

মাস খানেকের কাছাকাছি আজ শ্যামনগর-পাঁচমতী সার্ভিস বন্ধ। বাদশাহী সড়ক কাদায় জলে খানা-খন্দকে ভরে উঠেছে—গাঁওল-গাঁয়ের গরু-মহিষ-চলা গোপথকেও হার মানিয়েছে। ভাড়াটে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানগুলো এখন লাফাচ্ছে—লম্বা লম্বা বাত্ বলছে। তাও সে দিন বড় বৃষ্টিটার পর তিন দিন ওরাও ওপথে হাঁটতে সাহস করে নাই। গত বছর নাকি একটা বড় কাদায় একখানা গাড়ী পড়ে যাওয়ার ফলে একটা বলদ একদম ঘায়েল হয়ে গিয়েছিল, শেষ পর্য্যন্ত কসাইখানার পাইকারকে বেচে দিতে হয়েছে। ঘোড়ার গাড়ীর পক্ষীরাজগুলো কিন্তু বেঁচেছে কিছুদিনের জন্য। চারিদিকে এখন দল-দাম-ঘাসের সমারোহ, সামনের পা দুটোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে কোচমানেরা তাদের ছুটি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে; বেটারা সব খুব খাচ্ছে। হাড়পাঁজরা-সার ঝুরঝুরে চেহারাগুলো এরই মধ্যে একটু আধটু চেকনাই মেরেছে যেন। ইমামবাজার থেকে সদর শহরের সড়কের পাশে কাঁকুরে মরুভূমির মত ডাঙায় বর্ষার সময় কচি কচি পাতলা ঘাস বেরিয়ে ফিকে সবুজ হয়ে ওঠার কথাও মনে পড়ে নরসিংয়ের।

এক সারি গরুর গাড়ী আসছে, হুই উঁচু করে কাঠ বোঝাই করেছে। গঙ্গার তীর—অফুরন্ত জঙ্গল কাটছে, বোঝাই ক'রে নিয়ে আসছে। তা আসুক; কিন্তু রাস্তার দফারফা করে দিলে উল্লুক গাঁইয়ার দল। ওদের দেখলে গা জ্বলে যায় নরসিংয়ের। নরসিংয়ের এক এক সময়ে ইচ্ছে হয়,

প্যাসেঞ্জার সার্ভিস তুলে দিয়ে মাল-বওয়ার সার্ভিস খোলে, কার বিক্রী ক'রে দিয়ে ট্রাক কেনে। জবরদস্ত ইণ্টারন্তাশানাল ট্রাক। না না। মফস্বলে চলবে না ইণ্টারন্তাশানাল মহাপ্রভু। চোরাবালিতে হাতী বসে যাবে। হালকা মজবুত ট্রাক চাই। নানান ধরনের গাড়ীর কথা মনে হয়। হঠাৎ চকিত হয়ে উঠল নরসিং। গাড়ীর সারির পাশে পাশে—ছাতা মাথায় দিয়ে লোকটা কে? থানার সিপাহী মনে হয় যেন! মুখ দেখা যাচ্ছে না, পায়ের জুতো জোড়াটা ভোঁতা নাগরা, কাপড় সেঁটে লেগে রয়েছে পায়ের সঙ্গে, হাঁটুর নিচে অবধি নেমেছে কোন রকমে; গায়ের পা[illegible] বগলের কাছে তিনটে সেলাই রয়েছে যেন। তা ছাড়া এমন তুলে তুলে চলা তো যার গরব নাই, গরম নাই তার সম্ভবপর নয়। গরব আর গরম তো পুলিশের একচেটিয়া।

হাঁ ঠিক। চামোরী সিং সিপাহী। নরসিংয়ের ভুল হয় নাই। সকাল বেলায় চামোরী সিং কোথায় চলেছে! বুকটা তার ধ্বক ক'রে উঠল। মাসেক খানেকের ক'দিন বেশীই হবে—রাত্রের অন্ধকারে সে ডেটিনিউবাবুকে পৌঁছে দিয়ে এসেছে, কথাটা তার মনে পড়ে গেল। নড়ে-চড়ে বসল নরসিং। খবর পেয়েছে না কি?

বেইমান ছোটলোকের বাচ্চা নিতাই! ওই শূয়োর-কি বাচ্চারই কাজ নিশ্চয়! সে দিন বেটা চুকলামি করতে এসেছিল। এসে রামাকে বলেছিল; তার সঙ্গে কথা বলতে সাহস হয় নাই। বেঁচে গিয়েছে হারামজাদ নিমকহারাম। নরসিংকে বলতে এলে, থাপ্পড় লাগাত তাকে নরসিং। হারামজাদ নিমকহারাম! দুনিয়াতে কুত্তা যে কুত্তা—সেও কখনও বেইমানী করে না। নিমকহারামী করে না। শুধু কুত্তা কেন, কোন জানোয়ারই নিমকহারাম নয়। গরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, মহিষ মনিবকে কখনও ভুলে যায় না। মনিব বিক্রী করে, জানোয়ার যেতে চায় না সে বাড়ী থেকে, চীৎকার করে, মাথা নাড়ে, জোর ক'রে বেঁধে নিয়ে গেলে কাঁদে—চোখ দিয়ে জল পড়ে।

আর মানুষকে একটুকরো এঁটো রুটি বেশি দাও, বাস্! তোমার নিমক ভুলে তার গোলাম হয়ে যাবে।

নিতাই রামাকে বলেছিল—গুরুজীর ছামনে যেতে আমার ডর লাগছে ভাই। তু বলিস গুরুজীকে। খুব পেরাইভেটে বলে যেলাম তোকে। পুলিশ বোধ হয় পিছু লেগেছে গুরুজীর।

পুলিশ এসেছিল তার মনিবের কাছে। অনন্তবাবু ডেটিনিউ এখানে এসেছিল, সে খবর পুলিশ পেয়েছে। নিতাইয়ের বাবুর এক ভাগ্নের কাছেই এসেছিল বলে তাদের বিশ্বাস। পুলিশের ধারণা রাত্রের মোটরবাসে এসেছিল অনন্তবাবু। কিন্তু কোথায় কোন্‌দিকে সে চলে গেল সে খবর তারা পাচ্ছে না। তারা জিজ্ঞাসা করেছিল নিতাইকে—বাবুর মোটরে ক'রে সে বাবুকে পৌঁছে দিয়ে এসেছে কি না? নিতাই সত্য কথাই বলেছে। গাড়ীর চাবি থাকে বাবুর কাছে। বাবুর হুকুম ছাড়া সে যাবে কি করে? নিতাইয়ের বাবুকে তারা অবিশ্বাস করে না। বাবু আংরেজ সরকারের খয়ের-খাঁ। রায়বাহাদুর খেতাব পাওয়ার লোভে কুকুরের মত জিভ দিয়ে জল পড়ে। সাহেবদের খানা খাওয়ায়, তাদের হুকুমে চাঁদা দেয়, তাদের হুকুমে নাচে। সত্যি সত্যি নাচে। একজন সাহেব এসে নাচিয়ে গেছে তাদের। ঢুলিতে ঢোল বাজাত—বাবুরা সব নাচত। বাবুর কথায় বিশ্বাস ক'রে তারা নিতাইকে রেহাই দিয়ে ফিরে গিয়েছে। নিতাইয়ের কিন্তু আশঙ্কা হয়েছে নরসিংয়ের জন্য। তাই সে বলতে এসেছিল রামকে। আসল কথা, নিতাই-ই অনন্তবাবুকে নরসিংয়ের সন্ধান দিয়েছিল। বাবুর ভাগ্নের কাছেই এসেছিল অনন্তবাবু। হঠাৎ দেখা হয় নিতাইয়ের সঙ্গে। নিতাই-ই তাকে নরসিংয়ের আস্তানার কাছে গাছতলায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

শালা! এ জানলে—নরসিং কখনও—। না—না—না। অনন্তবাবুকে 'না' বলতে পারবে না। দেশের জন্য যে বাবুরা ফাঁসী যায়, জেল খাটে, নজরবন্দী হয়ে থাকে—তাদের কি কখনও কেউ 'না' বলতে পারে? তাদের ভাইবেরাদার

—যত মোটর ড্রাইভারকে সে জানে তারা কেউ 'না' বলে না। ও-জেলার সদরে মোটরসার্ভিস কোম্পানীর মালিক দুর্দান্ত বুধাবাবু—সরকারের খয়েরখাঁ, পুলিশের দোস্ত। তার সার্ভিসের ড্রাইভারেরাও চৈতা স্বদেশীবাবুদের এমন কত সাহায্য করে। বুধাবাবু জানতেও পারে না। অনন্তবাবু শুধু স্বদেশীবাবুই নয়, বাবু তার যে উপকার করেছেন সে কথা নরসিংহ ভুলতে পারে না। ইমামবাজারে এসেছিল এক বদলোক দারোগা—তার আমলে পুলিশ বিনা-ভাড়ায় যাওয়া আসা করত, আবার জবরদস্তি ক'রে চোখ রাঙাত। সমস্ত শুনে একদিন অনন্তবাবু দরখাস্ত দিলে উপরে, গেজেটে ছাপিয়ে দিলে। বাস্, সব ঠাণ্ডা। এর ফলে নরসিংকে একদিন একটা তুচ্ছ কারণে থানায় ডেকে তাকে অপমান-লাঞ্ছনা করবার উদ্যোগ করেছিল দারোগা-জমাদার-কনেষ্টবলেরা। থানার পাশেই ছিল ডেটিনিউবাবুদের বাসা। অনন্তবাবু হাসতে হাসতে এসে বসলেন থানায়, বললেন—হিতোপদেশের গল্পের অভিনয় হচ্ছে বুঝি? দেখতে এলাম তাই। তারপর বললেন—সেই গল্পটা নিশ্চয়। নেকড়ে ও মেষশাবক। সঙ্গে সঙ্গে ছাড়া পেয়েছিল নরসিং। সে কথা কি ভুলতে পারে নরসিং?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। চামোরী সিং এসে সাহুজীর গদীর সামনেই দাঁড়াক। আসুক চামোরী সিং—নরসিং ঠিক আছে। সে পথ সে বন্ধ ক'রে রেখেছে। বাবুকে পৌঁছে দিয়ে শ্যামনগর ঢুকবার মুখে কথাটা তার হঠাৎ মনে হয়েছিল—সে শ্যামনগরের বাজারে ঢুকবার পথ ছেড়ে শ্যামনগরকে পাশে রেখে একেবারে সেই ঝাড়ুদার ডোমপাড়ার ওপার দিয়ে একটা ভাঙাচোরা পথ ধরে বাদসাহী সড়কে উঠে সটান পাঁচমতী যাবার মতলব করেছিল; কিন্তু সেই সাপ দুটো—সাপ আর সাপিনী তাকে যাদুতে ভুলিয়ে ফিরে পাঠালে শ্যামনগর। তার জন্য তার আফশোষ নাই, তবে সেদিন পাঁচমতী গেলেই ভাল হ'ত। তবে পথ সে বন্ধ করে রেখেছে। সুরেশ দাসকে সকল কথা ব'লে অনুরোধ করেছে যে, এনকোয়ারী হ'লে তাকে বলতে হবে—সে রাত্রে নরসিং পাঁচমতীতে সুরেশের দোকানে ছিল। সুরেশ বিশ্বাসযোগ্য লোক। দোস্ত বললে—সে নিজের

প্রাণ দিয়ে তাকে বিপদ আপদে রক্ষা করবে। রামাও হুঁসিয়ার ছত্রির ছেলে। সুতরাং ভয় তেমন নাই। কিন্তু হঠাৎ পুলিশ দেখলেই চম্‌কে ওঠাটা এখনও যায় নাই। 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা' আবার কোথা দিয়ে কি ভাবে কোন্ সুতো যে টেনে বার করবে কে জানে! আজ সে আশঙ্কা ফ'লে গেল। খুব জোরে সিগারেট টানতে লাগল সে।

এ—সিং, এ ডেরাইবর সাব! চামোরী সিং তার নাম ধরেই ডাকছে। উত্তর দিতে গিয়ে গলায় আওয়াজ আটকে গেল নরসিংয়ের। আই-বি অপিসের গল্প শুনেছে সে অনেক। ভয়ঙ্কর গল্প।

এ নরসিং—সিং!

কোনমতে নরসিং আবার জবাব দিলে—কে?

আরে বাহার আসো মশা।

নরসিংয়ের পা কাঁপছে। বোতলগুলো বেবাক খালি।

কলসী থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে এক গেলাস জল খেয়ে নিয়ে সে বাইরে এল।

চামোরী সিং বললে—আজ তিন বজে কালেক্টর সাব আইবন, ডিস্টিক্ট বোডকে চেয়ারম্যান আইবন। পাঁচমতী সড়ককে লিয়ে দরখাস্ হইয়েছে, ইনকুয়ারী হোবে। তুমার পর হাজির হোনেসে হুকুম হইয়েছে।

মুহূর্তের মধ্যে নরসিং কেমন হয়ে গেল। এমন আকস্মিকভাবে এক মুহূর্তে ভয়ের শ্বাসরোধী অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে অভাবনীয় আনন্দের মধ্যে সে জীবনে কখনও আসে নাই।

চামোরী সাহুজীকে হাঁকতে লাগল। সাহুজীকে কেন? চামোরী বললে—দরখাস করনেওয়ালাদের মধ্যে সাহুজীও একজন। উনকে বোল দেনা ভাইয়া।

আলবৎ আলবৎ। জরুর—জরুর বোলেঙ্গে। সাথমে লে যায়েঙ্গে।

চামোরী সিং চলে গেল। নরসিং নিজের ঘরের মধ্যে এসে কি করবে ভেবে পেলে না। অথচ এই আনন্দের উচ্ছ্বাসটা প্রকাশ না ক'রে সে কোনমতেই স্থির থাকতে পারছে না। ফটকীকে এখন পাবার উপায় নাই। জোসেফের

বাড়ী যাবে? জোসেফ আছে, মেরী নীলিমা আছে। চা খাওয়াবে মেরী নীলিমা। জোসেভ মদ খাওয়াতে পারে।

'পাঁচমতী সড়ককে লিয়ে দরখাস্ হইয়েছে।'—দরখাস্তের কথা সে জানে, সেই তার উক্তোক্তা। কিন্তু দরখাস্তে ফল হবে এমন প্রত্যাশা সে করে নাই। কিন্তু লেগেছে দরখাস্ত। বাস্—। ঢেলে দাও পাথর—দাও বিছিয়ে ছ ইঞ্চি পুরু ক'রে। তার উপর দাও মোরাম লাল কাঁকর। চালিয়ে দাও রোলার। বাস্—উঁ—উঁ—উঁ—ভর—র—র—র—উঁ—উঁ—উঁ। ভোঁ—ভোঁ—ভোঁপ। সোজা ষ্টীয়ারিং ধরে একসিলেটরে পা চেপে বসে থাক; ছুটুক গাড়ী বিশ-পঁচিশ মাইল স্পীডে, ঘুরুক পাক দিয়ে চারিপাশের বন জঙ্গল মাঠ, নেহাৎ পাশের গাছগুলো সড়াক সড়াক ক'রে পিছনে ছুটে চলে যাওয়ার মত—পিছনে পড়ে থাক্। আনন্দের সঙ্গে অকারণ অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে নরসিং একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে মাথা পিছনের দিকে হেলিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জোসেফের বাড়ীর দিকে চলল।

তু'খানা ট্যাক্সী—না, একখানাকে বদলে একখানা বাস্। তারপর একখানা কার—ট্যাক্সি—তারপর একখানা ট্রাক। জোসেফকে একের তিন অংশ। এ দিলেও কি মেরী নীলিমাকে পাওয়া যাবে না? ওরা কৃশ্চান। হলই বা। নরসিং জাত মানে না। নরসিংয়ের জাত অনেক দিন মরে গিয়েছে। নিতাইয়ের সঙ্গে খেয়েছে, রহমানের সঙ্গে খেয়েছে, জোসেফের সঙ্গে খেয়েছে, তার আবার জাত! জাত তার নাই—তার থাকবার মধ্যে যা আছে সে তার পেট আর তার 'মটরোয়া' ট্যাক্সি কার, আর যদি তোমাকে পায় তবে ক্—। ফিন্‌ফিন্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে মুখে চোখে, বাতাসে লম্বা চুলগুলি উড়ছে, জামা কাপড় ভিজছে। ভিজুক।

* * *

আগে পাঁচমতীর সড়ক নিয়ে দরখাস্ত ছিল মামুলী ব্যাপার। সেই যে-কাল থেকে ডিষ্ট্রিক বোর্ডের পত্তন হয়েছে সেই কাল থেকে সড়কটার জন্য

প্রতি বৎসর একখানা, কোন বাবু বা তিন-চারখানা। আগে আগে দরখাস্ত করতেন বাবু লোকেরা—জমিদার উকীল কেলাসের বাবুরা, জমিদারের মামলা-মকদ্দমার জন্য তাঁদের নিজেদের যাওয়া-আসার অসুবিধা হ'ত, মধ্যে মধ্যে নিজেদের যেতে হ'ত, উকীলবাবুরা শনিবার বাড়ী আসতেন, তাঁদের অসুবিধা হ'ত। শ্যামনগরে আদালত যে-কাল থেকে বসেছে সেই কাল থেকেই পাচমতী থেকে আদালতের আমলা সরবরাহ হয়ে আসছে। তারা অবশ্য হেঁটে যাওয়া-আসা করত, তারা দরখাস্তে সই করত না। তখন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, রাজপ্রতিনিধি দণ্ডমুণ্ডের মালিক, সরকারী কেরানীদের অন্নদাতা জ্যেষ্ঠ পুত্রের সামিল। সুতরাং দরখাস্তে সই ক'রে তাঁর রোষ নয়নে পড়তেও চাইত না এবং নিমক খেয়ে নিমকহারামীর পাপ থেকেও পরিত্রাণ পেত। দরখাস্তের ফলে খানা-খন্দক বুজিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি ফেলা হ'ত, কাদা হ'ত এক হাঁটু। এক ইঞ্জিনিয়ার কাদার মধ্যে গাছের ডাল কেটে দেবার ব্যবস্থা ক'রে মগজের পরিচয় দিয়েছিলেন। তারপর কাল পাল্টাল; গঙ্গার ধারে রেল-লাইন পড়ল, ঘাটরোড স্টেশনে নেমে শ্যামনগর হয়ে এ অঞ্চলে যাওয়া-আসার যাত্রীর সংখ্যা বাড়ল, ওদিকে ঘোড়ার গাড়ী-ওয়ালারা এল ভিড় ক'রে। তখন ঘোড়ার গাড়ীর নাম ছিল 'কেরাচী'। সাইকেল উঠল। দেখতে দেখতে বছর দশেকের মধ্যে সাইকেল পাঁচমতী-শ্যামনগর ছেয়ে গেল, পাড়াগাঁয়েও দু'চারখানা ঢুকল। কয়লা, কেরোসিন তেল, কলের লণ্ঠন, কাচের চুড়ি, চা আর সাইকেল—এ কয়েক দফা দেশে এল যেন বর্ষার বন্যার মত। এসেই দেশ ছেয়ে ফেললে। দুশো আড়াইশো থেকে দেখতে দেখতে একশো—আশি—পঞ্চাশ, আজ তো জাপানী সাইকেল তিরিশ টাকায় পাওয়া যায়; রঙ-চটা, কট কট শব্দ ক'রে চলে এমন পুরানো সাইকেল পনের টাকা। দশ টাকাতেও পাওয়া যায়। লটারী তো লেগেই আছে—এক টাকা টিকিট। কেরানী বাবুরা প্রায় সবাই একখানা ক'রে সাইকেল কিনে ফেললে। তারপর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হ'ল নন-অফিসিয়াল

চেয়ারম্যান। এবার কেরানীবাবুরাও দরখাস্ত দিতে শুরু করলেন। ক্রমে পল্লীগ্রাম থেকেও দরখাস্ত পড়তে আরম্ভ হ'ল। দরখাস্ত বাড়ল, কিন্তু রাস্তায় মাটি কমলো। লোকে বলে—চুরি। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বলে, চুরি করবে কি? টাকা কোথায়? জেলায় রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য হিসেব ক'রে দেখা যায়—বাংলার জেলাগুলির মধ্যে তৃতীয় কি চতুর্থ, কিন্তু আয়ের হিসাব করলে তালিকার প্রায় শেষে এসে পড়ে। আমরা কি করব? প্রশ্ন ওঠে, অফিসিয়াল চেয়ারম্যান থাকতে যে মাটিটা পড়ত তা আসত কোথা থেকে? উত্তর আসে, আমরা ধনীর মুখের দিকেই তাকাই না, ধনীর নিয়ে দরিদ্রের কল্যাণ করাই আমাদের ব্রত, কয়েকটা বড় রাস্তার উপর নজর না দিয়ে আমরা পল্লী-উন্নয়ন করছি। যা হোক, এতই যখন চীৎকার উঠছে তখন এক শত টাকা বেশি বরাদ্দ হ'ল।

এমনি ভাবেই চলছিল। এমন সময় দেশে এল মোটর-বাস। কলকাতা থেকে বাইরে আসতে আরম্ভ করলে। এখানে শ্যামনগর থেকে ঘাটরোড স্টেশন পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা, সেখানে মোটর বাস সার্ভিস হ'ল। প্রথম প্রথম উকিলবাবুর বেকার ছেলে, মদ্যব্যবসায়ী সাহাদের আধুনিক ছেলে পুরানো কার নিয়ে ট্যাক্সি চালাতে আরম্ভ করলে। তারপর একজন কাপড়ের দোকানদার করলে প্রথম বাস। তারপর হ'ল আরও খান দুয়েক। তার পরই এল এই কোম্পানী, যাদের বাস সার্ভিস এখন চলছে ঘাটরোড থেকে শ্যামনগর। ঘোড়ার গাড়ীগুলো হার মেনে ঘাটরোড ছেড়ে পাঁচমতীর দিকে মোড় ফেরালে। এবার বাবুরা যাঁরা কাজের জন্যে শ্যামনগর থাকতেন তাঁরা ডেলিপ্যাসেঞ্জারী আরম্ভ করলেন। লোকের যাতায়াতও বাড়ল। জমিদারেরা, বাবুরা, ব্যবসাদারেরা যাঁরা পাল্কী অথবা গরুর গাড়ী চড়ার ভয়ে যথাসম্ভব কম যাতায়াত করতেন তাঁরা 'কেরাচী' গাড়ীর সুযোগ পেয়ে বাড়ীতে খেয়ে-দেয়ে শ্যামনগরে এসে কাজ-কর্ম্ম নিজে দেখে-শুনে সেরে সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরতেন। গ্রামের লোকেরাও কেরাচী গাড়ীতে আট আনা পয়সা দিয়ে যেতে আরম্ভ করলে। এবার দরখাস্ত ছাড়াও খবরের কাগজে মধ্যে মধ্যে ছাপা

হতে আরম্ভ হ'ল—'শ্যামনগর-পাঁচমতী রাস্তার দুরবস্থা'। অফিসার সাহেবদের তখন মোটর হয়েছে। তাঁদের মোটরে ধূলো কাদা লাগায়, কখনও-সখনও অ্যাকসেল ভাঙায়, তাঁরাও নোট দিতে আরম্ভ করলেন। এবার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড চঞ্চল হ'ল খানিকটা। একশোর জায়গায় সাময়িক বরাদ্দ দুশো-আড়াইশোতে উঠে গেল। এই ভাবেই চলে আসছিল, এবার নরসিং এসে ট্যাক্সি সার্ভিস খুলে গোলযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে। এবার দরখাস্তের জোর খুব। এতখানি নরসিং প্রত্যাশা করতে পারে নি। নরসিং নিজের অদৃষ্ট সম্পর্কে আস্থাবান হয়ে উঠল ক্রমশ। সময় তার ভাল এসেছে। নইলে এই সময়টিতেই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড মোটর-কোম্পানী থেকে মোটরের রাস্তার উন্নতির জন্যে টাকা পাবে কেন? অদ্ভুত যোগাযোগ! আমেরিকায় যারা মোটর তৈরী করে, তারা অনেক টাকা দিয়েছে ভারতবর্ষে মোটরের রাস্তার উন্নতির জন্য। সে অনেক টাকা—একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি। সেই লক্ষ নিযুত অর্থাৎ অনেক লক্ষ টাকা এখানকার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড পেয়েছে। দরখাস্ত এবং টাকা—দুয়ের যেখানে মিল হয়েছে সেখানে ভাবনা কোথায়?

* * *

জোসেফদের একদফা চায়ের আসর উঠে গিয়েছিল। সাধারণত বাসি রুটির সঙ্গে হাঁসের ডিম আর একটু চিনি সহযোগে প্রাতরাশ হয়ে থাকে; দুখানা করে রুটি জনপ্রতি বাঁধা বরাদ্দ। রাত্রে জোসেফ রুটি খায়। ক্রিশ্চান হয়ে অবধি ওদের সংসারে এই বিধিটা চলে আসছে। পুরুষেরা রাত্রে রুটি খায়—আটার রুটি। পাঁউরুটি রবিবার ছাড়া খাওয়া যায় না, তার উপর নিত্যব্যবহারে খরচও কিছু বেশি পড়ে, তাই দেশী রুটিতেই ভাত-বর্জ্জনের কাজটা সারতে হয়। ক্রিশ্চান হওয়ার দ্বিতীয় পুরুষে অর্থাৎ জোসেফের পিতামহ দুবেলাই রুটি চালিয়েছিল নবীন অনুরাগে। কথাটা উপহাসের নয়। ক্রিশ্চান হয়ে এই পরিবারটি দ্বিতীয় পুরুষে অতি স্বাভাবিক নিয়মে, অতি উগ্রভাবে এ দেশীয় খাদ্য-পোশাক-ভাষা সব বর্জ্জন করে—এ দেশের লোকদের

থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র পৃথক হতে চেষ্টা করেছিল। অন্তর বাইরে দু দিকে দিয়েই সে চেষ্টা স্বাভাবিক নিয়মে চলেছিল। বাইবেল সযত্নে তোলা থাকত; ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে এবং গীর্জ্জায় ফাদারের প্রার্থনা শুনে যথাশক্তি আধ্যাত্মিক দিকটা পরিপুষ্ট করত। সেই পুরাতন খাদ্যাখাদ্য বর্জ্জন করে নূতন-ধর্ম্ম-অনুমোদিত খাদ্য গ্রহণের প্রচেষ্টায় বাড়ীতে পাঁউরুটির ব্যবস্থা হয় প্রথম; তারপর ক্রমে আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এবং পাঁউরুটির দুষ্প্রাপ্যতার বদলে দেশী রুটির ব্যবস্থা হয়। মেয়েদের কিন্তু ভাত ভিন্ন তৃপ্তি হ'ত না, রুটি তাদের বরদাস্ত হ'ত না। বাংলাদেশে হাড়ি ডোম বাউরী প্রভৃতিদের মধ্যে আজও শূকরপালনের রেওয়াজ আছে, শূকর মুরগী হাঁস তাদের জীবিকার একটা প্রধান উপায়; শূকর-মাংসও তারা খায়। খাদ্যের দিক দিয়ে হ্যাম-ফাউল-ডাকে তাদের অসুবিধে হয় নি; ক্রিশ্চান হয়ে বীফ্ ধরেছিল। প্রথম-পুরুষে বীফে মেয়েদের ঘৃণা হ'ত; দ্বিতীয় পুরুষে সেটা অবশ্য সয়ে গিয়েছে। তৃতীয় পুরুষ থেকে তারা খাঁটি ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চানে পরিণতি লাভ করেছে। একবেলা ভাত একবেলা রুটি—সুক্তো-চচ্চড়ীর সঙ্গে রাই সরষের গুঁড়ো—সপ্তাহে তিনবার মাছ—দু-তিন দিন মাংসের বিলিতি রান্নার রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছে। মেয়েরা কয়েকদিন দু বেলাই ভাত খায়, দু-তিন দিন—ওই মাংস যে কয়েক দিন হয়—সেই কয়েক দিন খায় রুটি। সদর শহরে যাওয়া-আসার সুযোগ হ'লে পাঁউরুটি আসে, সেদিন একটা মুরগী অথবা হাঁস মেরে রান্না হয়। পার্ব্বণ ইত্যাদিতে সমারোহে বিলিতী রান্না চলে—মুরগী হাঁস পাঁউরুটি—তার সঙ্গে মেয়েরা বাড়ীতে তৈরী করে স্যাণ্ডউইচ, কেক, পুডিং। মুরগী চালান যায় এ অঞ্চল থেকে, তাই মুরগীর ডিম বেশী খাওয়া হয় না, হাঁসের ডিমটা সকালবেলায় প্রাতরাশে ব্যবহার করে।

সকালে জোসেফ চা খায় বিছানায় শুয়ে। জোসেফের মা পাকা গৃহিণী। নীলিমার ঝোঁক রাত্রে রুটির দিকে হ'লেও তার ঝোঁকে ভাত খেতেই বাধ্য হয়

নীলিমা। নীলিমার মা মানুষ হিসাবে অত্যন্ত স্থূল—সে আকারেও বটে প্রকারেও বটে। নীলিমা ম্যাট্রিক পাস ক'রে সব দিক দিয়ে সূক্ষ্ম হতে চেষ্টা ক'রে, প্রায়ই সে কেক তৈরী করে; নীলিমার মা আপত্তি ক'রে হার মানলেও সেগুলিকে যথাসম্ভব বাসি না ক'রে খেতে দেয় না। কাচের জারে পুরে চাবী দিয়ে রেখে দেয়। পাঁউরুটি আনলে তাও লুকিয়ে রাখে, অন্ততঃ পাঁচ দিনের আগে খেতে দেয় না। নীলিমা তাগিদ না দিলে মধ্যে মধ্যে দু-একখানা পাঁউরুটি দশ-পনেরো দিনে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়—ফেলে দিতে হয়।

জোসেফের মা প্রথম দিন নরসিংকে অভ্যর্থনা করেছেন অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে। গির্‌বরজার ছত্রি সিংহরায়দের গল্প তার স্বামীর সংসারে তিন পুরুষের রঙ-ধরানো গল্প। সে দিন নরসিং ছিল তার কাছে সেই গল্পের দেশের মানুষ। তারপর ব্যবহারিক জগতের মেলামেশার মধ্যে নরসিং যখন নিতান্তই সাধারণ মানুষ বলে চোখে ঠেকল, তখন তার সম্ভ্রম উবে গিয়ে তার স্থানে জন্মাল সর্ব্বস্বান্ত মূর্খ বড়লোকের ছেলের উপর সাধারণ মানুষের যে আনন্দদায়ক উপেক্ষা এবং ঘৃণার মনোভাব—সেই মনোভাব। সেই মনোভাব আরও প্রখর হয়ে উঠেছিল নরসিংয়ের সঙ্গে নীলিমার হৃদ্যতার অভিব্যক্তিতে। নরসিংয়ের গাড়ীতে সে ইস্কুলে যায়, নরসিং এলে সে হেসে কথা কয়, চা তৈরী ক'রে দেয়—এটা তার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিজনক হয়ে উঠেছিল। আজ শ্যামনগর-পাঁচমতী রাস্তা পাকা হচ্ছে এবং সেই রাস্তায় একখানা মোটর বাস, একখানা ট্যাক্সি, একখানা ট্রাক নিয়ে ব্যবসার পরিকল্পনা এবং সেই ব্যবসায়ে জোসেফের মাকে অন্তত একের-তিন অংশ দিতে চাওয়ার প্রস্তাবে জোসেফের মা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে উঠল। অন্যদিন সে ভদ্রতার খাতিরে তার বিরক্তি নরসিংয়ের সামনে প্রকাশ করে না বটে, কিন্তু অবিরত চেষ্টা করে মেয়েকে আড়াল ক'রে ফিরতে।

আজ সে মেয়ের সামনেটা ছেড়ে দিয়ে বারান্দায় একটা মোড়ায় ব'সে পায়ের গাঁট টিপতে আরম্ভ করলে। বোধ হয় আজকার এই সামনে ছেড়ে

দেওয়াটা তার নিজের কাছেই অশোভন ঠেকছিল ব'লে—গাঁটের সামান্য ব্যথাটা হঠাৎ রাত্রি থেকে বেড়ে উঠেছে, এই ছলনার আশ্রয় করলে। কথাটা প্রকাশ না ক'রে বললে—পাছে পা টেপার অভিনয়টা বোধগম্য না হয় এই ভেবে জোসেফ ও নরসিংয়ের কথার মধ্যেই সে ব্যাঘাত দিয়ে বললে—তোমাদের তো পাঁচমতীর রাস্তা পাকা হচ্ছে, মোটর চালাবে আরামসে, রোজগার করবে। আমি কিন্তু ওই কালীঠাকুরের থান যাবার রাস্তাটার জন্যে একটা দরখাস্ত করব। দিবি তো নীলি আমার একটা দরখাস্ত লিখে। উঃ বাবা—বাতের ব্যথায় মরে গেলাম। যত বেতো রুগীদের নিয়ে দরখাস্ত সই করাব আমি। বলে সে হি-হি ক'রে হেসে উঠল।

নীলি খুব চতুর মেয়ে। বয়স হলে অবশ্য সকল মেয়ের মনেই অন্তত এ দিক দিয়ে কিছু চতুরতা স্বাভাবিকভাবেই জন্মায় এবং বয়স্কদের কাছ থেকে শেখে—নারী জীবনেরই এটা ঐতিহ্য; নীলি এ সব বিষয়ে বিশেষ চতুরতা শিক্ষা পেয়েছে তার সহকর্মিনী অর্থাৎ মিশনের গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের কাছে। মনোবিদ্যার যুগ এটা—মনের খবর নিয়ে এ যুগের সভ্যতা-সম্মত বাঁকা এবং চোখা বাক্যবিন্যাসের মধ্য দিয়ে তাদের যে মনোবিলাস চলে সে বিলাস সদ্য তরুণী নীলির খুবই ভাল লাগে। এগুলি সে শোনে না—গেলে। গেলা-জিনিস সে হজম করেছে। মায়ের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফিক ক'রে হেসে ফেললে নীলি।

বাঁকা দৃষ্টি এবং মুচকি হাসির ওজন কম কিন্তু ধার বেশি; ব্লেডের মত দাগ টানলেই গভীর ক্ষত হয়ে যায়। মায়ের মনে লাগল। মা বলে উঠল—ওই হাসি দেখতে পারি না। দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

চোখ বন্ধ ক'রে পা টেপ না কেন। আরামটা ভোগ করতে পারবে বেশি। এ হাসিও দেখতে হবে না।—নীলিমা আবার তেমনি ভাবে তাকিয়ে তেমনি হেসে উত্তর দিলে।

মা এবার চীৎকার ক'রে উঠল—হে ভগবান, আমার মরণ হোক—আমার

মরণ হোক, আমার মরণ হোক। আমাকে নাও তুমি—আমাকে নাও। দয়া নাই—মায়া নাই—আমি বাতে মারা যাচ্ছি—আমার—। এর পর আর কি বলবে ভেবে না পেয়ে সে হাঁউ হাঁউ ক'রে কাঁদতে লাগল। কান্নাটা অবশ্যই অভিনয় নয়—মেয়ের ওই ধারালো আঘাতের যন্ত্রণা যত না হোক তার উপযুক্তমত উত্তর দিতে না পারার ক্ষোভের পীড়ন কান্নার পক্ষে যথেষ্ট।

জোসেফ হাসতে লাগল। সেও মাকে জানে। নীলি চা করছিল তৃতীয় দফায়। এর আগে এক দফা চা-ডিম-কেক দিয়ে চা খাইয়েছে নরসিং এবং জোসেফকে। সেই খাওয়ার মধ্যেই ব্যবসাবাণিজ্যের কথা এবং শ্যামনগর-পাঁচমতী রাস্তা সম্পর্কে গুপ্ত তথ্য অর্থাৎ মোটর কোম্পানীর দেওয়া টাকা পাওয়ার কথা জোসেফ তাকে বলেছে। নরসিংও তাকে বলেছে নিজের ব্যবসার পরিকল্পনার কথা। চায়ের কাপ জোসেফ ও নরসিংয়ের সামনে নামিয়ে দিয়ে সেও এক কাপ চা নিয়ে বসল—মায়ের এই হাঁউ-মাউ কান্নার জন্যে বিন্দুমাত্র ব্যস্ত হ'ল না। ব্যস্ত হয়ে উঠল নরসিং। ভদ্রতার খাতিরেও বটে এবং নীলিমার মাকে সন্তুষ্ট করতে চায় ব'লেও বটে। সে বললে—কালীথানের বাতের ওষুধ বুঝি খুব ভাল? তা চলুন না একদিন—একটু রোদ উঠুক, রাস্তা ঘাটটা একটু শুকিয়ে যাক—চলুন, আমার গাড়ী তো বসেই রয়েছে।

এক কথাতেই মা খুশি হয়ে গেল। চোখের জল মুছে বললে—বেঁচে থাক তুমি বাবা, তোমার উন্নতি হোক অনেক ক'রে। তোমার সঙ্গে থেকে যদি জোসেফের উন্নতি হয় সেই আমার ভরসা। তোমার বাবার কত বড় বংশ—তোমাদের কত মান—কত নাম—কত ডাক! শ্বশুরের কাছে শুনতাম—গায়ে কাঁটা দিত।

নরসিং একটু স্ফীত হ'ল অহঙ্কারে, একটু তৃপ্তি হ'ল তার। এর বেশি কিছু না। কোন আক্ষেপ বা ক্ষোভ—এসব আর জাগে না। অনুভব করতে পারে না।

জোসেফ উঠে বললে—যাই, স্নানটা সেরে নি। মেঘলা ক'রে থাকলেও

বেলা অনেক হয়েছে। আজ আবার সায়েবের সায়েব আসবে। গাড়ী নিয়ে যেতে হবে ঘাটরোড স্টেশন। ওপার থেকে নৌকোয় আসবে। নিজের গাড়িটি আনবে না। ভারী চালাক।

নরসিং হেসে বললে—পাঁচমতীর সুরেশ দাস—আমার বোষ্টোম মিতে বলে, বাবার বাবা।

জোসেফ বললে—এ বেটা কালেক্টর বড় খট্‌মেজাজী লোক। তারপর নীলিমার দিকে তাকিয়ে বললে—তোদের ইস্কুলে যাবে নাকি?

কি জানি!

তা হ'লেও একটু পরিষ্কার হয়ে যাস। তোর ভাল সেলাই কিছু নিয়ে যাস।

হেসে নীলিমা বললে—আমাদের ইস্কুলে ভিজিটর এলে "টেল দি ম্যান্ টু কাম্ টু মি"-কে পার হয়ে আর কিছু দেখতে হয় না।

নীলিমাদের মিশন গার্লস ইস্কুলে প্রধানা হলেন খাঁটি ইংরেজ মহিলা। নীলিমাও তাঁর ছাত্রী। সরু গলায় তাঁর ইংরেজী উচ্চারণের জন্য "টেল দি ম্যান্ টু কাম্ টু মি" এই লাইনটিই তাঁর নাম দাঁড়িয়ে গিয়েছে। পথে ভদ্রলোকের ছোট ছেলেরা তাঁকে দেখলে কণ্ঠস্বর মিহি ক'রে বলে—"টেল দি ম্যান্ টু কাম্ টু মি।" মেমসাহেব হাসেন।

জোসেফ চলে গেল।

নরসিংও উঠল, বললে—তা হ'লে আমিও চলি।

মা বললে—ব'স বাবা, ব'স একটু। নরসিংকে বসতে বলে সে নিজে উঠে খোঁড়াতে ভুলে সহজ পায়েই হেঁটে চলে গেল।

নীলিমা হেসে উঠল সশব্দে।

নরসিং বললে—কি?

মা খোঁড়াতে ভুলে গিয়েছে। বাত বাত বলছিল না?

ও। নরসিং কিন্তু বুঝতে পারলে না ব্যাপারটার কিছুই। বুদ্ধির ——র দিক দিয়ে নরসিংও স্থূল।

বাইরের দরজায় বাইসিক্লের ঘণ্টা বেজে উঠল।—ড্রাইবর সাব!

এস-ডি-ওর আর্দালি। ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল নীলিমা।

হিন্দুস্থানী মুসলমান চাপরাশী নীলিমাকে দেখে হেসেই বললে—কালেক্টর সাব আসবন আজ, ড্রাইবর সাবকো জলদী যানে বলিয়েছেন সাব।

নীলিমা উত্তর দিলে—গোসল কর রহে হেঁ। তুরন্ত যাইয়ে গা। সে ফিরল সঙ্গে সঙ্গে।

আর্দালী এবার নরসিংকে বললে—তুমনে ভি তলব দিয়া সাব। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে চেয়ারম্যান আওর মেম্বর ভি আইয়ে গা। উনকে লিয়ে গাড়ী লেকে যানে কো হুকুম দিয়া সাব।

মুহূর্ত্তের জন্য গা থেকে মাথা পর্য্যন্ত চিন্ চিন্ করে উঠল নরসিংয়ের। জিভের ডগায় এসে গেল—নেহি যায়েগা—যাও—বোল দো তুমহারা সাবকো। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আত্মসম্বরণ করলে সে। পাঁচমতী-শ্যামনগর রাস্তা ভাল হলে তার বাস চলবে—ট্যাক্সী চলবে—ট্রাক চলবে। আরও মনে পড়ে গেল ইমামবাজার—জংসন স্টেশন সদর শহর সার্ভিস—তার সোনার সার্ভিস! মেজাজের জন্যই তার সে সার্ভিস গিয়েছে। সে নিজে সামলে নিয়ে বললে—যাও সাবকো বোলো—ঠিক টায়েমমে যায়েঙ্গে হম।

নীলি একটু হাসলে। নরসিং এবং দাদার উপর অশ্রদ্ধা হচ্ছে তার। ওই আর্দালীটা ওদের 'তুম' 'তুম' ক'রে কথা বলে।

নরসিং বললে—তা হলে চলি এখন।

আচ্ছা।

নরসিং গাড়ীটা নিয়ে বাজারে এসে দাঁড়াল। ঘাটরোড—ঘাটরোড স্টেশন। গাড়ীটা তো খালিই যাবে, যদি দুটো চারটে প্যাসেঞ্জার পাওয়া যায়! তাই পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনা। যা হয়! ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড চেয়ারম্যান ভাড়া দেবে হয়তো, কিন্তু কি দেবে কে জানে? নাই যদি দেয় তাই বা কি করতে পারে নরসিং! কলকাতাতেই ট্রামে বাসে কনস্টেবলেরা ভাড়া দেয় না। এই সব

কথা মনে হলে তখন সে আপনার মনেই চীৎকার ক'রে বলে, দূর দূর দূর! ছোটলোকের কাম—বেইজ্জতিকে কারবার! দূর করো শালা, দূর করো।

গুরুজী! - পাশেই এসে দাঁড়াল একখানা ফোর্ডগাড়ী। নিতাই ড্রাইভ করছে।

নরসিং কথা বললে না। মুখ ফিরিয়ে রইল।

নিতাই বললে - আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে। জোসেপের গাড়ীতে ম্যাজিস্টর, আপনার গাড়ীতে চেয়ারম্যান, আমার গাড়ীতে বাবুর সঙ্গে মেম্বর-টেম্বররা আসবেন।

নরসিং তবু কথা বললে না।—হারামজাদ বেইমান কাঁহাকা! পনের টাকা মাইনের ড্রাইভার—বগলস আঁটা নেড়ী কুত্তার বাচ্চা! তোর সঙ্গে কথা কইবে নরসিং?

নিতাই বললে—আমার ওপরে খুব রেগেছেন, নয়?

না নাঃ। রাগ-টাগ কারু ওপরে আমার নাই।

নিতাই একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—আচ্ছা সেলাম। গাড়ীতে তেল নিতে এসেছি। চলে গেল সে গাড়ী নিয়ে।

যাবার সময় নিতাই এল সব শেষে। গাড়ীর মধ্যে তার বাবু। নিতাই হর্ন দিয়ে হাত নেড়ে ইসারা করছে—পথ দাও। পথ ছেড়ে দিলে নরসিং। নিতাইয়ের বাবু ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের মেম্বর। নিতাই খুব জমকালো পোশাক পরেছে। আসবার সময়েও নিতাইয়ের গাড়ীকে তার পথ ছেড়ে দিতে হ'ল। নিতাইয়ের বাবুর গাড়ীতেই এলেন চেয়ারম্যান। বন্ধুলোক। নিতাইয়ের বাবু যেমন মদ খায় চেয়ারম্যানেরও তেমনি মদে ঝোঁক। কেউ কারও মুখের গন্ধ পায় না। তিক্ত ভাবে হাসতে হাসতে দুজন মেম্বরকে নিয়ে নরসিং সব চেয়ে পিছনে এল।

মিটিং—তদন্ত শেষ হ'ল রাত্রি দশটায়। নরসিংয়ের মাথা ঝন্‌ঝন্‌ করছে, আগুন জ্বলছে। সয়তানের রাজত্ব! বেইমানের কাল! মর গিয়া! ধরমরাজ,

মর গিয়া! ভগোয়ান মর গিয়া! হে ভগোয়ান! বিলাত আমেরিকার কোম্পানী দিয়েছে লাখে লাখে টাকা—সেই টাকাতেও পেট ভরছে না ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের আর এই এখানকার কুমীর ওই বাস কোম্পানীর! বলে—মনোপলি সার্বিস হোক, যে টাকা দেবে বছর বছর সেই পাবে সার্বিস। বছরে পাঁচশো টাকা—রাস্তা মেরামতের জন্য। আপত্তি করেছেন এখানকার এস-ডি-ও। কেঁচে গিয়েছে মতলবটা, কিন্তু এ কি সয়তানী মতলব!

মদ সে প্রচুরই খেয়েছিল ক্ষোভে। টলতে টলতে ফিরল বাসায়।

শুখনরামের লোক বললে—শেঠজী আছেন ডাকবাংলায় চেয়ারম্যানের ওখানে। আপনাকে যেতে বলেছেন গাড়ী নিয়ে। আরে বাপ রে—ওই এক লোক! আজ শেঠজীর চেহারা দেখে নরসিংয়ের তাক লেগে গিয়েছে। হাকিম-চেয়ারম্যানদের মধ্যে চেয়ারে বসে—মাথা উঁচু করে—কি বসেছিল! সে মনোপলি সার্বিস সম্বন্ধে কথা বলে নাই, তবে রাস্তা পাকা করা নিয়ে খুব দামী দামী কথা বলেছে। মাল আনতে তার ভারী অসুবিধে হয়।

শেঠজীকে নিয়ে নরসিং পাগলের মত হাসতে হাসতে ফিরল। শেঠ আজ চেয়ারম্যানের সঙ্গে মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে গিয়েছে। ধরাধরি করে তুলতে হ'ল শেঠজীকে। হাসতে হাসতেই সে বাসায় ফিরল।

কে? ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে ও কে?

ফট্‌কী!

সতেরো

মোটর-ড্রাইভারের দিনরাত্রি। দিনটা চলে উড়ে; রাত্রির খানিকটা অংশও দিনের সামিল। দু-হাতে ধরা থাকে ষ্টিয়ারিং, পায়ের তলায় থাকে ক্লাচ, এক্‌সিলারেটর, ফুটব্রেক, হাতের পাশে থাকে গিয়ারিং হাণ্ডেল, হাণ্ডব্রেক। চোখ থাকে পথের সামনেটায় নিবদ্ধ; স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি।

নীচ থেকে ওঠে গরম ভাপানি, প্রায় বুক পর্য্যন্ত গরম ভাপানিতে সিদ্ধ হ'তে থাকে। নাকে অবিরল ঢোকে পেট্রোলের ধোঁয়ার গন্ধ। কানের দুপাশে, কপালে, সামনের চুলগুলোকে পিছনের দিকে উড়িয়ে বাতাস লাগে। সকাল-সন্ধ্যায় বাতাস ঠাণ্ডা, দুপুরে গরম,—গ্রীষ্মের দুপুরের বাতাসে মুখ জ্বালা করে, বর্ষায় লাগে জলের ছাট, শীতে কনকনে ঠাণ্ডায় মুখের চামড়া যেন অসাড় হয়ে আসে। দুপাশে কাছের জিনিষ, বাড়ী-ঘর, গাছপালা, মানুষ-জনই যেন পিছনে চলে যায় ছুটে ; খোলা মাঠ হলে দূরের গাছপালা, গ্রাম, গরুবাছুর, মানুষ পাক দিয়ে ঘুরতে থাকে। মধ্যে মধ্যে ছেদ পড়ে, গাড়ী থামে, তখন নেমে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আরামের একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরীরটা জুড়িয়ে নেয়। অল্পক্ষণের জন্য গাড়ী থামলে গাড়ী থেকে আর নামে না, ষ্টিয়ারিংয়ের উপর মাথা রেখে একটু জিরিয়ে নেয়। সারাদিনের পর যখন "বিলকুল ছুট্টি" মেলে তখন শরীর টলতে থাকে, মনে হয় মাটিই টলছে। মোবিল-পেট্রোল, তৈলাক্ত লোহার কষ-কালি, বাতাসে উড়ে লাগা ধূলোকাদা এবং সারাদিনের ঘামে সর্ব্বশরীরে একটা জর্জ্জরতা অনুভব করে। শরীরের গ্রন্থিগুলো খুলে পড়তে চায়, পেশীতে পেশীতে টাঁটানি জাগে ; অবশ্য এ তাদের সহ্য হয়ে যাওয়া ব্যাপার—ক্ষয়রোগের রোগীর নিত্য অপরাহ্ণের স্বল্প উত্তাপের মত। তখন চাই মদ। মদ পেটে পড়লেই শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কেয়া হ্যায় ? কোন্ হ্যায় ? কিস্‌কে পরোয়া ?—এই তখন মুখের বুলি। বেপরোয়া টলতে টলতে চলে। নরসিংও চলে। চলতে চলতে রামাকে অথবা যে সঙ্গী থাকে তাকেই বলে—এখানে কি আছে ? কুছ না। বুড়ো আঙুল দুটো নেড়ে বলে—ঢু-ঢু ঢন্ ঢন্। উ সব হ্যায় কলকাত্তামে।

কলিকাতায় দেখেছে নরসিং—রসা রোডে, হাজরা রোডে, শ্যামবাজারে, ভবনাথ সেন ষ্ট্রীটের মোড়ে রাত্রি সাড়ে দশটা এগারোটায় হল্লা করতে করতে চলেছে শিখ ড্রাইভারের দল। কলকাতায় মোটর-ব্যবসা মানেই শিখদের কারবার। মাথায় পাগড়ী, গায়ে লম্বা কামিজ, পরনে হাফপ্যান্ট, পায়ে নাগরা,

লম্বা-চওড়া জোয়ান সব টলতে টলতে চলেছে—হা-হা ইয়া! খবরদার! মারো ডাণ্ডা! তার সঙ্গে অট্টহাসি—হা-হা-হা-হা! অশ্লীল কথা, অশ্লীল গান! সমস্ত দিন দশ-বারোটা লোহার ঘোড়া আর পেট্রোল গ্যাসের উত্তাপের সঙ্গে লড়াই ক'রে এইবার কোমল শীতল দেহের স্পর্শের মধ্যে নিজেদের উত্তেজিত স্নায়ুতন্ত্রীগুলিকে অবসন্নতায় এলিয়ে দেবার জন্য অধীর হয়ে ওঠে। বস্তীর নোংরা পল্লীর গলিপথে ঢুকে পড়ে।

কি আছে এখানে? ফুঃ—ফুঃ—ফুঃ—!

গঙ্গার ধার, রেড রোড, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের সামনে পাশে বড় বড় গাছে-ঘেরা নির্জ্জন পথ, পিচ-ঢালা শক্ত সমতল পথ, ট্যাক্সি চলে বড় দীঘির জলের উপর নৌকার মত। পিছনের সিটে বসে থাকে সাহেব আর মেম; তাদের গুনগুনানি কানে এসে ঢোকে, তাদের খিলখিল হাসিতে শরীর শিউরে ওঠে। এই কলকাত্তা।

এখানে কিছু নাই—'কুছ্ না, কুছ্ না'—আক্ষেপ করতে করতে রামেশ্বরোয়া, তারক, ইসমাইল, রসিদ সকলেই মদ খেয়ে গিয়ে বসে নিজেদের আড্ডায়—সেই চা-মাংসের দোকানে, খানিকটা সময় জুয়ো খেলে, ঝগড়া করে, তারপর আড্ডা ভেঙে গিয়ে ঢোকে এখানকার বেশ্যাপল্লীতে। হাড়ি-ডোমপল্লীর কাছাকাছি নোংরা একটা বস্তী—খুপরীর মত ঘরের দরজায় কেরোসিনের ডিবরি জ্বেলে বসে থাকে ঐ পল্লীর কুলত্যাগিনী মেয়েরা। মধ্যে মধ্যে ধাক্কা খায় ভদ্রলোকের সঙ্গে। উকীল মোক্তারদের মুহুরী, দু'চারজন উকীল-মোক্তারও মাথায় ঘোমটা টেনে ছুটে পালায়। ওরা প্রথমটা চুপ ক'রে থাকে, কিন্তু তারা খানিকটা দূরে পড়লেই হো-হো করে হাসে।

নরসিং অনেকদিন নিজেকে এই শেষের হল্লার কারবার থেকে দূরে রেখেছিল। প্রথম জীবনে জানকী এসে তার জীবনের লাগামটা কষে চেপে ধরেছিল। অনবরত তাকে মনে পড়িয়ে দিত—সে গিরবরজার ছত্রি-বংশের ছেলে। বলত,—যার বাত ঠিক থাকে না, তার জাত চলে যায়। তুমি

আমার কাছে কসম খেয়েছ। জানকী মরে গেল, তার মৃত্যুর পরে নরসিং জানকীর শোকে জানকীর কাছে-দেওয়া কসমটাকে পালন করবার জন্য নিজেকে আরও শক্ত ক'রে তুলতে চেষ্টা করলে। ছত্রি-বংশের অহঙ্কারটাকে আরও বড় ক'রে তুললে মনে মনে। কিন্তু দুনিয়া হ'ল সয়তানীর রাজ্য। নরসিং বলে—'হারামীর জায়গা।' এখানে কারও ভাল থাকবার উপায় নাই। ছোট ছোট ক'রে লোককে এখানে ছোট করে দেয়। প্যাসেঞ্জার থেকে আরম্ভ ক'রে রাস্তার ওভারসিয়ার, থানার জমাদার, দারোগা, ইন্সপেক্টর, সমস্ত লোকে মাথায় ডাণ্ডা মেরে ওকে ছোট ক'রে দিলে। সবারই এক বুলি—বেটা ট্যাক্সী-ড্রাইভার, ছোটলোক। গিরবরজার ছত্রি-বংশের ছেলে কি ছোটলোক হয়? কিন্তু পেটের দায়ে প্যাসেঞ্জারের কথা সইতে হ'ল, সাজার ভয়ে ওভারসিয়ার-দারোগা-জমাদারের লাল চোখ দেখে সেলাম বাজাতে হ'ল। শেষ পর্য্যন্ত এস-ডি-ওর বেত খেঁয়ে নরসিংয়ের ছত্রিত্বের অহঙ্কারের শেষটুকু মুছে গেল। তা-ই বোধ হয় গেল। ওই বেত খেয়ে বাড়ী আসবার পথেই শুখনরাম সাঁহুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সাহুকে ধমক মেরেছিল নরসিং প্রথমটা। সেই সাহু পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিয়ে তারই গাড়ীতে সওয়ার হয়ে বসল। সে পঞ্চাশটা টাকা পঞ্চাশ চাঁদির জুতো। ছোট কারবার ক'রে সত্যিই ছোট হয়ে গিয়েছে নরসিং। তারপর এখানে এসে যা করলে—সে ভাবলে নরসিং নিজের মনেই চীৎকার ক'রে বলতে থাকে—ভাগ্—ভাগ্—ভাগ্।

ফট্‌কী চমকে ওঠে নরসিংয়ের আলিঙ্গনের মধ্যে থেকে।—কি? ভয় হয় ফট্‌কীর, হয়তো তাকেই তাড়িয়ে দিতে চাইছে নরসিং।

নরসিং মাথা নাড়তে থাকে, ফট্‌কীর মুখে চোখ রেখে বলে—তোকে নয়।

তবে কাকে?

আরশুলা। পায়ে আরশুলা উঠেছে।

নরসিং ফট্‌কীকে গ্রহণ করেছে। জানকীর কাছে-দেওয়া কসম তার মনে নাই এমন নয়, কিন্তু সে কসম আর মানে না নরসিং।

কি-ই বা মানে সে আর? গিব্‌বরজার ছত্রি-বংশের ছেলে সে, সে আজ গিব্‌বরজারই হাড়িদের কৃশ্চান বংশধরের বাড়ীতে তাদের হাতে তাদের হেঁসেলে খায়। তাদের মেয়ে মেরী নীলিমা আজ তার কাছে নতুন মডেলের 'মাস্টার বুইক' গাড়ীর মত স্বপ্নের বস্তু। পুরনো তাপ্পি-মারা ভাড়াটে শেভ্রলে গাড়ির মালিক এবং ড্রাইভার নরসিংয়ের নতুন গাড়ী দেখলেই মনে নেশা লাগে, দিনের আলোতেই এই ভাঙা গাড়ী চালাতে চালাতে নতুন দামী—ওই বুইক গাড়ী কেনার কল্পনার স্বপ্ন রচনা করে, পদ্যপাঠের কবিতার সর্ব্বস্বান্ত হয়ে মাটির বাসনের ব্যবসায়রত সেই বেনের ছেলের মত। এমনি বুইক গাড়ী কিনে চালাবে সে একদিন। সঙ্গে সঙ্গে মেরী নীলিমাকে নিয়েও তার কল্পনা নানা স্বপ্নকাহিনী রচনা করে। এক এক সময় নরসিং বেশ বুঝতেও পারে যে এসব নেহাতই মিথ্যে, এ সব কখনই সত্য হবে না, কিন্তু মনকে মানাতে পারে না। কিছুতেই মানে না মন।

সমস্ত দিন গাড়ী চালানোর উত্তেজনার উপর রাত্রে লাগে মদের নেশার ঘোর—তখন সে ফটকীকে বুকে টেনে নেয়; কিন্তু সকালে নেশা কেটে যায়, সুস্থ মস্তিষ্কে সহজ মনে ফটকীর উপর বিতৃষ্ণা জাগে। তখন তার মন অস্থির হয় মেরী নীলিমার জন্য। হাড়ির বংশের কৃশ্চান-ধর্ম্মাবলম্বী কালো মেয়ে—নীলিমা। কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা নরসিংয়ের কাছে মনে হয় সম্ভ্রান্ত, মর্য্যাদাময় এবং দুর্লভ। দিনের আলোতে সহজ মনের সম্মুখে নীলিমা তার কালো রূপ নিয়েই স্বপ্ন হয়ে ওঠে। পরিচ্ছন্ন আধুনিক রুচিসঙ্গত পোষাকে পরিচ্ছদে কালো মেয়েটিকেই অপরূপ মনে হয়; হাড়ির বংশের মেয়ে হলেও ম্যাট্রিক-পাস নীলিমার কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী শুনে এবং দেখে নরসিংয়ের মনে হয়, এই মেয়েই তার মনের সকল ক্ষোভ-গ্লানি মুছে দিয়ে আনন্দে শান্তিতে তার জীবনকে পরিপূর্ণ করে দিতে পারে। মনে হয়—কিসের জাত? ওর জন্যে জাত দিতে তার কোন দুঃখ নাই। কিন্তু 'সব ঝুট্ হায়'। নীলিমাকে নিয়ে কোন কল্পনাই তার সত্য নয়, সব মিথ্যে।

ইমামবাজারে বাবুদের বাসের রমজান ড্রাইভার নরসিংয়ের গুরু। রমজান ড্রাইভার তাকে বলেছিল তার এমনিধারা গল্পের কথা। কলকাতায় তখন সে ট্যাক্সী-ড্রাইভার ছিল; একটি কলেজে-পড়া মেয়েকে দেখে সে পাগল হয়ে উঠেছিল। কলেজে যাবার সময় মেয়েটি যে স্টপেজ থেকে ট্রামে উঠত—ঠিক সময়টিতে রমজান তার কিছু দূরে ট্যাক্সী নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আপনার সীটে ব'সে মেয়েটিকে দেখত শুধু। মেয়েটি ট্রামে উঠত, রমজানও তার ট্যাক্সী নিয়ে ট্রামের পাশে পাশে চলত ওই ট্রামের গতির সঙ্গে সমান তাল রেখে। কলেজের সামনে মেয়েটি নামত, কলেজের ঢুকে যেত, রমজান গাড়ী নিয়ে চলে যেত ভাড়া খাটতে। তারপর ?—নরসিং প্রশ্ন করেছিল রমজানকে। তারপর আর কি ? একদিন দেখলাম, এল না। দু দিন না। তিন দিন না। শেষে গাড়ী নিয়ে গলির মধ্যে ঢুকলাম—গলির মধ্যে তাদের বাড়ী।—ছুটির পর তার পিছনে এসে বাড়ীও সে দেখেছিল।—দেখলাম মাল বোঝাই হচ্ছে মোটরে। বাড়ীর ছাদে হোগলার ছাউনী; মেয়েটি বউ সেজে দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ীতে চড়বে। বাস্, ফিরে এলাম। শুধু ঝগড়া হয়ে গেল যে-ট্যাক্সী দুটো ভাড়া নিয়ে যাচ্ছিল—তাদের ড্রাইভারের সঙ্গে। মিছে ঝগড়া; পাশ কাটিয়ে যাবার সময় আমার দোষেই মাডগার্ডে ধাক্কা লেগে গেল।

নীলিমাও হয়ত একদিন চার্চ্চে যাবে কারো হাত ধ'রে। সেদিন নরসিংয়েরও ঝগড়া হয়ে যাবে কারো সঙ্গে।

* * *

ফটকী বলে—আমি আর ওই কুপোর বাড়ীতে থাকব না। আমাকে তুমি নিয়ে চল। অর্থাৎ শুখনরামের বাড়ীতে।

রাত্রে নেশার মধ্যে নরসিং উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে—আলবৎ, জরুর।

ফটকী পরামর্শ দেয়—চল, এখান থেকে পাঁচমতীতে একখানা ঘর ভাড়া ক'রে আমাকে রাখবে। রাত্রে এখন এখানে থাক, তখন পাঁচমতীতে থাকবে।

ঠিক—ঠিক। ফটকীর বুদ্ধি দেখে নরসিং অত্যন্ত খুসী হয়ে ওঠে। ঠিক

বলেছে ফটকী। এমন জীবন আর ভাল লাগছে না। এই চুরি-চুরি খেলা, এ কি নরসিংয়ের পোষায়? এ হ'ল ছোটলোকের কাজ। 'ডরফোক্না'—ভীতুলোকের কাজ।

তা ছাড়া।—ফটকী নরসিংয়ের খুসী মেজাজের স্পর্শ পেয়ে অভিমান ক'রে ঈষৎ ঠোঁট ফুলিয়ে বলে—তা ছাড়া এমন ক'রে আসতে আর পাবব না বাপু। কোনদিন যদি ধ'রে ফেলে, তবে ওই যে কালো কুমীর—ও আমাকে খুন ক'রে দেবে। মেথর ঢোকার দরজা দিয়ে সরু গলিটা দিয়ে আসি, এখনও ধরতে পারে নাই। এবার ধরতে পারলে তোমারও মুস্কিল হবে, আমাকে হয় তো খুন ক'রে গুম্ ক'রে দেবে।

হুঁ।

ফটকী বলেই যায়—বারান্দা থেকে কাপড় ঝুলিয়ে ঝুলে নামার কথা বলেছিল সেই বুড়ী ঝি হারামজাদী। কুমীর ঠিক বিশ্বাস করতে পারে নাই। বলে—ওই নরম চেহারা, ওই মেয়ে কাপড় ঝুলিয়ে নামতে পারে কখনও? বলে সে খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে ওঠে।

নরসিং চুপ ক'রে ব'সে ভাবে।

কি ভাবছ?

কিছু না। তাই চল্। পাঁচমতীতেই ঘর ভাড়া ক'রে তোকে নিয়ে যাই। শুখনরামের টাকাগুলো ফেলে দি।

ফটকী সাদরে নরসিংয়ের গলা জড়িয়ে ধরে। নরসিং স্নেহভরে ফটকীর পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। হঠাৎ ফটকী উঠে ব'সে বলে—ছাড়, তোমার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দি।

না।

নেশার উত্তেজনার মধ্যে ফটকীর সেবা নরসিংয়ের ভাল লাগে না। সে চায় দৈহিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি।

শেষরাত্রে ফটকী উঠে চলে যায়। কোনদিন নরসিংহকে ডাকে,

কোনদিন ডাকে না। সকালে উঠে নরসিং কথাটা ভাবে। এই ফটকীকে নিয়ে কি জীবন কাটানো যায়? আর ফটকীই কি তাকে নিয়ে জীবন কাটাতে পারবে? আবার কাকে দেখে তার নেশা জাগবে, কে বলতে পারে? একটা দাঁতনকাঠি চিবুতে চিবুতে চলে মাঠের দিকে; ফেরার পথে ক্রুশ্চানপাড়া হয়ে ফেরে; পথে জোসেফের বাড়ীর দরজায় ডাকে---জোসেফ, উঠেছ?

কালো মেয়ে রুখু অবিন্যস্ত চুলে বাঁধা-বেণী ঝুলিয়ে সাড়া দেয়—আসুন নরসিংবাবু। ওর কালো চেহারায় রুখু চুল যেন বড় ভাল মানায়। আর ভাল লাগে ঝকঝকে মুক্তার মত দাঁতগুলি।

জোসেফ ওঠে নি?

না। এখনও নাক ডাকছে। নীলিমা মৃদু হাসে—খিলখিল হাসি নীলিমা বড় হাসে না।

তবে চলি।

বসুন, চা খেয়ে যাবেন।

নরসিং আর আপত্তি করে না, বাইরের বারান্দায় একটা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়ে। চেয়ারে মোড়ায় ভীষণ ছারপোকা।

* * *

জোসেফের বাড়ী থেকে ফিরে বাসায় এসে বাজার। নিতাই চলে গিয়েছে। বেইমান এখন বাবুর বাড়ীতে ড্রাইভারী করছে। ড্রাইভারী, না, গোলামী! বাবুর জুতাও ঘুরিয়ে দিতে হয়—এ কথা হলপ ক'রে বলতে পারে নরসিং। মনে পড়ে মেজবাবুর কথা। নরসিং তবু তো ছত্রির ছেলে—গলায় পৈতে আছে, তবুও মেজবাবুর বরাত করতে বাধত না—নরসিং, আমার ধুতি-পাঞ্জাবি নিয়ে আয় তো। হ্যাঁ, আর এই চায়ের কাপগুলো নিয়ে যা। এঁটো চায়ের কাপ। প্রথম-প্রথম নরসিংয়ের মনে ছত্রিবংশের মান-ইজ্জতের গরম জেগে উঠত। তারপর তাও করতে হয়েছিল। আর বাধত না। নিতাইটা তো হাড়ির ছেলে; নরসিং জানে—তাকে বাব যখন পনের টাকা মাইনে আর দুবেলা খাবার দিয়ে

রেখেছে তখন নিশ্চয় বলে—এই নিতাই, আমার জুতো জোড়াটা নিয়ে আয় তো। একটা খবর তো সে এর মধ্যেই পেয়েছে—বাবুর বাড়ীতে সার্কেল-ডেপুটী আফজল খাঁ সাহেব মধ্যে মধ্যে আসেন, চা খান, খাবার খান, তার বাসন নিতাইকে তুলতে হয়, পরিষ্কার করতে হয়। মরুক নিতাই। যার যেমন নসীব, নরসিং করবে কি ?

রামা শূয়ার কবে ফিরবে কে জানে! সে উল্লুকটা ফিরলে এই সব হাঙ্গামা থেকে নরসিং বাঁচবে। বাজার করা, রান্না করা—এ সব এক হাঙ্গামা। কয়েকদিন হোটেলে খেয়েছিল, কিন্তু হোটেলে কি বারো মাস দুবেলা খাওয়া যায়! তার উপর রোজগার নাই, কাজ নাই—এ সময় করবেই বা কি ?

বাজার ক'রে ফিরে একবার গাড়ী বার করতে হবে। বর্ষার সময় উকীলবাবুদের অনেকে এ সময়টা ছ্যাকরা গাড়ী ভাড়া ক'রে কোর্টে যায়-আসে; নরসিং ছ্যাকরা গাড়ীর চাকার দাগ ধ'রে অল্পসল্প রোজকারের পথ আবিষ্কার করেছে। তিন জন উকীল মক্কেল পেয়েছে। এঁরা হলেন বড় উকীল এখানকার মধ্যে। একজন একা যান-আসেন, মাসকাবারি বন্দোবস্ত করেছেন তের টাকা। দৈনিক আট আনা হিসেবে মাসের চারটে রবিবার বাদ দিয়ে ছাব্বিশ দিনে তের টাকা। মাঝের ছুটিছাটাগুলো ধর্ত্তব্য নয়, তেমনি মধ্যে মধ্যে মেয়েরা যদি কোন বাড়ীতে বেড়াতে যায় তবে সেটাও হিসেবের মধ্যে আসবে না। আর দুজন এক সঙ্গে যান-আসেন। তাঁরা দুজনে দেন বারো টাকা। রবিবার বা অন্য ছুটির হিসেবনিকেশও নাই আর বাড়ীর মেয়েরা মোটরে চড়ে কুটুম্বিতাও করতে যায় না। এ ছাড়াও শহরের মধ্যে একটা-আধটা ভাড়া মেলে, তার রেট নরসিং করেছে এক টাকা। এক টাকার কম মোটরে চড়া হয় না,—কমে যেতে চাও, চলে যাও ছ্যাকরা গাড়ীর আড্ডায়। অবশ্য কমেও নিয়ে যেতে পারে নরসিং, কিন্তু তাতে ভিতরে গদীতে বসে যেতে পাবে না, মাড্‌গার্ডের উপরে বা ফুট্‌বোর্ডে চেপে যেতে হবে। চীনেম্যান জুতোওয়ালারা কম দাম বললে বলে—এক পাতী হোগা। এও তাই। ভাগো

বাবা, পথ দেখ। ছ্যাকরা গাড়ীতে যাও, আরও কম হবে। হেঁটে যাও, পয়সা লাগবে না।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে একবার যায় পাঁচমতীর সড়কের তে-মাথায়। রাস্তা পাকা হচ্ছে, তার মালপত্র—অর্থাৎ ইঁটের খোয়া, স্টোন ব্যালাস্ট, মিলের বয়লার-ঝাড়া পোড়া কয়লার ছাই—ঢালাই হচ্ছে। এখন বাদশাহী সড়ক, এতদিনে আংরেজী সড়ক বন্‌তা হ্যায়। ইষ্টিরিট হয়ে যাচ্ছে সড়ক। এর উপরে পড়বে লাল মোরাম। তার উপরে চলবে রোলার। রাস্তা তৈরী হয়ে গেলেই তার উপর চলবে নরসিংয়ের কোম্পানীর গাড়ী। 'সিং দাস এ্যাণ্ড কোম্পানী'—মানে নরসিং জোসেফ এ্যাণ্ড কোম্পানীর গাড়ী। নরসিং আর জোসেফের গাড়ী। কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে গিয়েছে। মোটর-কোম্পানীর সঙ্গে চিঠি লেখালেখি চলছে, চিঠি লিখছে নীলিমা। নরসিং দেবে তার পুরানো গাড়ীটা কোম্পানীকে, গাড়ীখানার দাম যা হবে সে বাদ দিয়ে যা থাকবে মাসিক ইনস্টলমেণ্টে তা শোধ দেবে। জোসেফও টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করছে। শুখনরামকে দলে নেওয়ার কথা এখনও ঠিক হয় নাই। জোসেফও আপত্তি করেছে, নরসিংও মন ঠিক করতে পারছে না এ বিষয়ে। ফটকীই তার মতটাকে দুলিয়ে দিয়েছে, নইলে শুখনরামকে কোম্পানীতে নেবারই তার ষোল আনা মত ছিল। শুখনরাম ট্রাক কিনুক দুখানা, পাঁচমতী থেকে যত মাল বইবার একচেটে কারবার হয়ে যাবে। ওদিকে ঘাটরোড পর্য্যন্ত মাল বইবার সুবিধে রয়েছে। দুখানা কেন, চালালে চারখানা ট্রাক চলবে। কথাবার্ত্তার মধ্যে কয়েকবার নরসিং শুখনরামকে কথাটা বলেও দেখেছে। শুখনরাম হাঁ-না কিছু বলে নাই। কথাটা পাকাপাকি করবার সংকল্পের মুখেই ফটকীকে গ্রহণ করলে এবং ফটকী আবদার ধরলে তাকে নিয়ে পাঁচমতীতে বাসা বাঁধতে হবে।

সে করতে গেলে শুখনরামের সঙ্গে সদ্ভাব চটে যাবে, এটা নিশ্চিত। সেই ভাবনায় পড়েছে নরসিং। বর্ষার জল রাস্তার দুপাশের মাঠে থৈ থৈ করছে, ধান রোপা সুরু হয়ে গিয়েছে, চাষীদের কাজ কামের শেষ নাই, চোখে স্ফূর্ত্তি

...মে যান। কত! কাজ কামের মধ্যেই মানুষের আসল ফূর্তি। প্রায় বেকার আছে নরসিং, মনের মধ্যে রাজ্যের বিরক্তি জমে উঠেছে।

শহর থেকে ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। ঢং-ঢং--ঢং-ঢং! চারটে বাজল। শহরের প্রান্তে ছোট জেলখানার ফটকে ঘড়ি পেটা হয় ঘণ্টায় ঘণ্টায়। বর্ষার সময় আওয়াজ বেশীদূর যায় যেন, বিশেষ ক'রে আকাশে মেঘ থাকলে। গ্রীষ্মের সময় এখান থেকে জেলখানার ঘণ্টার আওয়াজ এমন স্পষ্ট শোনা যায় না।

এখন ফিরতে হবে নরসিংকে। গাড়ী নিয়ে যেতে হবে কোর্টে। বড় উকীলবাবুর কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটেয় গাড়ী চাই। বাড়ী ফিরে ঠিক পাঁচটায় চা খাবেন। বুড়োর কি বাঁচবার চেষ্টা রে বাবা! নিক্তির ওজনে খায়, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলে। পঞ্চাশ বছর বয়স থেকে রাত্রে গুনে দুখানি লুচি খায়।

রাম চলে যাওয়ায় বড় অসুবিধা হয়েছে। একটা লোক গাড়ী ধুয়ে দেয়, কিন্তু না দাঁড়িয়ে দেখলেই ফাঁকি দেয়। ঘোড়ায় চড়ে আসে যেন। অবশ্য দোষই বা তাকে কি দেবে নরসিং? শুখনরামের গদিতে মাথায় ক'রে বস্তা বয়ে তার দিন চলে, প্রায় বাঁধা কাজ, কাজে লাগবার খানিকটা আগে এসে কয়েক বালতি জল তুলে চাকার উপর ঝাপটা দিয়ে ঢেলে দিতে দিতেই গদির সরকার হাঁক পাড়ে। তাকেও ছুটে যেতে হয়। গাড়ীর ভিতরটা ক'দিন ঝাড়া হয় নাই। উকীলবাবুদের চোগা-চাপকানেই ধূলো মুছে যায়। কিন্তু জোড়ের ফাঁকে ফাঁকে ধূলো জমেছে অনেক। ঝাড়নটা দিয়ে ঝেড়েও, যেতে চায় না ধূলো। গদিটা টেনে সরাতে হবে। বিরক্তিভরেই নরসিং টেনে তুললে গদিটা আর গালাগাল দিলে নিতাইকে এবং রামাকে—বেইমানের দুনিয়া, ছোটলোকের বাচ্চা কখনও সাচ্চা হয় না দুনিয়ায়। আর সেই উল্লুক গিধ্বড় বাড়ী গিয়েছে তো যেন রাজগী পেয়েছে সেখানে। সেই তে নেকড়ানী পিসী!

সামা — ' গেল নরসিং। ওটা কি? চিক্‌চিক্ করছে কি ওটা? সোনার জিনিষ, কানের গহনা। মাকড়ির মত হাল-ফ্যাশানের কানের গহনা। কোন মেয়ে-প্যাসেঞ্জারের কান থেকে পড়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তার দুদিন আগে বুড়ো উকীলবাবুর বাড়ীর মেয়েরা দুপুরবেলায় গিয়েছিল এস-ডি-ওর বাড়ী। ঠিক এই দিকেই বসেছিল উকীলবাবুর বেটা-বউ—নতুন বউ। নিশ্চয় তার। শাশুড়ী-ননদের ভয়ে সম্ভবত হারানোর কথাটা চেপে গিয়েছে, বলতে পারে নি। না হলে নিশ্চয়ই খোঁজ হ'ত। তার কাছেও আসত লোক। প্যাসেঞ্জারেরা কতজনে কত জিনিষ ফেলে যায়, আবার খোঁজ করতে আসে। ফিরিয়ে দেয় নরসিং। প্যাসেঞ্জারের জিনিষ গেলে বদনামী হয়। কলকাতার কথা অবশ্য আলাদা। সেখানে কে কাকে চেনে? কার কথা কে শোনে, মনে রাখে? কিন্তু মফস্বলে ও চলে না। কলকাতার এক সাহেব-কোম্পানীর জুতোর দোকানে লেখা আছে—'খরিদ্দার প্রভুর সমান।' ও-জেলার মোটর-কোম্পানীর মালিক বুধাবাবু বেতরিবৎ ঝগড়াটে কণ্ডাক্টার-ড্রাইভারকে বলত—ওরে হারামজাদ শূয়ার-কি বাচ্চা, প্যাসেঞ্জার হ'ল লক্ষ্মী। প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে ঝগড়া যদি ফের শুনি কোনদিন ত তোমার পিঠের চামড়া তুলে দেব, টেনে জিভ ছিঁড়ে দেব।

পকেটে ফেললে জিনিষটা। খোঁজ করলে দিতে হবে, না করে—। চোখ দুটো চকচক ক'রে উঠল নরসিংয়ের। ওজনে আধ ভরি হবে। পনেরো টাকার কম নয়। প্রায় বেকার অবস্থায় যা হয়। হঠাৎ মনে পড়ল নীলিমাকে। এমনি আর একটা গড়িয়ে নীলিমাকে দিলে নীলিমা নেবে না? নীলিমার হাতে না দিয়ে ওর মায়ের হাতে কিংবা জোসেফের হাতে দিলে আরও ভাল হয়। কালো নীলিমার কানে চিক্‌চিকে সোনার গহনাটা ভারী বাহার দেবে।

বুড়ো উকীলবাবু গম্ভীর লোক, কথাবার্ত্তা বড় বলেন না। নরসিং দরজা খুলে দেয়, মুহুরী মামলার ফাইলগুলো দেয়, বুড়োবাবু গাড়ীতে উঠে কোণে হেলান দিয়ে বসেন, পাকা গোঁফ-জোড়াটা বার দুয়েক হাত দিয়ে টেনে যেন

সোজা করে নেন—ব্যস্। বাড়ীতে গিয়ে নিজেই দরজা খুলে নেমে যান। চাকর এসে ফাইল নিয়ে যায়।

নরসিংয়ের মনের মধ্যে সোনার গয়নাটার কথাই ফিরছিল। অনেকক্ষণ থেকেই তার মনে হচ্ছিল, কথাটা বলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছিল নীলিমার মুখ। মন তখন বলছিল—মরুক গে, তার কি এত সাধু সাজবার গরজ! যার জিনিষ সে যদি খোঁজ না করে, দাবী না করে, তবে তার দোষটা কোথায়? কিন্তু উকীলবাবু গাড়ী থেকে নামতেই সে কতকটা যেন সব যুক্তিতর্ক ভুলে গিয়েই তাঁকে কথাটা বলবার জন্যে ডাকলে—বাবু!

ভুরু কুঁচকে উকীলবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন।

মুখের এই চেহারা দেখে নরসিং একটু ভড়কে গেল। তবু সে বললে—বলছিলাম স্যার—

উকীলবাবু বললেন—মাস শেষ না হ'লে টাকাকড়ি দেব না আমি। গটগট ক'রে চলে গেলেন উকীলবাবু।

শালা! নরসিং স্ফুটকণ্ঠেই গাল দিয়ে উঠল। সে নেমে পড়ল গাড়ী থেকে। বাবুর পিছন পিছন এসে বারান্দায় উঠে বললে—টাকাকড়ি আমি চাই নি বাবু; একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম।

আবার ঘুরে দাঁড়ালেন উকীলবাবু, বললেন—সন্ধ্যের পর এসো। সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘুরে ভিতরের দিকে অগ্রসর হলেন তিনি।

একটা কথা, বাড়ীতে মেয়েদের জিজ্ঞাসা করবেন কারও কিছু হারিয়েছে কি না?

আবার ঘুরলেন উকীলবাবু। স্তব্ধ হয়ে একটুখানি দাঁড়িয়ে যেন কথাটা বুঝে নিয়ে বললেন—হারিয়েছে কি না? মানে?

আমি একটা জিনিষ পেয়েছি গাড়ীতে।

কি জিনিষ?

সে কথার জবাব না দিয়ে নরসিং বললে—পরশু তারিখে মায়েরা

গিয়েছিলেন এস-ডি-ও সাহেবের বাড়ী। তারপর আর মেয়েছেলে যায় নাই আপনি একবার তদন্ত করে দেখবেন বাড়ীতে। আমি বরং সন্ধ্যের সম আসব।

উকীলবাবু এবার নরসিংয়ের পিছনে পিছনে বেরিয়ে এলেন।—কি জিনিষ জিনিষটা কি হে?

জিজ্ঞাসা করবেন মায়েদের। তাঁদের হলে তাঁরাই বলবেন কি জিনিষ।

নরসিং নিজেই যেত, কিন্তু উকীলবাবু তার অবসর দিলেন না। উকীলবাবু লোক তাকে খুঁজে বার করলে।—বাবু ডাকছেন।

উকীলবাবু চোখমুখ রাঙা ক'রে বসে আছেন। যেন বড় মামলায় সওয়া ক'রে হাঁপাচ্ছেন। নরসিং যেতেই বললেন—হ্যাঁ, বউমার কানের মাকড়ি-দু হারিয়েছে। পেয়েছ তুমি?

নরসিং গয়নাটি বার ক'রে টেবিলের উপর নামিয়ে দিলে।

ইয়েস্। ছাটস্ ইট। এ-ই বটে। হাতে ক'রে তুলে নিয়ে তিনি বাড়ী মধ্যে চলে গেলেন।

নরসিংয়ের মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল। সে মৃদুস্বরে আবার গাল দি পারলে না। শা-লা! ভাল কথা বলতে জানে না দুনিয়া। অপেক্ষা না ক' বেরিয়ে এসে সে গাড়ী নিয়ে চলে এল। মনটা কিন্তু তার ভারী খুসী হ উঠেছে। তা ছাড়া ভবিষ্যতে এতে তার ভাল হবে—এ সম্বন্ধে সে নিশ্চিত উকীলবাবু—ওই বুড়োয়া—ও এর দাম না দিক, দুনিয়া এর দাম দিতে কসু করবে না। পাকা নয়া রাস্তা, আংরেজ আমলের ইষ্টিরিট রাস্তায় মেয়েছে নিয়ে যারা যাবে তারা নরসিংকে খোঁজ করবেই। শা-লা!

ক্লাচ—ফুটব্রেক—সব শেষে হ্যাণ্ডব্রেকটা পর্য্যন্ত টেনে ধরলে। আ একটু হলেই চাপা পড়েছিল একটা। ধাঁ করে ছুটে বেরিয়ে এসেছে পাশে গলি থেকে।

পরের দিন কিন্তু উকীলবাবু নিজে থেকেই কথা বললেন।

কি হে, কাল আমি বাড়ীর ভিতর থেকে আসতে আসতে তুমি চলে গেলে কেন?

নরসিং যথাসাধ্য মিষ্টভাবেই জবাব দিলে—আপনি তো দাঁড়াতে বলেন নি!

ও, বলি নি, না? ভুলে গিয়েছিলাম তা হ'লে। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—ইউ আর এ গুড ম্যান অ্যান অনেস্ট ম্যান। সততা আছে তোমার।

নরসিং কোন জবাব দিলে না।

গাড়ী থেকে নেমে উকীলবাবু পকেট থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে বললেন—ধর।

জোড় হাত ক'রে পিছিয়ে গেল নরসিং।—এর জন্যে আমি কোন বকশিস নিতে পারব না স্যার। বাড়ীতে কাজকর্ম্ম হ'লে নিজে চেয়ে নেব বকশিস, জরুরী কাজে ট্রেণ ধরিয়ে দিয়ে দু'টাকা বেশী ভাড়া দাবী করব স্যার। কিন্তু এর জন্যে কিছু নিতে পারব না।

উকীলবাবু নোটখানা পকেটে পুরে কোর্টে গেলেন।

বিকেলে বাড়ী ফেরার পথে বললেন—দেখ হে, তোমার ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ আমি করতে পারব না। তুমি সন্ধ্যের পর একবার আমার এখানে আসবে। কিছু কথা বলব।

চমকে উঠল নরসিং। ক্ষতি হয়—? ক্ষতির চেষ্টা তা হ'লে কিছু হচ্ছে? সে প্রশ্ন ক'রে উঠল—আজ্ঞে?

সন্ধ্যের পর এস—সন্ধ্যের পর।

আঠারো

মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। উকিলবাবু বললেন—তোমার ক্ষতি হয় এমন কাজ অর্থাৎ নরসিংয়ের ক্ষতি হয় এমন কাজ কিছু হচ্ছে। উকিলবাবু জানতে পেরেছেন। উকিলবাবু যখন জেনেছেন তখন আইন-আদালতের কাণ্ড। অর্থাৎ মামলা-মকদ্দমা। কে করেছে মামলা-মকদ্দমা? নরসিং কারও কাছে টাকা ধারে না, কারও খাজনা রাখে না। কোন এ্যাকসিডেন্ট হয় নি—কোন প্যাসেঞ্জার ক্ষতিপূরণের নালিশ করতে পারে না। কারও সঙ্গে মারপিট হয় নি, গালিগালাজ হয় নি। মধ্যে মধ্যে ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ানদের সঙ্গে দু-চারটে কড়া কথা বলাবলি হয়েছে, তার জবাব তারাও দিয়েছে। তবে?

ডেটিনিউবাবুর কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। পুলিশ কিছু করেছে? খুব সম্ভব। বুকটা ধড়াস করে উঠল তার। তা ছাড়া আর কি হতে পারে? মিউনিসিপ্যালিটির ক'ঝুড়ি পাথর চুরি? না না না। ওটা বাজে। মিউনিসিপ্যালিটির ওভারসিয়ারবাবু নগদ পাঁচটা টাকা তার হাত থেকে নিয়ে পকেটে পুরেছেন। আর কি হতে পারে? ওভারলোডিং-এর কেস? বেশী যাত্রী বোঝাই করার জন্যে পুলিশ কেস করেছে? হতে পারে হয়তো। কিন্তু এমন তো কোন দিনের কথা মনে পড়ে না। তা ছাড়া সিপাহীদের দৈনিক পার্ব্বণী তো সে নিয়মিত দিয়ে এসেছে।

হঠাৎ মনে পড়ল শুখনরামের কথা। সাহুজীর ছোট ছোট তামাকের পেটি সে মধ্যে মধ্যে নিয়ে আসে। তাই নিয়ে কিছু কি? কিন্তু ধরা তো সে পড়ে নি, সাহুজীরও কিছু হয় নি, তবে মামলা হয় কি করে? সারাটা বিকেল তার চিন্তার মধ্যে কাটল। সন্ধ্যের সময় মদের দোকানে গিয়ে একটা শিশিতে সে মদ কিনে পুরে নিলে, খেলে না; উকীলবাবুর কাছে যেতে হবে, মুখে গন্ধ নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

উকিলবাবু মৌজ করে বসেছেন বারান্দায়; একটা ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারে বসেছেন, সামনে একটা ছোট টেবিল—টেবিলের উপর একটা সৌখীন টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। একটা কাচের গেলাসে মধ্যে মধ্যে চুমুক দিচ্ছেন আর গড়গড়ার নলে তামাক খাচ্ছেন। উঃ-উঃ! তামাকের ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে আর একটা গন্ধ কিসের? আরে সীতারাম, বোঁম শঙ্কর হরি হরি! কাঁচা মাংসের গন্ধ বাঘের কাছে লুকানো যায় না; মাছের গন্ধ বেড়ালের কাছে চাপা দেওয়া যায় মসলার গন্ধ মিশিয়ে? বাবু মদ খাচ্ছেন। নরসিং খুব খুসী হয়ে উঠল উকীলবাবুর উপর। এ না হলে মানাবেই বা কেন, আর শরীরই বা থাকবে কেন? এই বয়সে খাটুনি তো কম নয়! সারাটা দিন সকাল থেকে বিকেল চারটে পর্য্যন্ত বহস করা, জেরা করা—এ কি সোজা কথা! বড় বড় উকিলের চালই এই। ও-জেলাতেও সে দেখেছে, শুনেছে। সন্ধ্যের পর মাপ করা শিশি থেকে দাগে দাগে ঢেলে জল মিশিয়ে একটু একটু করে—বাবুরা বলেন 'সিপ করে'—খান। চ্যাংড়া উকিলেরা বেশী খায়; মধ্যে মধ্যে বে-এক্তিয়ার হয়েও পড়ে; দু'চার জন কসবীপাড়ায় হানা দেয়।

বারান্দায় উঠতেই উকিলবাবু বললেন—এসেছ?

বিনীত নমস্কার করে নরসিং বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব'স। উকিলবাবু গেলাসে চুমুক দিয়ে ডাকলেন—রামধনিয়া! গেলাসটা নিয়ে যা। জল মিশিয়ে আধ গেলাস দিয়ে যা। তামাক টানতে লাগলেন বাবু। বার দুই টেনে নলটা ফেলে দিয়ে একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন—হ্যাঁ। তোমার ক্ষতিকর কিছু আমার করা উচিত নয়।

নরসিং বললে—আমি তো স্যার কোন অন্যায়ই করি নি।

ইয়েস। অন্যায় কর নি। তা ছাড়া তুমি অনেষ্টির পরিচয় দিয়েছ। বউমা তো কথাটা চেপে গিয়েছিলেন বকুনির ভয়ে। তুমি অনায়াসে ওটা আত্মসাৎ করতে পারতে। ইয়েস, তোমার অনেষ্টি তুমি প্রুভ করেছ। ইয়েস।

নরসিং উৎকণ্ঠিতভাবে প্রতীক্ষা করে রইল।

উকিলবাবু একটু চুপ করে থেকে আবার আরম্ভ করলেন—বাট্ ইউ সি, সংসারে বেঁচে থাকাটা একটা যুদ্ধ—ষ্ট্রাগল্। ইয়েস—জীবনযুদ্ধ। বিশেষ আজকালকার বাজারে। একজনকে কিছু করতে গেলেই আর একজনের এলাকায় হানা দিতে হবেই। তুমি এখানে এসে হানা দিলে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানদের রোজকারের এলাকায়। ঠিক কি না বল?

আজ্ঞে হ্যাঁ। নরসিং আশ্বস্ত হ'ল, তা হ'লে ঘোড়ার গাড়ীওয়ালাদের কোন তড়পাইয়ের ব্যাপার। উকিলবাবু গোঁফ চুমরে নিয়ে বললেন, ইয়েস। ব্যাপারটা ঠিক তাই, বড় ছেলেটা আমার বসে আছে। ভাবছিলাম, কি ক'রে দেওয়া যায় ওকে! তা শ্যামগর-পাঁচমঁতী রোড পাকা হওয়ার প্রপোসাল হ'তেই শুখন সাহু আমার কাছে এল। ওর বড়ছেলের সঙ্গে আমার ছেলেটির ফ্রেণ্ডশিপ আছে। আমাকে প্রোপোসাল দিলে রাস্তাটায় মনোপলি সার্ভিস নিয়ে ওদের দু'জনকে একটা মোটর বাস্ বিজনেস করে দেওয়ার। কথাটা ভালই লাগল আমার। ইয়েস। দেখ, ছেলেটা বসে আছে, তা ছাড়া এমন একটা রাস্তায় যদি মনোপলি সার্ভিস পাওয়া যায় তবে মন্দ হবে না ব্যবসাটা। ইয়েস, ভালই হবে। শুখনরাম আমাকে বললে, আড়াই মাসে বেশ লাভ করেছ তুমি। নরসিংয়ের মাথার মধ্যে মুহূর্ত্তে ক্ষোভের ক্রোধের যেন একটা হাউই বাজি ছুটে গেল। গিরবরজার ছত্রির ছেলে নরসিংহ, দশ-বারোটা লোহার ঘোড়ার রাশ ধরে দিনভর হাঁকায় নরসিং। চড়াসুরে বাঁধা মেজাজের তার কড়া কথার অল্প ছোঁওয়ায় কেটে যায় তার, সে উঠে দাঁড়াল। হয়তো অঘটন কিছু ঘটিয়ে ফেলাই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সংসারে ব্যক্তিগত স্বভাবটাই সব নয়, তার চারিপাশের পৃথিবীকে তাকে না-মেনে উপায় নেই; তার এই তীব্র ক্ষোভ এবং ক্রোধকে হাউইয়ের সঙ্গে তুলনা করলে পারিপার্শ্বিককে তুলনা করতে হবে বর্ষাঋতুর সঙ্গে। বর্ষার মেঘলা আকাশ এবং বর্ষণ যেমন হাউইকে অল্প একটু উঠতেই দমিয়ে দেয়, তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে উঠেও সে চারিপাশের প্রভাব স্মরণ করে আবার দমে গেল। উকিলবাবুর বুদ্ধি এবং টাকা, শুখনরামের

সয়তানী আর টাকা—এর সামনে সে কতটুকু ? আর সে তো সেই গিরবরজার ছত্রি নয়। গিরধারী সিংহরায়ের বাস নাই, ফৌত হয়ে গিয়েছে গিরধারী সিং। দাঁড়িয়ে উঠে সে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললে—তা বেশ তো। আমি তো গরীব। আপনাদের টাকা আছে, আপনারা ব্যবসা করবেন বইকি। গরীবের রুটি মেরেই তো বড়লোক। তা বেশ, আমি চলে যাব এখান থেকে।

উকিলবাবু হেসে বললেন—ব'স ব'স। তোমার দুঃখ হচ্ছে বুঝতে পারছি। ইয়েস, তোমার দুঃখ হবার কথা। ইয়েস, ন্যাচ্যারুল এটা—বেরী বেরী ন্যাচ্যারুল। উকিলবাবু Natural-কে বলেন ন্যাচ্যারুল, Very-কে বলেন 'বেরী'। এককালে তাঁর ইংরেজী বলার খুব খ্যাতি ছিল। বড় বড় কথা দিয়ে ইংরেজী বলতেন। একালের ছেলেরা তাকে বলে 'বোম্বাস্টিক'। উকিলবাবু হাসতে হাসতে গেলাসে আবার একটা চুমুক দিয়ে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে চাকরকে ডাকলেন—রামধনিয়া, এলাচ আর লবঙ্গ দিয়ে যা আর কয়েকটা। তারপর নরসিংকে বললেন—ব'স, ব'স। আরও কথা আছে। ইউ আর এ গুড ম্যান, অনেষ্ট ম্যান; কিন্তু আমিও অনেষ্ট ম্যান, ডিসনেষ্টি আমি পছন্দ করি না। কাল থেকেই আমি ভাবছি, হোয়াইট ইজ দি ওয়ে আউট ? বুঝতে পারছ ? কঃ পন্থা ? মানে, সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না—এমন কি পথ থাকতে পারে ? এ্যাণ্ড আই হ্যাভ ফাউণ্ড ইট আউট। ভেবে বের করেছি। ইয়েস —এর চেয়ে আর ভাল হতে পারে না।

নরসিং বললে, আসছি স্যার, এক্ষুনি আসছি। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে, ঠিক সময়ে অভ্যাসের নেশা পেটে না-পড়ায় শরীর মেজাজ বেশ তাজা হচ্ছে না, তার উপর উকিলবাবুর গেলাস থেকে গন্ধ এসে নাকে ঢুকে তাকে চঞ্চল ক'রে তুলছে। সে আর থাকতে পারলে না, উকিলবাবুর বাড়ীর কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শিশিটা বার করে নির্জ্জলা মদ গলায় ঢেলে দিলে। গন্ধের ভয় নাই, 'নাইপাকা' হরিণকে কি বলে যেন ? কস্তুরী হরিণ! ওই 'নাইপাকা' হরিণের মত বাবু এখন নিজের মুখের খোসবয়েই মসগুল।

আর যদি পায়ই গন্ধ তাতেও নরসিং গ্রাহ্য করবে না। যে লোক তার রুটি মারতে হাত বাড়িয়েছে, তাকে আর খাতির কিসের? ঠাণ্ডা কথায় জবাব দিয়ে নরসিংয়ের সুখ হচ্ছে না। গ্যাস বানিয়ে নিতে হবে। ধাঁ করে সে একটা সিগারেট ধরিয়ে চোঁ-চোঁ করে যাকে বলে—সেই ভাবে টানতে লাগল। বর্ষা কালের সিগারেট—জলো হাওয়ায় আর জোরালো টানে সিগারেটটা পাটকিলে রঙ ধরে গরম হয়ে উঠল চলন্ত ইঞ্জিনের তৈলাক্ত নাট্ অর্থাৎ স্ক্রুপের মত।

কই হে?—উকিলবাবু ডাকছেন। বাবু আজ খুব খুসী হয়েছেন দেখছি। ভাল। কি পথ তিনি বার ক'রেছেন শোনাই যাক। তারপর নরসিং যা হয় করবে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সে এবার বেশ শক্তভাবে পা ফেলে বাবুর সামনে এসে দাঁড়াল।

উকিলবাবু বললেন—দেখ হে, আমি ঠিক করেছি—ব্যবসা করতে গেলে তোমাকে বাদ না দিয়ে তোমাকে নিয়ে ব্যবসা করলেই সব ঠিক হয়ে যায়। কোন সমস্যা নেই আর। নয় কি? এখন আমার প্রপোসাল হচ্ছে—'প্রপোসাল' মানে বোঝ ত? প্রস্তাব—ইয়েস—প্রস্তাব। তুমিও আমাদের ব্যবসাতে লেগে যাও।

এবার নরসিং একটু খুসী হ'ল। মন্দের ভাল এ-প্রস্তাব। সে জোসেফ এবং শেঠজীকে নিয়ে কোম্পানী খুলবার কল্পনা করেছিল—এতে জোসেফের বদলে উকিলবাবু আসছেন। জোসেফ বাদ যাচ্ছে—তার আর কি করতে পারে নরসিং? বন্ধু লোক আর মেরী নীলিমার ভাই। নইলে গির্‌বরজার হাড়ির ক্রিশ্চান বংশধরের সঙ্গে শেয়ারে ব্যবসা করতে তারও মন খুঁতখুঁত করে।

নরসিংয়ের কাছে কোন জবাব না পেয়ে উকিলবাবু বললেন—কি? মত নেই নাকি তোমার?

আজ্ঞে, মত থাকবে না কেন? এ ত খারাপ কথা বলেন নি আপনি।

ইয়েস, খারাপ কথা আমি বলি না। সে লোক আমি নই। যাক্—তুমি তা হলে রাজী ?

হ্যাঁ। রাস্তা যখন পাকা হচ্ছে, প্যাসেঞ্জার যখন হয়, তখন আরও গাড়ী চলবে সে আমি জানি। তবে মনোপলি সার্বিস করে যদি আমার রুটিটা মারেন, তা হ'লেই আমার উপর অধর্ম্ম করা হবে। নইলে—

ইয়েস, নইলে অধর্ম্ম হবে না। এবং সেটাই আমি চাই।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তো ওই গরুর গাড়ীর রাস্তায় মোটর চালিয়ে লোকের চোখ খুলে দিয়েছি। খারাপ রাস্তায় কেউ তো মোটর চালিয়ে লোকসানের ঝুঁকি নিতে চান নি।

বটে। ও কথাটা তুমি বাদ দাও। রাস্তা যখন পাকা হচ্ছে যখন তুমি এর আগে মোটর না চালালেও লোকে নতুন করে সার্বিস খুলত। সেটা কোন দাবী নয় তোমার। তবে তুমি অনেস্ট লোক—তোমার ক্ষতি আমি চাই না, এইটেই হ'ল আসল কথা। এখন শোন। আমরা একখানা মোটর বাস্ নিয়ে আসছি—

এর সঙ্গে ট্রাক শুদ্ধ আনুন বাবু, এ পথে মালের আনাগোনা প্যাসেঞ্জারের চেয়ে অনেক বেশী।

গুড আইডিয়া! ছাটস্ ইট। এ কথা মনে হয় নি আমাদের। এই জন্যেই তোমাকে চাই আমাদের মধ্যে। ইয়েস, বেরী গুড আইডিয়া!

নরসিং উৎসাহিত হয়ে উঠল। উকিলবাবুর মত গণ্যমান্য বিচক্ষণ পদস্থ ব্যক্তির প্রশংসা তার মত ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ সামগ্রী, সে বললে—আমি খুব ভাল ক'রে দেখেছি বাবু, মালের গাড়ী—গড় কত মণ ক'রে মাল আসে গাড়ীতে, মণকরা ভাড়া হিসেব করে খতিয়ে দেখেছি, মালের ট্রাক এখানে চালু করতে পারলে খুব লাভ। তা ছাড়া ট্রাক করলে আরও একটা কারবার জুড়তে পারা যাবে এর সঙ্গে।

কি বল ত ?

রাস্তার ঠিকেদারী।

কণ্ট্রাক্টরী? আই সি।

আজ্ঞে হ্যাঁ। বর্ষার সময় মেরামতের জন্যে রাস্তা বন্ধই থাকে কিছু দিন। আমি দেখেছি—বুধাবাবু, মানে, পাশের জেলায় বুধাবাবুর মোটর সার্বিস একরকম একচেটে, তিনি রাস্তা কণ্ট্রাক্ট নেন; গরুর গাড়ীতে পাথর-কাঁকর ঢালাই করতে দু-মাস লাগলে—ট্রাকে সে কাজ দশ দিনে হয়ে যায়। বসে থাকার লোকসানটা হয় না—ঠিকেদারীর লাভ থাকে—আর সব চেয়ে বড় কথা—রাস্তা মেরামতটি ভাল হয়। মানে—ওভারসিয়ারের প্রণামী দিয়ে ঠিকেদারেরা কম কাঁকর-পাথর দিয়ে বেশী লিখিয়ে লাভ করতে গিয়ে রাস্তার মাথা খেয়ে দেয়, সেটি হয় না। আমাদের হাতে রাস্তা থাকলে আমরা গাড়ীর জন্যে রাস্তা ভাল করে মেরামত করাব। ভেবে দেখুন ঠিক বলেছি কি না!

উকীলবাবু প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন—গ্র্যাণ্ড বলেছ। চমৎকার আইডিয়া! ইয়েস। অদ্ভুত কথা! মনোপলি সার্বিসের জন্যে বছরে একটা টাকা আমাদের ওই রাস্তার জন্যে দিতেই হবে। কণ্ট্রাক্ট আমাদের থাকলে —ইট উইল বি লাইক ফ্রায়িং এ হিলসা ফিস। মাছের তেলে মাছ ভাজা হয়ে যাবে। গ্র্যাণ্ড! গুড! তোমাকে আমাদের চাই। বুঝলে?

নরসিংয়ের মাথায় মৌজ ধরে এসেছে, সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

উকিলবাবু বললেন—নাউ অর্থাৎ এখন আসল কথাটা বলে নি। মানে 'টর্মস' বুঝলে। সর্ত্ত। আমি খুব সোজা লোক। বাঁকা-চোরা গলি-ঘুঁজি ঘেঁটে ঘেঁটে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আমি খোলসা করে কাজ করতে চাই। দেখ ব্যবসা করতে গেলেই আগে ঠিক করতে হয় মূলধন। তা তোমার মূলধন—ক্যাপিট্যাল আমরা ঠিক করেছি বিশ হাজার টাকা। ইয়েস বিশ হাজার। বাস দুখানা—বারো থেকে চোদ্দ হাজার—মানে, গাড়ী কিনব নতুন। তা ছাড়া মনোপলি সার্বিসের জন্য রাস্তায় দিতে হবে দু' হাজার। আর ধরো—ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডে লাগবে শ পাঁচেক—মানে পূজো। এই গেল সাড়ে ষোল

জার। তারপর গ্যারেজ এ-ও-তা এসব আছে। এখন ট্রাক একখানা কি দুখানা কিনতে গেলে টাকা আরও বেড়ে যাচ্ছে—ধর আরও দশ-বারো হাজার।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

উকিলবাবু যোগ-বিয়োগ করে টাকার পরিমাণ ধার্য্য করেন তিরিশ হাজার। তারপর বললেন—এখন কারবারে অংশীদার হতে গেলে তোমাকেও এর একটা অংশ দিতে হবে। তা না হলে অংশীদার হওয়া যায় না। আমি জানি না—ইয়েস্—আমি কি করে জানব কত টাকা তুমি দিতে পার?

নরসিংয়ের মনে হ'ল—সে যেন কোন উঁচু জায়গা থেকে নীচের দিকে পড়ে যাচ্ছে—সর্ব্বাঙ্গ কেমন শিরশির করছে, হাত পা নাড়বার শক্তি নাই। একটা সাপ যেন মুখে না কামড়ে লেজ দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। তিরিশ হাজার টাকার অংশ—!

উকীলবাবু উৎসাহ ভরে ব'লে গেলেন—এক, তোমার গাড়ীটা আছে, ওটার দাম যা আমি এনকোয়েরী করে জেনেছি তাতে ম্যাক্সিমাম হাজার টাকা। ওটা আমরা মোটর কোম্পানীকে বেচে গাড়ী কেনবার সময় এক্সচেঞ্জ দিলে কিছু হয়তো বেশী পেতে পারা যাবে। মানে, পুরনো গাড়ী আমি রাখব না। বুঝলে? এখন এর ওপর কি দেবে তুমি—বল?

নরসিং নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—টাকাকড়ি আমার নাই বাবু। কোথায় পাব আমি?

তা হ'লে মাত্র গাড়ীখানার দাম। ধর—এক হাজার; তা হ'লে তিরিশ ভাগের এক ভাগ। দু পয়সার সামান্য কিছু বেশী। সামান্য মানে হাজার টাকা মাসে লাভ হলে ৩৩।/৪ পাই পাবে তুমি। আর কাজ করবে তার একটা মাইনে পাবে। বেশ, কালই তুমি গাড়ীখানা লিখে দাও—

নরসিং ঘাড় নেড়ে বললে—গাড়ী আমি বেচব না বাবু।

চমকে উঠলেন উকিলবাবু। ঘাড় বেঁকিয়ে ভুরু কুঁচকে তীর্যকে দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—মানে? একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—তা হ'লে তুমি

এতে রাজী নও? এর পর খুব গম্ভীর হয়ে বললেন;—ভাল। ছাট্‌স গুড। আমি খালাস।

নরসিং পকেট থেকে শিশিটা বার করে অল্প খানিকটা সরে গিয়ে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে খানিকটা মদ খেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ওই আড়াল থেকেই বললে—আজ্ঞে ও সর্তে আমি রাজী নই। কোম্পানীকে গাড়ী আমি.দেব, কিন্তু গাড়ী আমারই থাকবে, আপনাদের গাড়ী আপনাদের থাকবে, আপনাদের আয় আপনারা নেবেন, আমার গাড়ীর আয় আমার থাকবে। মনোপলি নিতে যে টাকা লাগবে তার যা ন্যায্য অংশ হবে আমি দোব। গাড়ীখানা কোম্পানীকে বেচলে দু'পয়সা অংশ হবে বলছেন, তা বেশ ঐ টাকার দু পয়সা অংশ আমি দোব।

না। সে হয় না।—উকিলবাবু সোজা হয়ে বসলেন। দিলদরিয়া মেজাজ, গলার মৌজী কণ্ঠস্বর পাল্টে গিয়েছে। ঘাড় নেড়ে তিনি বললেন—ও-সব কাঁচা কাজ আমি করি না। ও-সব বাঙালীর এলোমেলো কাজের মধ্যে আমি নেই। আমার কারবারের মধ্যে আমি থাকতেও দোব না।

একখানা ঘোড়ার গাড়ী এসে ঢুকল কম্পাউণ্ডের মধ্যে। উকিলবাবু উঠে দাঁড়ালেন ব্যস্ত হয়ে।—কে? নিজেই আলোটা তুলে ধরলেন।—কে? সাহুজী?

হ্যা-হ্যা ক'রে হেসে মুখ বার ক'রে সাহুজী বললে—জী, হুজুর।

গাড়ী? গাড়ীতে এলে? এনেছ নাকি?—উকিলবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

সাহু উকিলবাবুর কথার জবাব না দিয়ে গাড়ীর ভিতর কাউকে উদ্দেশ ক'রে বললে—আরে নাম্ রে বাবা, নাম্। উকিলবাবু হেসে বললে—যাক, তা হ'লে সত্যিই ব্যবসা করবে তুমি!

আলবৎ। দেখেন, মানুষটাকে দেখেন আগে। একবার পায়ে তেল

গাড়ী থেকে ধবধবে সাদা থান কাপড় প'রে নামছে একটি মেয়ে। নরসিং দাওয়ায় উবু হয়ে বসে ছিল—সে উঠে দাঁড়াল। থামের আড়াল থেকে এগিয়ে এল। উকিলবাবু সম্ভবত উত্তেজনার প্রাবল্যে এতক্ষণ নরসিংয়ের কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন, তিনি এবার সচেতন হয়ে উঠলেন, বললেন—নরসিং, তুমি যেতে পার এখন।

মেয়েটি চঞ্চল হয়ে মুখের ঘোমটা সরিয়ে চারিদিকে চাইলে—নরসিংয়ের নাম শুনে ফটকী তাকেই খুঁজছিল। নরসিংয়ের দিকে চেয়ে তার চোখ জলে ভ'রে উঠল। উকিলবাবুর হাতের চিমনির আলো তার চোখ-ভরা জলের উপর ছটা ফেলেছে।

শুখনরাম নরসিংকে দেখে বিরক্ত হয়েছে—বিব্রত হয়েছে, এটা বুঝতে পারলে নরসিং। শুধু বুঝতে পারলে না একটা কথা। ফটকীকে এখানে এক রাত্রির জন্য দিয়ে যাচ্ছে শুখনরাম, অথবা চিরদিনের জন্য? শুখন নরসিংকে বললে—উকিলবাবু আপনাকে যানে বলছেন সিংজী।

যাব। আর দুটো কথা আছে।

সে কাল হবে। রামধনি! ডাকলেন উকিলবাবু।—এই নূতন ঝিকে নিয়ে যা। বুঝলি?

শুখনরাম বললে—খাস্‌বাবুর ঘরের কাজকাম করবে—বাবুকে সেবা-উবা করবে। খ্যা-খ্যা ক'রে হাসতে লাগল শুখনরাম। উকিলবাবু ধমক দিয়ে বললেন—থাম, থাম। সে ও জানে। যাও গো তুমি, এর সঙ্গে যাও।

শুখনরাম ফটকীকে বললে—যা না রে।

নরসিং স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ফটকীর দিকে। রাত্রে ফটকীর চেহারা বদলাত আগে, বাঘিনীর মত চোখ জলত, কিন্তু ফটকী আজ অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। আজই হয়েছে, কি কতদিন হয়েছে, কে জানে! আজ কিন্তু নরসিংয়ের চোখে পড়ল। তার আজকার এমন চেহারা আর কখনও নরসিং দেখে নি। প্রথম যেদিন নরসিং মাঠের মধ্যে তিরস্কৃতা ম্লানমুখী ফটকীকে

দেখেছিল—সে চেহারাও তার মনে আছে, সেদিন পথে যেতে তার মনে হয়েছিল—মেয়েটি যেন গরুর গাড়ীর চাকায়-লাগা টুকরো মাটির মত, অসহায়ের মত, চাকায় লেগে দেশ থেকে দেশান্তরে চলছে। আজকার চেহারা তার অত্যন্ত করুণ। ফটকী এ জীবনে কখনও কাঁদে নি। শুধু হেসেছে; সে কি হাসি! কাচের পেয়ালার আওয়াজের মত আওয়াজ বেজে ওঠে সে হাসিতে। মদভর্ত্তি কাচের পেয়ালার মতই ফটকী—তাকে যে আদর করে তুলে মুখে ধরেছে, তারই মুখে সে ওই হাসির আওয়াজ নেশার মৌজ জুগিয়েছে। হঠাৎ যেন মদ-ভরা কাচের পেয়ালা দুধ-ভর্ত্তি জয়পুরী শ্বেতপাথরের গেলাস হয়ে গিয়েছে যাদুর মত কিছুর ছোঁয়া লেগে। রাত্রের অন্ধকারে আসত, আলো জ্বালতে সাহস করত না; নরসিং ঠাওর করতে পারে নি ফটকীর এ পরিবর্ত্তন। সুন্দর রঙ ফটকীর, সাদার সঙ্গে একটা লালচে আভা খেলত; আজ সে লালচে আভা কেউ যেন মুছে দিয়েছে।

রামধনি খানিকটা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ফটকী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এক পা নড়ে নি। এক নূতন দৃষ্টি চোখে নিয়ে নরসিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টি কিছু বলছে। কি বলছে সে কথা শুখনরাম বুঝতে পারলে না, উকিলবাবু বুঝতে পারলে না, কিন্তু নরসিংয়ের বুঝতে ভুল হ'ল না। চোখের কোল-ভরা জল তারা না-দেখে-দেখে আজ আর দেখতেই পায় না।

শুখনরাম এবার ধমকে দিয়ে উঠল—আরে হারামজাদী, তুর কানে আসছে না বাত—না কি?

পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে শুখনরাম তাকে সামনে ঠেলে দিলে।—যা-ও।

অতর্কিতে ধাক্কা খেয়ে ফটকী হয়ত উপুড় হয়ে পড়ে যেত; কিন্তু নরসিং তার আগেই এগিয়ে এসে দুই হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেললে। শুধু ধরে ফেলে তাকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েই ক্ষান্ত হ'ল না, সকল বিপদের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে সমস্ত সঙ্কোচ লজ্জাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজের পাশে টেনে নিয়ে বললে—না।

এই আকস্মিক ঘটনায় এবং নরসিংয়ের গলার আওয়াজে শুখনরাম-উকিলবাবু চমকে উঠলেন, রামধনির হাতে একটা কাচের গেলাস ছিল—সেটা তার হাত থেকে পড়ে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ভেঙে গেল।

উকিলবাবু হাজার হলেও উকিলবাবু—তিনি সর্ব্বাগ্রে সামলে নিয়ে নরসিংয়ের স্পর্দ্ধায় রাগে জ্বলে উঠে চীৎকার করে উঠলেন—ই-উ সোয়াইন!

নরসিং চীৎকার করে উঠল—খবরদার! তারপর ফটকীর হাত ধ'রে টেনে বললে—আয়, চলে আয়।

উকিলবাবু বললেন—তোমাকে আমি জেলে দেবো। আমার ঝি—

নরসিং বললে—ও আমার পরিবার।

বেটা সয়তান, তুই ছত্রি আর ও সদ্‌গোপ-বিধবা; তোর পরিবার?

হাঁ হাঁ। আমি মর্দ্দানা ও আমার আওরৎ। ছত্রি? সদ্‌গোপ? হা-হা করে হেসে উঠল নরসিং। এতক্ষণে শুখনরাম চীৎকার ক'রে উঠল—বন্দুক—বন্দুক—আপনার বন্দুকঠো নিকলান ওকিলবাবু—বন্দুক।

নরসিংয়ের হাসি তখনও থামে নাই, এ কথায় সে হাসিতে তার আবার জোর ধ'রে গেল। সে পকেট থেকে বড়-ফলার চাকু-ছুরিটা বার করে খুলে ফেললে।

*　　　*　　　*　　　*

মফস্বলের শহর, তাও সদর-শহর নয়—মহকুমা-শহর। বড় রাস্তায় টিম্‌টিমে কেরোসিনের আলো জ্বলে এখানে ওখানে একটা। গলিপথগুলোর এ-মাথায় একটা আলো ও-মাথায় একটা আলো, মাঝখানটা অন্ধকার। সেই অন্ধকার গলিপথে হনহন করে চলেছে নরসিং। ফটকীকে ছুটতে হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গ রেখে। নরসিংয়ের এক হাতে টর্চ, এক হাতে সেই ছুরিটা। মধ্যে মধ্যে টর্চটা জ্বেলে পথ দেখে নিচ্ছে। মনে কোন ভাবনা-চিন্তার অবসর নাই। সকল ভাবনা-চিন্তার আজ একটা ফয়সালা হয়ে গিয়েছে। নরসিং জানে, সে বিশ্বাস করে, মানুষের ভাবনা-চিন্তায় দুনিয়ার কোন কিছুরই

ফয়সালা হয় না। ফয়সালা-করনেওয়ালা একজন আছেন, তিনিই ক'রে দেন সকল কিছুর শেষ রায় হুকুমনামা, তার উপর আর কোন আর্জ্জি-আদালং চলে না। নইলে ঠিক যখন এখানকার হাটের সকল ভালমন্দ লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ হয়ে গেল, মোটর সার্বিসের জন্য যখন আর কারুর খাতির রেখে মন জুগিয়ে চলবার আর প্রয়োজন রইল না, উকিলবাবু শুখনরাম এঁদের কারুর সঙ্গেই নির্ভয়ে সোজা তকরার করতে একটুকু ভয়ও আর তার রইল না, তখন ঠিক সেই মুহূর্ত্তটিতেই ফটকীর সম্বন্ধে একটা ফয়সালা করবার জন্য তিনি তাকে পাঠিয়ে দিলেন কেন? উকিলবাবু যদি নরসিংয়ের প্রস্তাবে আপত্তি না করতেন, তা হ'লে নরসিং কি করত কে জানে? সে কি এমনিভাবে ফটকীকে নিয়ে ছুরি ঘুরিয়ে চলে আসত? না, চুপ করে মুখ নামিয়ে বসে থাকত, ফটকী কিছুক্ষণ কেঁদে চোখ মুছতে মুছতে উকিলবাবুর অন্দরে গিয়ে ঢুকত, নরসিংও ফিরে এসে খুব মদ খেত, হা-হুতাশ করত? কোন কসবীর বাড়ী যেত? বড় জোর মেরী নীলিমার কথা নিয়ে মনে মনে কাহিনী তৈরী করত? সে মনে মনে বললে—দুনিঁয়াদারীর মালেক শিউশঙ্কর রাম ভগবান—তোমার পায়ে হাজার বার পরণাম। মানুষ কি নিজের মন বুঝতে পারে? বার বার তার ভুল হয়। অবতার যে রামচন্দ্র, তিনি বুঝতে পারেন নাই—নরসিং তো ছার মতিভ্রষ্ট মোটর ড্রাইভার। সীতাকে রাবণ হরণ করে নিয়ে গেলে—রামজী কাঁদলেন, সে কান্নায় পশু কাঁদল, গাছের পাতা ঝরে গেল, বনের বানর কাঁদল, তাঁর সাথী হল, দরিয়ার তুফানের উপর পাথর ভেসে রইল, রামচন্দরজী লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে মেরে সীতাকে উদ্ধার করলেন। বাস্, তাঁর ভুল হয়ে গেল। ইজ্জং বড়, না, সীতা বড়—এই নিয়ে সওয়ালজবাব করতে গিয়ে চুক হয়ে গেল তাঁর। বললেন—আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে সীতাকে। সীতা আগুনে ঝাঁপ দিলেন। বাস্, তখন রামজী বুঝলেন—কার দাম বড়। ধূলার উপর লুটিয়ে পড়লেন—কাঁদলেন। সে কান্নায় আগুন নিভে গেল—বেরিয়ে এলেন সীতামাই। অযোধ্যায় এলেন। রামচন্দর, রাজা হলেন; আবার

প্রজার কথায় ভুল করলেন। এই ভুল করেই তো চলছে দুনিয়ার মানুষ। মন একবার বুঝেও আবার ভুল করে বসে। মহারাজা রামচন্দর অযোধ্যাপতি! তাঁর যে ইজ্জৎ, কি তাঁর যে রাজ্য সে তাঁর উপযুক্ত, তার মোহে তিনি ভুল করেছেন। নরসিংয়ের পক্ষে এই সার্বিসই তার রাজ্য। আজ যদি শ্যামনগর-পাঁচমতীর মনোপলি সার্বিসের অংশীদারীর পাট তার থাকত—তবে সেও নিশ্চয় এমনই ভুল করত। ওই মোহ ছুটে যাওয়াতেই যে ফটকীর দাম কত তার কাছে—এক লহমায় বুঝতে পারলে। চোখের সেই দৃষ্টি আর জল এই দুই দিয়ে ফটকীও তার দাম তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। ওই দুটি না দেখলে নরসিং কিছুতে বুঝতে পারত না। কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য! ঝুটো-কাচ ফটকী এমন ক'রে সাচ্চা পাথর হয়ে উঠল কি করে? কিসের যাদুতে? যার যাদুতেই হোক—হয়েছে—সে নিয়ে সে আর ভাববে না। দিন-দুনিয়ার মালিক, যাঁর যাদুতে দুনিয়ায় দিন-রাত্রির খেলা চলছে, যাঁর যাদুতে পাখীতে গান গায়, ফুলে সুবাস বিলায়, যাঁর যাদুতে ছোট খুকী বড় হয়ে হয় বহুড়ী, বুকে তার জমে মউফুলের মধু, বহুড়ী হয় মা, বুকের মৌ-ফুলের মধু হয়ে যায় ক্ষীর—এ হ'ল সেই দিন-দুনিয়ার মালিকের যাদু। সেই মালিকের কাছে নরসিং বার বার আর্জি জানালে—সকল যাদুর সেরা যাদুওলা, সকল হাকিমের শেষ হাকিম, ফটকীর উপর এই যেন তোমার শেষ যাদু হয়, এই যেন তোমার শেষ হুকমৎ—শেষ রায় হয়।

একটু আস্তে চল।—ফটকী হাঁপাচ্ছে, সে আর চলতে পারছে না।

আস্তে?

হ্যাঁ।

নরসিং বসে পড়ল মাটিতে। বললে—আমার গলা জড়িয়ে ধরে পিঠে চেপে নে।

না।

না নয়। এখুনি জলদি গিয়ে আমাকে গাড়ীখানা বার ক'রে নিতে

হবে সাহু বেটার ওখান থেকে। বেটা যদি এসে গাড়ীটা আমার আটকে দেয় তো মুস্কিল হবে। চেপে নে।

ফটকী আর আপত্তি করলে না। অন্ধকার গলিপথে ফটকীকে পিঠে নিয়ে নরসিং চলতে লাগল। হঠাৎ তার একটা কথা মনে হল। মনে হ'ল যাদুর মন্তরটা সে জানতে পেরেছে। ঠিক তাই। সে ডাকলে, ফটকী!

কি?

একটা কথা শুধাব, ঠিক জবাব দিবি?

বল।

ঠিক জবাব দিবি?

তোমার গা ছুঁয়ে কি মিছে কথা বলতে পারি আমি?

তোর বাচ্ছা, মানে, ছেলে হবে—নয়?

ফটকী বলে উঠল—ধ্যেৎ!

আমি বুঝেছি রে আমি বুঝেছি।

ফটকী বললে—না—না—না। তোমাকে ছুঁয়ে মিছে আমি বলব না।

তবে?

কি তবে?

সেই ফটকী তুই এমন হলি কেন? উকিলবাবুর বাড়ীতে তো খুব সুখে থাকতিস। বুড়োর পরিবার নাই, বড়লোক, তুই তো ওকে নাকে দড়ি দিয়ে ওঠাতে বসাতে পারতিস!

ফটকী জবাব দিল না।

আমার সঙ্গে এলি কেন?

জানি না।

জানিস না?

না। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না।

নরসিং হয়তো হাসত এ কথায় কিন্তু হাসতে পারলে না, তার ঘাড়ে ফোঁটা

ফোঁটা গরম কিছু পড়ছে। সে চমকে উঠল। ফটকী কাঁদছে! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নরসিং বললে—কাঁদিস না ফটকী। নে, এখন নাম্। এসে গিয়েছি। তুই এই গাছতলায় দাঁড়া। আমি গাড়ীটা বার করে আনি।

এখুনি পাঁচমতী যাবে?

না। আমার এক দোস্ত আছে এখানে—তার বাড়ী যাব।

* * * *

জোসেফের বাড়ীতে উঠল নরসিং। বাড়ীর কাছে এসে নরসিংয়ের একটু দ্বিধা হ'ল; ভয়ও হ'ল। নীলিমা? সে কি ভাবে গ্রহণ করবে তাদের? হয়তো ঘেন্নায় মাটির উপর থুথু ফেলবে! বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে চোখা-চোখা কথা বলবে! হয়তো বলবে—এই ধারার জঘন্য কারবারের মধ্যে তারা নিজেদের জড়াতে পারবে না! জোসেফকে সে ভয় করে না, সেই তার ভরসা, সেও মোটর ড্রাইভারী করে। একসঙ্গে তারা মদ খায়।

আশ্চর্য্যের কথা কিন্তু, নীলিমা ঠিক উল্টো ব্যবহার করলে—নরসিংয়ের সঙ্গে ফটকীকে দেখে প্রশ্ন করলে—এটি? এটি কে নরসিংবাবু?

নরসিং এক মুহূর্ত্ত ভেবে নিয়ে বললে—ওটি? ওকে আমি ভালবাসি মিস দাস। মানে, ওকে আমি বিয়ে করব। নীলিমার কাছে বিয়ে করব কথাটা ব'লে ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ পবিত্র না করে পারলে না।—মানে, বিধবা বিয়ে।

বলেন কি? দেখি—দেখি কেমন বউ হবে? নীলিমা বাঁ হাতে ফটকীর ঘোমটা সরিয়ে ডান হাতে হারিকেনটা তুলে ধরলে। ফটকীকে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল, বললে—বাঃ বাঃ, এ যে ভারি সুন্দর বউ হয়েছে নরসিংবাবু! আমাদের খাওয়াচ্ছেন কবে?

খাওয়াব। তার আগে যে বিপদে পড়েছি তা থেকে উদ্ধার করুন। জোসেফ কই?

সে আজ খুব নেশা করেছে, বিছানায় পড়ে হাত পা ছুঁড়ছে, বিড়বিড় ক'রে বকছে। কিন্তু বিপদটা কি?

চিন্তিত হয়ে নরসিংহ বললে—তাই তো ?

তাই তো বলে চিন্তা কেন ? আমাকে বলুন না। আমি কিছু করতে পারি কি না ভেবে দেখি।

শুনবেন ? কিন্তু—

কিন্তুটা কিসের ?

একটু ভেবে নিয়ে নরসিং বললে—শুনুন। কিন্তু আর কিসের ? ঠিক কথা। সে পকেট থেকে শিশিটা বার ক'রে অবশিষ্ট মদটুকু নিঃশেষে খেয়ে বললে—আপনার দাদা মোটরের কাজ করে। খানিকটা তো বুঝতে পারেন আমাদের ধাত। মেয়েটিকে এনেছিল—কিনে এনেছিল ওর বাপের কাছ থেকে শুখন সাহু। আমিই গাড়ীতে নিয়ে এসেছিলাম শুখনকে আর ওকে শ্যামনগর। তারপর—

হেসে নীলিমা বললে—ভালবাসা হ'ল দুজনে।

হ্যাঁ। আজ হঠাৎ বুড়া উকিলবাবুর কাছে শুখন সাহু ওকে বিক্রী করতে যাচ্ছিল। আমি ছিনিয়ে নিয়ে চলে এসেছি।

বেশ করেছেন।

ওরা যদি পুলিশে খবর দিয়ে জবরদস্তি ক'রে মামলা করে ?

মেয়েটি তো বলবে, ও আপনার সঙ্গে ইচ্ছে করে এসেছে ? কি ভাই— কি বলছ ?

ফটকী সলজ্জভাবে হেসে মুখ নামালে।

নরসিং বললে—ওকে তো ওর বাপ বিক্রী করেছে।

হেসে নীলিমা বললে—এ যুগে মানুষ কেনা-বেচা হয় না। তবে অন্য রকম মিছে মামলা করে হয়রান করতে পারে। বেইজ্জত করতে পারে কোর্টে।

বেইজ্জতি ?—হেসে উঠল নরসিং।

একটু চুপ করে থেকে নীলিমা বললে—আসুন আমার সঙ্গে। সাবধান হওয়া ভাল।

কোথায় ?

রেভারেণ্ড ব্যানার্জ্জীদের বাড়ী। ওঁদের বাড়ীর ছোটছেলের কাছে। তাঁর পরামর্শ নিয়ে যদি পুলিশে কি এস-ডি-ওর কাছে খবর দিয়ে রাখতে হয় তো দিয়ে রাখতে হবে।

বেশী দূর নয়, কিন্তু খুব কাছেও নয়। ক্রিশ্চানপাড়ার দীঘিটার উত্তরপাড় আর দক্ষিণপাড়। মধ্যে পূর্ব্বপাড়ে গির্জ্জা, মিশন, সমাধি-ক্ষেত্র। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য যারা ক্রিশ্চান হয়েছিল—তারা আভিজাত্য বজায় রেখে দক্ষিণ দিকে বাড়ী করেছিল।

অন্ধকার নির্জ্জন পথে নীলিমার সঙ্গে পাশাপাশি চলতে চলতে নরসিংয়ের মন যেন কেমন অনুশোচনায় ভরে উঠল। এই কালো মেয়েটি, এই তার আকাশের ফুল! আকাশের ফুল—রাত্রের অন্ধকারে আকাশে-ফোটা ফুল ফেলে সে মাটিতে-ফোটা ফুল তুললে অবশেষে? অথচ—অথচ তার মনে হচ্ছে, সে ইচ্ছে করলেই আকাশের তারাফুল পেতে পারত। নীলিমা নীরবে পথ চলছে। কোন কথা আর বলে না। কি ভাবছে নীলিমা? ইচ্ছে হচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে নীলিমার মুখে হাত বুলিয়ে দেখে, আঙুলের ডগায় গরম জলের স্পর্শ পাওয়া যায় কি না! কিন্তু আত্মসম্বরণ করলে সে।

রেভারেণ্ড ব্যানার্জ্জীর ছোট ছেলে লেখাপড়া জানা লোক। এককালে বসন্ত হয়ে একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে ব'লে ক্রিশ্চান হওয়া সত্বেও ভাল চাকরী পাওয়া সম্ভবপর হয় নি; সারা মুখে বসন্তের দাগে ভদ্রলোককে কুৎসিত দেখায়। কিন্তু লোকটি বড় ভাল। নীলিমা তাঁকে সব বলতেই তিনি বললেন—মেয়েটিকে মিশনে এনে রেখে দাও রাত্রে। তারপর যা হয় কাল করব। নরসিংকে বললেন—কিছু হবে না এতে। ভয় নেই, কোন ভয় নেই।

নীলিমা বললে—কাল নয়, আজই।

অন্ধকার রাত্রি, তার উপর একটা চোখ নেই—

হেসে নীলিমা বললে—একটা তো আছে। ওতেই হবে। মিষ্টার সিংয়ের গাড়ীতে যান আপনি।

হ্যাঁ। নরসিং সায় দিলে।

হেসে ব্যানার্জ্জী বললে—আচ্ছা।

চলুন। নীলিমা বেরিয়ে গেল নরসিংয়ের সঙ্গে। বেরিয়ে এসে বললে—দাঁড়ান। আবার সে ভিতরে গেল।

অন্ধকারের মধ্যে আকাশের তারার দিকে চেয়ে নরসিং দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল নীলিমার কথা। এ কি মেয়ে! এর সঙ্গে কি ফট্‌কীর তুলনা হয়! এ মেয়ে নরসিংদের জীবনে শুধু স্বপ্ন! কিন্তু না, অনুশোচনা সে করবে না।

ঠিক তো?—বলতে বলতে বেরিয়ে এল নীলিমা।

ঠিক।—ব্যানার্জ্জীও বেরিয়ে এসেছেন।

নরসিংবাবুকে বলি তা হ'লে?—নীলিমা বললে।

হ্যাঁ, বল।

চলুন।—নীলিমা বললে নরসিংকে।

অন্ধকারে আবার দুজনে চলল। নরসিং বললে—আমাকে কি বলতে বললেন ব্যানার্জ্জী?

ব্যানার্জ্জী না—আমি। আমি বলব আপনাকে।

কি?

আপনাদের উপকার করছি—তার বদলে আমার, মানে—আমাদের একটা উপকার করতে হবে। কাল রাত্রে আমাকে আর ব্যানার্জ্জীকে ঘাটরোড স্টেশনে পৌঁছে দিতে হবে। কাউকে না জানিয়ে—দাদাকে পর্য্যন্ত না।

নরসিং থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

নীলিমা বললে—আমার মায়ের আপত্তি উনি কানা ব'লে, দেখতে কুৎসিত ব'লে; ওঁদের বাড়ীর আপত্তি—আমাদের ঘরের মেয়ের সঙ্গে ওঁদের কারও বিয়ে আজও হয় নি। অথচ আমরা অনেক দিন থেকেই পরস্পরকে ভালবাসি।

উনি আমাকে ম্যাট্রিকের সময় পড়া বলে দিতেন, সেই সময়—। হাসতে লাগল নীলিমা।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ পর সে আবার বললে—এবার আমাদের বিয়ে করতেই হবে নরসিংবাবু।

নরসিং প্রশ্ন করলে—কোথায় যাবেন ?

কলকাতা। এখানে অনেক হাঙ্গামা হবে। দু পক্ষের ঝগড়া-ঝাঁটি। কলকাতাই সব চেয়ে ভাল জায়গা। কিছুক্ষণ পর আবার সে প্রশ্ন করলে—ও রাস্তায় তো সাহুরা মনোপলি সার্বিস করছে। আপনি কোথায় যাবেন ?

নরসিং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—দেখি। এখন তো এখানেই থাকতে হবে। পাঁচমতীর রাস্তায় কাঁকর পাথর ফেলছে, নোটীশ দিয়ে রাস্তা বন্ধ ; গাড়ী নিয়ে ওদিকে বেরুবার পথ নেই। এদিকে ঘাটরোডে গঙ্গা। পথ ঘাট শুকুক। আমিও ভেবে দেখি—কোথায় যাব। যাব কোথাও। এত বড় দুনিয়া! একটা পথ ধরব।

নীলিমার কানে নরসিংয়ের উদাস ভাবটুকু এড়িয়ে গেল না; নরসিংয়ের দুঃখের স্পর্শ তাকেও ব্যথিত ক'রে তুললে। সত্যই তো দুঃখের কথা। নরসিং ভাঙা-চোরা পথে প্রথম সার্বিস খুলে দিলে। আজ সেই পথ মেরামত করে আর একজনকে মনোপলি সার্বিস দেওয়া হলে তার দুঃখ হওয়ারই কথা। সে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—আপনি খুব দুঃখ পেয়েছেন, না? দুঃখ পাবারই কথা।

নরসিং কথার জবাব দিলে না। তার মাথার মধ্যে জটিল চিন্তা পাক খাচ্ছিল। দুঃখ—দারুণ দুঃখ তার মনে রয়েছে। সেটা কিসের জন্যে সে তা বুঝতে পারছে না। পকেট থেকে বার করলে মদের শিশিটা। কিন্তু শিশিটা খালি। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সে মদের শিশিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

নীলিমা হাসলে, বললে—ফুরিয়ে গিয়েছে ?

উত্তর দিলে না নরসিং। গাড়ী বার করতে ব্যস্ত হ'ল।

নীলিমা বললে—ভালই হয়েছে। বেশী না খাওয়াই ভাল। একটা কাজে আছেন।

নরসিংয়ের আফশোষ হ'ল। আর এক শিশি হলে সে পারত। এই মুহূর্ত্তে গাড়ীর মধ্যে নীলিমাকে টেনে তুলে নিয়ে ছেড়ে দিতে পারত গাড়ীটা। কিম্বা ব্যানার্জ্জীকে গাড়ীতে চাপিয়ে একটা গাছে কি লাইটপোস্টে ধাক্কা মারতে পারত।

হঠাৎ সে সজাগ হয়ে উঠল। ফুটব্রেক কষে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে সে সামলে নিলে। দীঘির ধারে এসে পড়েছিল গাড়ীটা। আরে বাপ! ছুটে গেল তার নেশা।

নীলিমা হেসে বললে—যাক্, সামলে নিয়েছেন। সাবধান, খুব সাবধানে চালাবেন কিন্তু। গুড্ লাক্!

এবার নরসিংও মৃদু হেসে বললে—গুড লাক্! আপনাকে গুড লাক্ জানাচ্ছি।

উনিশ

সেই বাদশাহী সড়ক। উঁচু নীচু, গর্ত্ত-গচকা ধূলো-কাদা-ভরা কত শ' বছরের পথ; দুপাশে গাছের সারির তলায় আগাছার জঙ্গল, কুলকাঁটার ঝোপ ভর্ত্তি করে রেখেছিল। মধ্যে মধ্যে ঝোপের ভিতর থেকে সাপের হিস্-হিস্ শব্দ শোনা যেত, সাপে-ধরা ব্যাঙের কাতরানির আওয়াজ উঠত। রাত্রে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতরে শেয়াল-নেকড়ের চোখ জ্বলতে দেখা যেত—জ্বলন্ত আঙরার টুকরোর মত। মধ্যে মধ্যে পাথরের মাথা উঠে থাকত, সে পাথরে যে কত কালের কত লোকের জখম নখের রক্ত লেগেছে তার হিসেব নাই। কাদাভর্ত্তি খন্দকে কতলোকের জুতো বসে থেকে গিয়েছে—তারই বা কে হিসেব রাখে?

আছাড়-খেয়ে পড়ে গিয়েছে এমন লোকের কত কিছু হারিয়েছে, মেয়েদের কানের টাপ, হাতের বাজুর ঘন্টি, গলার মাদুলীও কি না খসে পড়েছে সেই ধুলোকাদায় জরাজীর্ণ সড়কের বুকে ?

সে বাদশাহী সড়ককে আজ আর চেনা যাচ্ছে না। নতুন চেহারা হয়ে গিয়েছে তার। ঢিলে-চামড়া গাল-তোবড়ানো কুৎসিত বুড়ো ইঞ্জিনিয়ার হাকিমের তাজা দাওয়াইয়ে আঁটসাট-গড়ন চকচকে-চামড়া কাঁচা-জোয়ান হয়ে উঠেছে। তিরিশ ফুট চওড়া রাস্তার দু পাশে ফুটপাতের মত ছ ফুট করে বারো ফুট বয়লারের ছাইঢাকা কাঁচা—মাঝখানে ষোল ফুট পাকা; লাল মোরামের আস্তরণ বিছানো সমতল ঝকঝকে-তকতকে চোখ-জুড়ানো ষোল ফুট চওড়া লাল ফিতের মত পথ। দু পাশের ছাই-বিছানো ধূসর রঙের মাঝখানে টকটকে লাল —ভারী বাহার দিয়েছে। ধূসর রঙের দু পাশের কাঁচা অংশের কিনারায় দূর্ব্বাঘাসের চাপড়াবন্দী চলে গিয়েছে সিধে লাইন ধরে। আগাছা কুলঝোপ বিলকুল সাফ হয়ে গিয়েছে। চোখে যেমন বাহার দিচ্ছে—চ'লেও মানুষ তেমনি আরাম পাবে, কুলকাঁটা শুকিয়ে ঝরে পায়ে ফুটবে না, মাথা-তুলে-থাকা পাথরে হোঁচোট লেগে নখ যাবে না। কাদায় পিছলে পড়ে মানুষ আছাড় খাবে না। শুধু কষ্ট হবে গরুর, ধুলো কাদার মধ্যেই ওদের চলতে আরাম, ছেলেবেলায় পড়েছে নরসিং—'গরুর ক্ষুর চেরা বলিয়া'—। আর কষ্ট হবে কিছু খালি পায়ে যে সব মানুষ হাঁটে তাদের; খুব বেশী হবে না— আজন্ম খালি পায়ে হেঁটে ওদের পায়ের তলার চামড়া এমন শক্ত যে শুকিয়ে নিয়ে ঢাল তৈরী করা যায়। আর কষ্ট হবে সেই বেটা হাঁটুভাঙা খোঁড়ার— যে লোকটা হামগুড়ি দিয়ে শ্যামনগর থেকে পাঁচমতী পর্যন্ত ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়। তা সেও ঠিক ফিকির বার ক'রে নেবে কয়েকদিনের মধ্যে, হাঁটুতে চটের প্যাড লাগিয়ে নেবে, হাতে ফিতে-বাঁধা খড়মের মত দুটো চাকতি লাগিয়ে খট্‌খট্ থপ্‌থপ্ ক'রে চলবে। না চলতে পারে, বাস সার্বিস হ'ল— বাসে ভাড়া দিয়ে যাবে আসবে। গাড়ীর জন্যেই পথ সড়ক, পায়ে যারা

হাঁটবে তাদের জন্যে শহরে গাঁয়ে গলি—মাঠে-প্রান্তরে 'গোন' আছে, সেই পথে তারা চলুক। 'গোন' হল—মাঠ, পতিত জমি, বনের মধ্যে দিয়ে গাড়ী চলা ফালি পথ; গহনের মধ্যে দিয়ে সেই হল 'গোন'। ইমামবাজারের বড়বাবু বি-এ পাস, তিনি বলতেন কথাটা। বিশ্বাস না কর জিজ্ঞাসা কর এখানকার তেমুণ্ডে বুড়োদের—বাদশাহী সড়কের কথা। কত কাল—কত শ' বছর আগে কোন নবাব কি বাদশা তৈরী করিয়েছিলেন এই সড়ক তা তারা জানে না—কিন্তু কেন তৈরী করিয়েছিলেন সে তারা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে। তৈরী করিয়েছিলেন তাঁর ফৌজ যাবে বলে। পয়দল পল্টন যেত নাল-মারা জুতোর আওয়াজ তুলে—কুচকাওয়াজের কায়দায় একসঙ্গে পা ফেলে—হাত দুলিয়ে, তলোয়ার বাগিয়ে, বন্দুক উঁচিয়ে। ঘোড়সওয়ার যেত চার ক্ষুরে ধুলো তুলে, আওয়াজ তুলে। হাতী যেত হাওদা পিঠে—আরও হাতী যেত তোপ টেনে নিয়ে, উট যেত সওয়ার নিয়ে, গাড়ী টেনে—উটের গাড়ীতে যেত সরঞ্জাম, বয়েল চলত পিঠে ছালা নিয়ে, বয়েল গাড়ী যেত, তাতে যেত, বিবি-বাঁদি আর যেত রসদ। বুড়োরা বলে—"গল্প নয় বাবা। জমিদার-বাড়ীর পুরনো কাগজে প্রমাণ আছে, দেখে এস; ঘোড়ায় হাতীতে উটে ধানের ক্ষেত মাড়িয়ে যাবে না—খেয়ে তছনছ করে দেবে না—এর জন্যে মাথট লাগত—নজর সালামী মাথট।"

বাদশাহী ফৌজ চলে যেত—তারপর জমিদার আমীরের হাতী ঘোড়া পাল্কী বয়েল গাড়ী, পাইক বরকন্দাজ লোক লস্কর। তারপর সড়কে চলত ব্যাপারীদের কারবার, ছালার বয়েল, ছালার ঘোড়া, মালের গাড়ী। তারপর চলত গৃহস্থ চাষীরা—ক্ষেত খামারের ধান চাল কলাই তিসির বস্তা বোঝাই নিয়ে ভারী মজুর চলত ভার কাঁধে—তারপর চলত রাহী।

এবার ইংরেজের আমলে সেই কাঁচা সড়ক হল পাকা। বিলাত না আমেরিকার পেট্রোল-কোম্পানী মোটর-কোম্পানী দিলে টাকা। সেই টাকায় মেটে রাস্তার উপর বিছানো হ'ল ইটের খোয়া, তার উপর দেওয়া হল পোড়া

কয়লার ছাই আর কুঁচি পাথর, চালানো হল রোলার—সমান হয়ে বসে গেল পাকা ইমারতের মেঝের মতন—তার উপর দেওয়া হল লাল মোরাম, ফের চালানো হল রোলার ; দু পাশের ঝোপ আগাছার জঙ্গল কাটা হল ; সাপ মরল, বিছে মরল, গোসাপ মরল ; উই-পোকা পিঁপড়ে মরল—সে চোখে দেখা গেল না—মাটির তলায় চাপা থাকল। তার উপর ঢালা হল বয়লারের ছাই। চালানো হল রোলার। দু দিকে ধারি কাটা হল দড়ি ধরে, ঘাসের চাপড়া বন্দী ক'রে ঘাসের শিকড়ের জালের বাঁধন দেওয়া হল মাটিতে। পাকা হয়ে গেল রাস্তা। মাঝখানে পুরা পাকা, দুটো ধার আধ-পাকা। মাঝখানে চলবে মোটর বাস ট্যাক্সী ট্রাক ; সেই আমেরিকা থেকে আসবে মোটর পেট্রোল মোবিল টায়ার টিউব, এখানে পাকা রাস্তায় চলবে ফুল স্পীডে। দু পাশের আধ-পাকা রাস্তার ফালিতে চলবে গরুর গাড়ী, ছালার গরু, রাহী মানুষ। নরসিং বলে—বাদশাহী সড়ক, আংরেজী ইষ্টিরিট্ ব'নে গেল। কখনও বলে—রোড। রোড কি ইষ্টিরিট্ কোন্‌টা ঠিক সে তা জানে না। 'ইষ্টিরিট্' শব্দটা তার বেশী ভাল লাগে ব'লে ওইটাই ব্যবহার করে বেশী।

এই রাস্তায় মনোপলি সার্বিস নিয়েছে—'সাহু এ্যাণ্ড বোস ট্রান্‌স্‌পোর্টস'। শুখনরাম সাহু আর সেই বুড়ো বোসবাবু উকিলের বেকার ছেলে। ঝকঝকে সবুজ রঙের দুখানা 'এক টনি' বাস এসেছে—একখানার নাম "জয় গণেশ" অন্য খানার নাম 'উল্কা', পাশে ইংরাজীতে লেখা Express (এক্সপ্রেস)। একখানা আপ—একখানা ডাউন গাড়ী। আরও এসেছে একখানা ট্যাক্সী, একখানা ট্রাক। পাঁচমতীর বাবুদের তিন বাড়ীর তিনখানা মজবুত সস্তা ফোর্ড গাড়ীর অর্ডার গিয়েছে।

রাস্তা আজই খুলেছে। কালেক্টর সা'ব এসে রূপোর কাঁচি দিয়ে কেটে দিলে লাল ফিতের মাঝখানটা। বাস্—বেরিয়ে গেল সার্বিসের দুখানা বাস। তারপর হল চা খাওয়া।

সেই দিন থেকে চার মাস পর। শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন ও কার্ত্তিক পার হয়ে

গিয়েছে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম। আজ রাস্তা খুললে, সাহু কোম্পানীর সার্বিস আরম্ভ হল। নরসিংও আজই চলল শ্যামনগর থেকে। আর একটা দিন সে এখানে থাকতে পারবে না। ভাঙাচোরা ধুলোয়-কাদায় গর্ত্ত-গচকায় কাঁটায়-পাথরে ভর্ত্তি রাস্তায় নিজের সর্ব্বস্ব ওই গাড়ী তার সঙ্গে নিজের প্রাণকে বিপন্ন ক'রে সেই প্রথম খুলেছিল সার্বিস, আজ এই নতুন রাস্তায় সেই লাইন থেকে উৎখাত হল—আর শ্যামনগরে সে থাকতে পারবে না। সেও চলেছে আর একদিক লক্ষ্য করে। চার মাস বসে আছে—এখান থেকে বেরুবার রাস্তা ছিল না। তা ছাড়া হাঙ্গামায় পড়েও আটক হয়ে গিয়েছে।

সাহু মামলা করেছিল—ফটকীর জন্যে। নিজে নয়, সে আর উকিলবাবু আড়ালে থেকে—ফটকীর দেওর আর বাবাকে দিয়ে মামলা করিয়েছিল। বহুৎ তোড়জোড়—নানান আঁকাবাঁকা ফন্দি-ফিকিরের সে জাল। সাজা হলে নরসিংকে চালান দিত দায়রায়, সেখানে কালাপানি বেত দুই-ই হতে পারত। খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছিল—"মোটর ড্রাইভারের কুকীর্ত্তি! নারীহরণ!"

সাহুর টাকায় এখানকার এক বাঘা উকিল—বুড়ো উকিলবাবুর পরামর্শ নিয়ে সওয়াল করেছিল—"এই যে আসামী, এর প্রকৃতির দুটি কথা আমি সর্ব্বাগ্রে বলতে চাই। এ হ'ল গিরবরজার ছত্রির ছেলে। এই বংশটির মধ্যে নারীঘটিত কুকীর্ত্তি একটা কুখ্যাতি লাভ করেছে। এর জন্যে এরা ধ্বংস হয়ে গেল। আর এ হ'ল পেশায় মোটর ড্রাইভার। মোটর ড্রাইভারদের পক্ষে একটা অতি সাধারণ কর্ম্ম।"

নরসিং আদালতেই বলে উঠেছিল—হাঁ হাঁ, মোটর ড্রাইবার লোক ডাকাত, মোটরে ডাকাতী হয়, মোটর ড্রাইবার লোক মাতাল, মোটর ড্রাইবার লোক্ আওরৎ নিয়ে ভাগে। মোটর ড্রাইবারের চেয়ে খারাপ লোক দুনিয়ায় নাই।

হাকিমের ধমক খেয়ে চুপ করেছিল নরসিং। দায়রায় চালান যাবার জন্য মনকে তৈরী করছিল। কিন্তু হাকিম দিলে বেকসুর খালাস।

এ খালাসের জন্য নরসিং তার নসীবের প্রশংসা করে না। তার নিজের

উকিলের ওকালতী বিদ্যাবুদ্ধির তারিফ করারও কিছু নাই। বাঁচিয়েছে তাকে ফটকী।

দিনের বেলার ফটকী ছিল বোবা মেয়ে—মাটির পুতুল। আদালতের কাঠগড়ায় হাকিম উকিল পেস্কার আর ঘর-ভরা লোকের সামনে কোন্ মন্তরে কোন্ দেবতার আশীর্ব্বাদে দিনের বেলার সেই মাটির পুতুল ফটকী মানুষ হয়ে কথা বলে উঠল। বাঁধ দিয়ে আটক করা থির জল বাঁধ ভেঙে ঝর ঝর আওয়াজ তুলে বেরুতে আরম্ভ করলে—তাকে যেমন আঁর আটকে দেওয়া যায় না তেমনি ভাবে তার যে মুখ আদালতে দিনের বেলায় খুলল—সে আর বন্ধ হ'ল না।

ফটকী এসে কাঠগড়ার উঠল; মাথার ঘোমটা কমিয়ে লোক-ভরা আদালত-কামরার চারিদিকে চাইলে প্রথমটা ফ্যালফ্যাল করে। তারপর তার চোখ পড়ল নরসিংয়ের উপর। তার মুখে একটু হাসি দেখা দিলে, চোখের হতবুদ্ধির ঘোর কেটে গিয়ে যেন দেওয়ালগিরির জোড়া সেজের মধ্যে দপ্ ক'রে মোমবাতির আলো জ্বলে উঠল। শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলে সে কাঠগড়ার কাঠের ফ্রেম। গাল দুটি লাল হয়ে উঠল। সাহুর উকিল তাকে জিজ্ঞাসা করলে—নরসিং তাকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে গিয়েছে কিনা, উকিলবাবুর বাড়ীতে ঝি থাকতে যাবার পথে?

সে ঘাড় নাড়লে। সে ঘাড় নাড়ার দোলায় তার মাথার ঘোমটা খ'সে পড়ে গেল। নরসিংয়ের মুখের দিকেই সে চেয়েছিল—ঘোমটা তুলতে বোধ হয় ভুলে গেল।

উকিল ধমক দিয়ে বললে—আমার দিকে চাও।

ফটকী কিন্তু চোখ ফেরালে না।

উকিল বললে—কথার জবাব দাও। নরসিং তোমার হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল কি না?

ফটকী নরসিংয়ের মুখের দিকে চেয়েই হাসিমুখে বললে—ওকে আমি ভালবাসি। আমি ইচ্ছা ক'রে ওর সঙ্গে এসেছি। ওর সঙ্গেই যাব।

তোমার বাপ—দেওর ?

না—না—। উকিলকে কথা শেষ করতেই দিলে না ফটকী। অসহিষ্ণু হয়ে কথার মাঝখানেই বলে উঠল—না—না। কথা বলার সঙ্গে সে প্রবলভাবে ঘাড় নাড়তে আরম্ভ করলে—না। না। না। না।

একদিন নয়, পুরো আড়াই দিন ফটকীর এজাহার নিয়ে লড়াই হয়েছিল। আড়াই দিনই নরসিংয়ের মুখের দিকে চেয়ে ফটকী এজাহার দিয়ে... সে তার কি কথা! এক ঘর লোক গিস্‌গিস্‌ করছে। পচা নর্দ্দমার গন্ধে সমায়েৎ নীলচে রঙের ভনভনে মাছির মত এক ঘর লোক। মধ্যে মধ্যে উকিলের বিশ্রী প্রশ্ন এবং ফটকীর বেপরোয়া জবাবগুলি শুনে মাছির ভনভনে আওয়াজের মত কুৎসিত কথা ও কদর্য্য হাসিতে তারা মেতে উঠেছে। চোখের চাউনি তাদের ওই মাছিগুলোর মতই ড্যাবডেবে, সে চাউনি স্থির হয়ে নিবদ্ধ ফটকীর মুখের উপর। ফটকীর গ্রাহ্য নাই। সে হাসিমুখে চেয়ে রয়েছে নরসিংয়ের দিকে।

উকিল ফটকীকে জিজ্ঞাসা করলে তার আগেকার কথা। বল্‌ল—তোমাদের গাঁয়ের অমুক মোড়লের ছেলে অমুককে চিনতে ?

নরসিং বারণ করে উঠল কাঠগড়া থেকে—না। আমার সাজা হোক—ও সব কথা ওকে শুধাবেন না।

ফটকী কী বুঝলে সেই জানে। সে বললে—না। আমি বলছি। আমার আবার লজ্জা কি ? মান কি ? ওই আমার সব। আমি সত্য কথা বলব। আমি যত বড় মানুষ তার এক শো গুণ বেশী পাপ আমার। সেই পাপের জ্বালা জুড়িয়েছে—ওই মানুষের সঙ্গ পেয়ে।

সে এবার চাইলে হাকিমের দিকে। বলতে আরম্ভ করলে—গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত বলে গেল তার কদর্য্য কলঙ্কভরা জীবনের কথা। শেষে বললে—এবার সে চাইলে মাটির দিকে—মাটির দিকে চেয়ে খসে-পড়া ঘোমটা মাথায় তুলে দিয়ে বললে—হুজুর, ও মানুষ আমাকে ডাকে নাই, নিজে দোতলার

বারান্দা থেকে কাপড় বেঁধে তাই বেয়ে নেমে ওর কাছে গিয়েছি, ওর বুকে গড়িয়ে পড়েছি, ও মানুষ আমার মাথায় হাত বুলিয়েছে, কিন্তু—

কিছুক্ষণ থেমে বললে—এমনি মাসের পর মাস। দু'মাস। আমি হুজুর ওই মানুষের, চরণ তলায় পড়ে থাকতে চাই; বাপ চাই না; দেওর চাই না; শেঠজীর ঘরের—উকিলবাবুর ঘরের সুখ চাই না; আমি ওকেই চাই। ওর কোন দোষ নাই—ওকে খালাস দেন। আমি ওর সঙ্গেই যাব। ও যদি না নেয় নদীতে জল আছে, দোকানে দড়ি মেলে, কল্কেফুলের গাছে ফলের অভাব নাই—আমি মরব।

নরসিং অবাক হ'য়ে ভাবছিল—এ কি হ'ল? এ কেমন করে হ'ল? কিসের গুণে এমন হয়? পেটের জ্বালায় যে দুনিয়ায় মা ছেলে বিক্রী করে, ভাল খাবার-পরবার লোভে যে দুনিয়ায় সধবা কুমারীতে ইজ্জৎ বিক্রী করে—সেই দুনিয়ায় এও ঘটে?

এর পর ডাক্তারসাহেব ফটকীর বয়স পরীক্ষা করে দেখলেন, বললেন—বয়স বিশ বছরেরও বেশী। সে সাবালিকা।

হাকিম খালাস দিলেন নরসিংকে। ফটকীর উপরেও রায় হল—সে আপন ইচ্ছামত যে কারুর সঙ্গে যেতে পারে।

নরসিং কোর্টের বারান্দায় বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে ফটকী এসে সেই জনতার মধ্যেই তার বুকে মাথা রেখে কাঁধে একটি হাত দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। নরসিংও তাতে লজ্জা পায় নাই। গিরবরজার ছত্রির ছেলে সে, পেশায় সে মোটর-ড্রাইবার, তার আর এতে লজ্জা কি? কিসের লজ্জা! সে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগল; সঙ্গে সঙ্গে ফটকীর সেই চোখের গরম লোনা জলে নরসিংয়ের মনে আগেকার দেখা যত মেয়ের মুখের ছাপ পড়েছিল সে সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

জানকীর মুখও মনে নাই তার। নীলিমাকেও আর মনে পড়ে না। ফটকী শুধুই ফটকী।

নরসিং গাড়ীতে স্টার্ট দিলে।

ভিতরে ফটকী বসেছে নরসিংয়ের সংসার নিয়ে। জিনিসপত্রগুলো সামলে নিয়ে সে গিন্নীর মত বসেছে। সে লালপেড়ে শাড়ী পরেছে, কপালে কুম্‌কুমের টিপ পরেছে, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে। এ যেন সে আগেকার কালের মেয়েই নয়। হাতে পরেছে চুড়ি—গিল্টির চুড়ি। বাঁ-হাতে ধরে রয়েছে এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি, ওটাতে আছে খাবার; কোন রকমে উল্টে যায়—সেই ভয়ে ধরে রয়েছে। ডান হাতে ধরে আছে সরা-চাপা জলের কুঁজো; কোলের উপর একটা ছোট সাজি, তার মধ্যে আছে টুকি-টাকি জিনিষ আর নরসিংয়ের বোতল গেলাস। তিনটে বোতল আছে। কখন যে দরকার হবে তার তো কোন ঠিকানা নাই। যে মানুষ! এ ছাড়া কাপড়ের গাঁঠরি, রান্নার জিনিষপত্র, মায় একটা মোড়া। গরম পুল-ওভার পর্য্যন্ত বার করে রেখেছে। অগ্রহায়ণ মাস, বেলা পড়লেই চলন্ত মোটরে শীত লাগবে। এ যেন সে মেয়েই নয়; মরে গিয়ে নতুন করে জন্মেছে ফটকী। ফটকীর পাশে বসেছে রামা। রামা ফিরে এসেছে অনেকদিন।

ফটকী রামাকে বলে, দাদাভাই।

রামচন্দ্রের ভাঁরি আমোদ লাগে, এ কি হাসির কথা! দাদা আবার ভাই কি করে হয়? সে হি-হি করে হেসেই সারা হয়, তার সে অভ্যাসের হাসি, বলে—তোমার যখন খোকা হবে তখন তাকে কি বলবে, বাবা-ছেলে?

যে-ফটকী আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে লজ্জা পায় নাই, সেই ফটকী ছেলের কথায় লজ্জা পায়, তার মুখ লাল হয়ে ওঠে, রামাকে লজ্জা দিয়ে জবাব দেবার মত ভাষা খুঁজে পায় না। আবোল-তাবোলের মত জবাব দেয়—তোমার বউ হলে তাকে বলব, বিবি-বউ।

তাতে রামের আপত্তি কি? বিবি-বউ তো সে চায়। সেও মোটর ড্রাইভারি করবে, এখন করে কণ্ডাক্টরী—এখনই তো সে মোটরের প্রতি ট্রিপে সুন্দর মুখ দেখে মনে মনে আকাশে ফুল ফোটাতে সুরু করে দিয়েছে।

"পাশের জঙ্গল থেকে হুম করে লাফিয়ে গাড়ীর সামনে থাবা গেড়ে বসে

একটা বাঘ। মেয়েটির সঙ্গীরা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে। মেয়েটির মুখ সাদা হয়ে যায়। তাকে 'ভয় কি' বলে আশ্বাস দিয়ে পেট্রোলের টিন ঢেলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে টায়ার রিমুভারের মাথায় জড়িয়ে জ্বেলে নির্ভয়ে নেমে যায় রাম। আগুন দেখে পালায় বাঘ। ছোরা থাকলে—সে লড়াই করে। বাঘের কলিজায় বসিয়ে দেয় ছোরা।" আরো কত উদ্ভট কল্পনা করে। "একসিডেণ্ট হয়, উল্টে যায় গাড়ী। রাম গাড়ীর নীচে থেকে সযত্নে উদ্ধার করে মেয়েটিকে।"

রামও চলেছে নরসিংয়ের সঙ্গে। নরসিং জিজ্ঞাসা করেছিল—দেখ্, ভেবে দেখ্, এখানে নতুন সার্ভিস খুলছে। নিতাই চাকরী পেয়েছে, তুইও চেষ্টা করলে পাবি। এখানে থাকবি, না, আমার সঙ্গে যাবি ভেবে দেখ্।

রাম বলেছে—দাদাবাবু, তুমিও যেখানে আমিও সেইখানে।

নরসিং সঙ্গে নিয়েছে রামাকে। রামের কথায় কিন্তু তার হাসি আসে। রাম এখনও নিতাইয়ের মত পাকা ড্রাইভার হয় নাই তো! হলে—। বাচ্চা পাখীর ডানার পালক এখনও শক্ত হয় নাই, পালকের নীচে ডানার খাঁজে খাঁজে হাড়ে মাংসে তাগদের তাগিদ আসে নাই; তাগদ হলেই সাড়া জাগবে, তাগিদ জানাবে মন। তখন পাখসাট্ মেরে নরসিংকে পাশ কাটিয়ে আকাশে উড়বার জন্য ছটফট করবে, ফাঁক পেলেই ভেসে পড়বে। যতদিন সে সময় না আসে ততদিন থাক্। কাজও অনেক দেয় রাম। তা ছাড়া ড্রাইভারি শেখাবার একটা সাক্রেদ না পেলেও ড্রাইভারি করে মন ভরে না। ফুল স্পীডে চলতে চলতে যখন সামনে কিছু পড়ে, এ্যাকসিডেণ্ট প্রায় অনিবার্য্য হয়ে ওঠে, মরিয়া হয়ে অসীম সাহসে ধাঁ করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ক্লাচ টিপে সে এ্যাকসিডেণ্টকে চুলের তফাতে ফেলে বাঁচিয়ে চলে যায়, তখন তার কৌশল বুঝবারও একজন লোক চাই। প্যাসেঞ্জারে বুঝতে পারে না সব ব্যাপার। বুঝতে পারে সাকরেদ—সে তারিফ করে। রাম একটু বেশী বলে; বলে—এ বাঁচাতে পারে এমন মরদ আমি দেখি নাই। আমার বুক কাঁপছিল।

বাপ রে! বাপ রে! এ ছাড়াও রাম জানকীর ভাই। তাই রাম সম্পর্কে অন্য ইচ্ছে আছে। দেখা যাক কি হয়!

আর সঙ্গে আছে জোসেফ। জোসেফও এখানকার চাকরী ছেড়ে এখানকার সমস্ত পাট উঠিয়ে দিয়ে চলেছে। জোসেফ বসেছে নরসিংয়ের পাশে, সামনের সিটে। নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে, একটা সিগারেট নরসিংয়ের মুখে গুঁজে দিয়ে, নিজের সিগারেটের আগুনটা দিয়ে ধরিয়ে দিচ্ছে। গাড়ী চলেছে ফুল স্পীডে। রাস্তায় এখন গাড়ী গরুর খুব ভিড় নাই। এই অগ্রহায়ণের প্রথম। ফসল এখনও মাঠে, সবে ধানে হলুদ রঙের আমেজ ধরেছে; সমতল রাস্তা— পরিষ্কার ভরা খুব লম্বা দীঘির স্থির জলের মত আরামদার নতুন শ্যামনগর-পাঁচমতী রোড; তার উপর চলেছে নরসিংয়ের গাড়ী, জার্কিং নাই, পুরনো গাড়ীতেও ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠছে না। চলেছে যেন দীঘির জলে নৌকার মত। শুধু শব্দ উঠছে চারখানা নতুন টায়ারের ঘুরপাক খেয়ে চলার। বিছানো মোরামের উপরে স্বল্পসল্প আলগা কাঁকরের উপর একটানা স-র-র শব্দ তুলে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল স্পীডে ছুটে চলেছে। পিছনে অনেক দূর পর্য্যন্ত পেট্রোলের ধোঁয়ার একটা আঁকাবাঁকা রেশ জেগে রয়েছে। নরসিং জোসেফকে বললে—হর্ন দিন।

সামনে টিমেতেতালায় এক সারি গরুর গাড়ী আসছে। আসছে ঠিক মাঝখানটা ধরে অর্থাৎ মোটরের জন্যে পাকা সীমানা জুড়ে, পাশের ছাই-বিছানো কাঁচা পথটায় হাঁটছে না। হর্নটার রবার বাল্‌বটা ফেটে ছিঁড়ে গিয়েছে, কেনা হয়েছে নতুন বাল্‌ব কিন্তু এখনও লাগানো হয় নাই, কাল রাত্রে চারখানা নতুন টায়ার লাগাতেই আধখানা রাত কেটে গিয়েছে; তখন আর ওটা মনে হয় নাই। বাল্‌বহীন হর্নটা জোসেফের হাতে রয়েছে। জোসেফ সেটাকে তুলে মুখে ফুঁ দিয়ে বাজাতে লাগল।

রাম পিছনে ফটিকীকে বললে—দাদাবাবুর বেতগাছটা কই? সেই সরু লিকলিকেটা?

নরসিং সামনে দৃষ্টি রেখে গাড়ীর স্পীড কমাতে কমাতে বললে—না।

রাম বললে—আসছে দেখ দেখি। মোটরের রাস্তা জুড়ে—

নরসিং বললে—রাস্তা সবারই।

জোসেফ বললে—কিন্তু বড় সয়তান বেটারা! বড় সয়তান!

নরসিং স্টিয়ারিং ঠিক করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। রাম বেত ব্যবহার করলে না কিন্তু মুখে গাল না দিয়ে ছাড়লে না—দেখতে পাও না বেটারা?

সে কথায় ওরা গ্রাহ্য করলে না। একজন বললে—হ্-হ্, খুব ছেড়েছে লাগছে।

খুব জোরেই চলেছে নরসিং; নতুন ভালো রাস্তায় জোরে চলার আনন্দেও বটে, এখান ছেড়ে নতুন সার্বিস লাইনের উদ্দেশে চলার ব্যগ্রতায়ও বটে। নতুন সার্বিস লাইনের সন্ধ্যান সে পেয়ে গিয়েছে। দিনদুনিয়ার মালেক—যে সকালে উঠে রাজা থেকে আরম্ভ করে মেথরের পর্য্যন্ত রুটি মাপে, বাঘের খোরাক থেকে স্নুরু করে পিঁপড়ের খুদের কণা, চিনির দানা মাপতে যার ভুল হয় না—সন্ধান অবশ্য তাঁরই, তবে উপলক্ষ্য নীলিমা দাস—দাস নয়—নীলিমা আর কানা ব্যানার্জ্জি। তারাই নতুন লাইনের সন্ধান দিয়ে চিঠি লিখেছে নরসিংয়ের মনে পড়ে রেল-স্টেশনের কথা। ওরা যেদিন পালায় দুজনে, সেদিন ব্যানার্জ্জি পেট্রোলের দাম বলে দুটো টাকা দিতে এসেছিল কিন্তু নরসিং বলেছিল—না। নীলিমা ব্যানার্জ্জীর হাত থেকে টাকা দুটো কেড়ে নিয়ে নিজের ব্যাগে পুরে বলেছিল—ছি! ওঁর অপমান ক'রো না। ভারী ভাল মেয়ে নীলিমা। নীলিমার কথা মনে হলেই নরসিং দুনিয়ার হালচালের মজার কথা ভাবে। গিরবরজার হাড়ির মেয়ে নীলিমা আর গিরবরজার ছত্রি বংশের সিংহরায় বাড়ীর ছেলে সে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নরসিং।

নীলিমা এবং ব্যানার্জ্জী কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। সেখানে চাকরীও যোগাড় করে নিয়েছে। অণ্ডাল-অঞ্চলে মিশনের একটা ব্রাঞ্চে চাকরী

পেয়েছে তারা। ব্যানার্জ্জী কাজে লেগে গিয়েছে। নীলিমাও সেখানে, তবে সে মাস কয়েক পরে জয়েন করবে। খোকা হবে নীলিমার। নীলিমার হবু খোকাকে দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করে নরসিং। ওই হবু খোকাই তাকে আর এক ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচিয়েছে। জোসেফ এবং তার মায়ের সঙ্গে এই নিয়ে খুবই ঝগড়া হবার কথা। কানা-খোঁড়া কুৎসিত ওই ব্যানার্জ্জীর ছেলেকে তারা পছন্দ করত না। ও কানা-খোঁড়ার চাকরী হবারও কথা নয়। তা ছাড়া ব্যানার্জ্জীরাও কখনও এমন বাড়ীর মেয়ে ঘরে ঢোকায় নাই, চিরকাল এই সব ছোট-কাজ-করা কৃশ্চানদের ঘেন্নাই করে এসেছে। ঝগড়া নিশ্চয়ই হত। কিন্তু নীলিমা 'মা হতে চলেছে'—নিজের এই অবস্থা জানিয়ে যে চিঠিটা লিখে নরসিংয়ের হাতে দিয়েছিল, সেই চিঠিটা পড়ে জোসেফ একটি কথাও বলে নাই, তার মাও কিছু বলে নাই। ব্যানার্জ্জীর বাবা চটেছিল নরসিংয়ের উপর। কিন্তু তাদের কি তোয়াক্কা করে নরসিং? রাম কহো! দুনিয়ায় সে কারও তোয়াক্কাই করে না। তোয়াক্কার কথাই নয়, কথাটা হ'ল 'দোস্তির কথা, বেরাদারির কথা'। ওই জিনিসটা হারানোর চেয়ে 'বদ্-নসীবি' আর নাই। ফটকীর মামলায় কত সাহায্য করলে জোসেফ। আর নিতাই? নিতাইয়ের সঙ্গে ছুটে গেল, ভেঙে গেল সম্বন্ধ, নিতাই তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে। তবে নিতাইয়ের সঙ্গে দোস্তি ভাঙার জন্যে নরসিংয়ের কোন দোষ নাই। নিতাই-ই বেইমানি করলে। সেই নিমকহারাম, সেই বেইমান। রুটির টুকরোর জন্যে বেইমানি করলে সে। করুক। তার জন্যে প্রথম প্রথম তার অনেক রাগ হ'ত—আর রাগ হয় না। এই দুনিয়া। তার দিদিয়া একটা ছড়া বলত—"এ পিথিমী সাত রঙ্গের পুরী, কেউ হাসছেন—কেউ কাঁদছেন—কেউ করছেন চুরি।" দুঃখ পেয়ে সাধু জ্ঞানীতে হাসে, সংসারীতে কাঁদে, আর নেহাৎ যারা ছোট তারা দুঃখ ঘুচাতে চুরি করে, ডাকাতি করে, খুন করে, জাল করে। নিতাই বেটা নেহাৎ ছোট, ছোট কাজ করেছে। বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে সাহু-বোস কোম্পানীর সার্বিস লাইনে ড্রাইভারী চাকরী পেয়েছে। শুকো—চল্লিশ টাকা

মাইনে। রামেশ্বরোয়া, তারক এরাও দু'জনে জুটেছে ওই কোম্পানীতে। ওরা সেদিন নতুন গাড়ী নিয়ে, বুক ফুলিয়ে, কৃশ্চানপাড়ার দীঘিতে ধুতে এসেছিল। আগে নীলিমাকে ইঙ্গিত করে চীৎকার করত—নীলজল, নীলজল বলে; সেদিন চীৎকার করেছিল—ফটিক জল, ফটিক জল, ফটিক জল। জোসেফ চটেছিল, রাম চটেছিল, কিন্তু নরসিং চটে নাই। বলেছিল—যানে দো ভেইয়া। রাম বলেছিল—দশ টাকা বেশী মাইনের চাকরী হওয়ায় বেটাদের গরম বেড়েছে। আরে সীতারাম! দশ টাকা বেশী মাইনে হলেও তো গোলামি! আরে গোলামি করতে রাজী হলেও তো নরসিং তোদের মাথার উপর বসত। থুঃ—থুঃ—থুঃ। আবার বলে সার্বিস লাইনসে তো ভাগিয়েছি।

দূর! দূর! দূর! আরে—ঘরের কোণের চামচিকে, আকাশের গিরবাজকে বলিস, তোকে তাড়ালাম আমি।

এত বড় দুনিয়া; মাটি মাটি মাটি—গ্রাম, শহর, জেলা, দেশ, পরদেশ, পাহাড়, বন—দুনিয়ার কি শেষ আছে রে? মাটি খুঁড়ে, বন তোলপাড় করে, পাহাড় ঢুঁড়ে মানুষের কারবার চলেছে। পাহাড় ফুঁড়ে টানেল বানিয়ে, উঁচু জমি কেটে সমান করে, নিচু জমিতে মাটি ফেলে বাঁধ বেঁধে কোম্পানী পাতছে রেল-লাইন—নদী নালা গঙ্গা-যমুনার মত দরিয়ার উপর 'বিরিজ' বানিয়ে চালাচ্ছে রেল, খাল বিল নদী নালা সমুদ্দুরে চালাচ্ছে নৌকা ইষ্টিমার জাহাজ, আজ কলকাতা থেকে পেশবর তক্ চলেছে মোটর—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, আকাশে উড়ছে উড়ো-জাহাজ, আজ ওই সাত মাইল রাস্তায় সার্বিস্ বন্ধ করে নরসিংয়ের গাড়ী চালানো বন্ধ করবি? ফুঃ—ফুঃ—ফুঃ!

মেরী নীলিমা আর কানা ব্যানার্জি সন্ধান পাঠিয়েছে। অণ্ডালের আশে-পাশে লাল কাঁকুরে মাটি আর কালো পাথরে ঢেউ-খেলানো ধূ-ধূ করা মাইলের পর মাইল ধরে জনমানবহীন একটা অঞ্চলে কয়লার খাদ গড়ে উঠেছে। একটা আধটা নয়, বিশ ত্রিশটা কলিয়ারীর কাজ আরম্ভ হয়েছে। সেখানে ঢেউ-খেলানো পাহাড়ে মেজাজের চড়াই-উৎরাই ভাঙতে পারলে আর কোন হাঙ্গামা

নাই; চালাও গাড়ী। মিশনের গাড়ী আছে, জোসেফের চাকরী ঠিক ক'রে দিয়েছে সেইখানে। সেই সঙ্গে লিখছে—"নরসিংবাবু এখানে ট্যাক্সী নিয়ে এলে খুব সুবিধে হবে তাঁর। খুব চাহিদা গাড়ীর। চারিদিকে কলিয়ারীর সঙ্গে গ্রাম হাট বাজার গড়ে উঠছে। দু-একখানা ট্যাক্সী আসানসোল থেকে মধ্যে মধ্যে আসে—যায়। এখানে রেগুলার সার্বিস খুললে লাভ হবে।"

সেইখানে চলেছে নরসিং তার গাড়ী নিয়ে। এ অঞ্চল নরসিংয়ের না-দেখা নয়। মেজবাবু, তার জীবনে শনি ছিল মেজবাবু, যত ভাল দিয়েছে তত মন্দ দিয়েছে। মেজবাবুদের কুঠিতে এদিকে ঘুরে এসেছে নরসিং।

মনে মনে এবার সে অনেক মতলব করেছে। নসীব অনেক ফেরে তাকে বাঁধতে চেয়েছে, সব ফের কেটে বেরিয়ে দিল্‌কে শক্ত ক'রে বেঁধে চলেছে সে। বাড়ীতে বাপকে টাকা দিয়ে যে ক' বিঘে জমি করেছিল—সে জমি ক' বিঘে বেচে দিয়েছে। বাপের সঙ্গে গিরবরজার সঙ্গে তার ফারখৎ। বাপ বলেছে—তোর মুখ আমি দেখব না, তোর হাতের আগুন আমি নেব না। তুই ছত্রি-বংশ থেকে খারিজ।

বাস্, বাস্। খারিজ। নরসিং শুধু নরসিং, শুধু মোটর ড্রাইভার—সে আর কেউ নয়, কিছু নয়। জমি বিক্রীর আট শো টাকা তার মজুত। আরও একশো টাকা সে পেয়েছে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের ইলেকসানে। কংগ্রেস নেমেছিল এবার। সে কংগ্রেসকে দিয়েছিল তার গাড়ী। কংগ্রেস হারিয়ে দিয়েছে নিতাইয়ের সেই মাতালবাবুটাকে। তাতেই নরসিং খুসী। তে-রঙ্গা ঝাণ্ডা গাড়ীর সামনে লাগিয়ে গোটা শহরটা সেদিন সে ঘুরেছিল। কংগ্রেস দেড়শো টাকা দিয়েছে আর মামলায় তাকে উকীল দিয়েছিল অল্প পয়সায়। বাস্। এই তার বহুৎ—খুব।

মোট এখন ন'শো টাকা তার মজুত। আর কিছু কামাতে পারলেই সে একটা নয়া গাড়ী কিনবে ইন্‌স্টল্‌মেণ্টে। রামাকে বসিয়ে দেবে এ গাড়ীতে। নিতাইয়ের বেলা ভুল হয়েছে তার। আবারও ভুল হয় হবে।

জোসেফ আবার হর্ন দিলে।

বাস আসছে পাঁচমতী থেকে।

কে ড্রাইভার? রামেশ্বরয়োয়া। তারক কণ্ডাক্টর। তারক চেঁচিয়ে উঠল—ইয়ে ভাগতা হ্যায়! নরসিং হাসলে। উল্লুকরা জানে না। গোলাম। ছুঁচোর গোলাম চামচিকে। ওদের সঙ্গে বাত-চিত করবে না নরসিং। রামা কিন্তু চেঁচিয়ে উঠল—ভাগতা নেহি, চল রহে হ্যায় নয়া লাইনমে।

এ্যাক্সিলেটারের চাপ কমিয়ে ক্লাচে পা দিলে নরসিং। স্টিয়ারিং ঘুরছে।

জোসেফ জিজ্ঞাসা করলে—পাঁচমতীর ভিতরে ঢুকবেন নাকি?

হ্যাঁ, আমার দোস্তের সঙ্গে দেখা করব। সুরেশ দাস।

দাস অদ্ভুত মানুষ। এই ক'দিন আগে একজনকে চড় মেরে দশ টাকা জরিমানা দিয়েছে ইউনিয়ন কোর্টে। নরসিংকে সে সমাদর ক'রে একবেলা ধ'রে খাইয়ে তবে ছেড়ে দিলে। যাবার সময় খুব খুসী হয়ে বললে—চলে যাও দোস্ত, নির্ভাবনায় চলে যাও। কলিজায় হিম্মৎ, গায়ে তাগদ আর মাথার উপর ধরম, এ থাকলে চোখ বন্ধ ক'রে চলে যাও দুনিয়ায় যে দিকে ইচ্ছে।

শেষকালে বললে—ওখানে যদি সুবিধে হয় তো আমাকে লিখো। আমি গিয়ে মিষ্টির দোকান করব।

গাড়ীতে স্টার্ট দিলে। গাড়ী চলল শ্যামনগরের শহরের ধূলোর উপর —পাঁচমতীর ধূলো লাগল গাড়ীর গায়ে। গাড়ী এসে থামল ময়ূরাক্ষীর ঘাটে।

সাহু-বোস কোম্পানীর মোটরবাসের আস্তানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে— 'জয় মা কালী'। গাড়ী থেকে নেমে এল নিতাই। ঘাটে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। জোসেফ রাম মোটর ঠেলছে। টপগীয়ারে গাড়ী চলছে, তাও আস্তে। বালি এখন ভিজে রয়েছে। নরসিং হাঁকছে—আরও জোরে। আউর জোরা। আচ্ছা ভাই। বহুৎ আচ্ছা।

গাড়ীখানা অপেক্ষাকৃত জোরে চলতে লাগল। রাম ক্ষুব্ধ আক্রোশে বললে—থাক্ থাক্, তোকে লাগতে হবে না।

নিতাই এসে গাড়ী ঠেলতে লাগছে। সে হাসলে, রামের কথার জবাবও দিলে না, ঠেলতেও ক্ষান্ত হল না। মহিষের মত যেমন চেহারা নিতাইয়ের, তেমনি শক্তি; তার ঠেলাতেই বালি ঠেলে বেশ সহজেই চলছে। নিতাই জানে নরসিং চলে যাচ্ছে। তাই সে এই নদী পার হয়ে ওপারে চলে যাবার সময়টিতে আর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। লাইসেন্সের লোভে সে ওস্তাদকে ছেড়ে রামেশ্বরোয়ার সঙ্গে জুটেছিল। অনেকদিন ধরেই তার লাইসেন্স নেবার সখ। ওস্তাদ বলত মুখে—এইবার হবে, ক'রে দোব। কিন্তু কি জানি নিতাইয়ের মনে হ'ত নরসিং তেমন গ্রাহ্য করছে না কথাটা। তাই সে রামেশ্বরোয়ার আশ্বাস পেয়ে আগ্রহ দেখে তার সঙ্গে না জুটে পারে নাই। রামেশ্বরই খাওয়া-পরা আর পনের টাকা মাইনের চাকরী সেই মাতালবাবুর বাড়ীতে জুটিয়ে দিয়েছে। সে তো নরসিংয়ের কোন ক্ষতি করে নাই! যতদিন তার কাছে ছিল দেবতার মত ভক্তি করেছে, খেটেছে সে গরুর মত। তার লাইসেন্স হওয়ায়—চাকরী হওয়ায়—ওস্তাদের খুসী হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু খুসী হওয়া দূরের কথা, ওস্তাদ তার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দিলে। মদের দোকানে বেইমান নিমকহারাম শূয়োরকি বাচ্ছা বলে গাল দিয়েছে—সে কথাও নিতাইয়ের না-শোনা নয়। তবে নিতাইয়ের দোষটা কোথায়? হ্যাঁ, একটি দোষ সে করেছে। সাহু-কোম্পানীর চাকরীর লোভে সে ফটকীর মামলায় ওস্তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে। তাও সে একটি মিছে কথা বলে নাই। একটিও না। তার জন্যে সে হাজার শাস্তি নিতে রাজি আছে। সাহু-কোম্পানী ওস্তাদের অনেক ক্ষতিই করেছে। এ লাইন তো বলতে গেলে ওস্তাদেরই লাইন। যখন রাস্তায় গরুর গাড়ীর চলতে কষ্ট হত তখন ওস্তাদ এই রাস্তায় গাড়ী চালিয়ে লোকের চোখ খুলে দিয়েছে। আজ রাস্তা ভাল হ'ল—ওস্তাদকে দিলে উৎখাত ক'রে। সে

পাপ নিতাইয়ের নয়। সে চাকরী করছে—চাকর। কিন্তু—। ওস্তাদের এইভাবে চলে যাওয়ায় তার বড় দুঃখ হচ্ছে। সে তাই এগিয়ে এসেছে। গাড়ী ঠেলার সুযোগ পেয়ে ছুটে এসেছে। দুটো কথা বলে সে চলে যাবে।

গাড়ীটা এপারে এসে উঠল। আরও খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে নরসিং গাড়ীতে ব্রেক কষলে। নিতাই কিন্তু কথা বলতে সাহস করলে না। সে ফিরল। নদীর জলে নেমে হাতের ধুলো কালি ধুয়ে একটু দাঁড়াল। তারপর সে আবার ঘুরে এল নরসিংয়ের কাছে। হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বললে—ওস্তাদ!

নরসিং ভুরু কুঁচকে চাইলে তার দিকে।

এবার তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে নিতাই বললে—গাল দেন, মারুন, যা করবেন—কিছু বলব না, কিন্তু কথা না-বলে যাবেন না। মাফ ক'রে যেতে হবে, আমার দোষ হয়েছে।

নরসিং একটু চুপ ক'রে থেকে হেসে পিঠে হাত দিয়ে বললে—মাফ।

নিতাই বললে—আপনার নসীবটা ভাল নয় ওস্তাদ। ইমামবাজার থেকে কুঠিঘাট সার্বিস—মেজবাবু প্রথম খোলেন বটে—কিন্তু আপনি ছিলেন ড্রাইভার। মেজবাবু মারা যেতে আপনি লাইনটা জমালেন। রেল-কোম্পানী আর বুধাবাবু মিলে আপনাকে উৎখাত করে লাইনটা নিয়ে নিলে—আবার—

নরসিং বাধা দিয়ে হেসে বললে—দেখি আবার কে কোথা উৎখাত করে!

কোথায় যাবেন?

সে কথায় জবাব না দিয়ে নরসিং বললে—মন পাতিয়ে কাজ করিস। মোটরের কাজ ভাল করে শিখিস। ভাল হবে।

ওপারে সাহু কোম্পানীর মোটর বাসের কণ্ডাক্টর হর্ন দিয়ে উঠল; সার্বিসের গাড়ী ছাড়বার সময় হয়েছে। নরসিং বললে—যা, হর্ন দিচ্ছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিতাই বললে—যাই। কি, কোথা চললেন?

হেসে নরসিং নিতাইকে জবাবটা এড়িয়ে যাবার জন্যেই বললে—আরে,

দুনিয়ায় কি যাবার ভাবনা আছে নাকি ? বন কেটে শহর বানাচ্ছে, পাহাড় কেটে পথ বানিয়ে—সেই পথে মানুষ ছুটছে, ধূ-ধূ করা ডাঙায় কারখানা বানাচ্ছে, আশেপাশে গড়ছে হাটবাজার ; মানুষ দলে দলে ছুটছে—পিঁপড়ের মত দানার সন্ধানে। দুনিয়াতে এখানে জলকর, ওখানে ফলকর, সেখানে বনকর, লা-মহল কয়লা-মহল, অভ্রের খনি, ক্ষেত-খামার ফসল-কুটো—দৌলতের কি অভাব আছে ? যেখানে দৌলত সেইখানে মানুষ, যেখানে মানুষ যাবে সেইখানে গাড়ী যাবে। চললাম তেমনি কোথাও। হা-হা ক'রে হাসতে লাগল সে।

ওপারে হর্ন বাজছে ঘন ঘন। নিতাই আর থাকতে পারলে না। আজ প্রথম সার্বিস। দেরী হলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তা ছাড়া সার্বিসের ড্রাইভার হিসেবে কাঁটা ধরে গাড়ী ছাড়বার একটা শখও তার মনে খুব তাগিদ দিচ্ছে, সে ফিরল। কিন্তু মনের মধ্যে কাঁটার খোঁচার মত বিঁধে রইল একটা দুঃখ। ওস্তাদ তাকে পুরো বিশ্বাস করলে না। কোথায় যাচ্ছে সে কথাটা বলে গেল না।

সে দুঃখ নরসিংয়ের বুকেও বেজে রইল। কিন্তু তার সঙ্গে একটু আনন্দও রইল, নিতাইকে অবিশ্বাস করে যে অপমানটুকু করা যায় সেটুকু না-করার মত ঔদার্য তার নাই। তবু স্তব্ধ হয়ে সে গাড়ী চালাতে লাগল। চলল গাড়ী।

মুরশিদাবাদের পলিমাটির দেশ পার হয়ে—বীরভূমের পাথুরে শক্ত মাটির দেশের মধ্য দিয়ে দেশ হতে দেশান্তরের ধুলো মেখে, তার গাড়ী চলল যে রাস্তা থেকে তাকে উৎখাত ক'রে বুধাবাবু আর রেল কোম্পানী মনোপলি সার্বিস খুলেছে সেই রাস্তা ধ'রে—সাঁকোর উপর দিয়ে, নদী নালা পেরিয়ে চলল। বড় নদীর বালিতে নেমে, টপগিয়ারে—মানুষের ঠেলায়, সে নদী পেরিয়ে চলল তার গাড়ী। আশপাশের মাঠ জঙ্গল গ্রাম পাক দিয়ে গোল হয়ে ঘুরছে ; পথের পাশের গাছগুলো ছুটছে পিছনের দিকে সোজা লাইনে ; মাইলপোস্টের পর মাইলপোস্ট পার হয়ে চলল গাড়ী। সামনে এগিয়ে এল নতুন দেশ। মধ্যে মধ্যে কালো পাথরের চাঁই-জেগে-ওঠা

লাল মাটির দেশ, চড়াই আর উৎরাই, উৎরাই আর চড়াই। তিরিশ ফুট চড়াই উঠে পঁচিশ ফুট নেমে—আবার পঞ্চাশ ফুট চড়াই, তারপর বিশ ফুট ঢালে নেমে—ফের ফুট চল্লিশেক উঠে মাইলখানেক সমতল চলেছে। গরুর গাড়ী এবং মোটরের টায়ারের দাগ-আঁকা রাস্তার চিহ্ন।

এ দেশ নরসিংয়ের না-দেখা নয়।

মেজবাবু মরেছিল এই দেশে। সেই ফক্কি-ফটিয়াটা—সেইটায় চেপে এখানকার এক ফিরিঙ্গী গরীব ম্যানেজারের মেয়ের সঙ্গে হুল্লোড় করতে আসত রোজ রাত্রে। একদিন মাতোয়ারা হয়ে ফিরবার সময়—একটা পাথরের চাঁইয়ে ধাক্কা লাগিয়ে ছটকে পড়ে রইল অজ্ঞান হয়ে সমস্ত রাত্রি। সকালে কিন্তু সেই শরীরেই জ্বর নিয়ে জাঁদরেল ফিরেছিল কুঠীতে। তারপর নিউমোনিয়া। তারপর একদিন ঠাণ্ডা হয়ে গেল মেজবাবু। একটা ছুটন্ত ইঞ্জিন যেন 'বিরিজ' ভেঙে পড়ে গেল নদীর জলে। মেজবাবুর দেহটা সেই নিয়ে গিয়েছিল বাবুদের বাসে তুলে গঙ্গাতীরে। সেলাম—মেজবাবু—সেলাম।

আরে—আরে—!—ঘ্যাচ করে টানলে নরসিং হাণ্ডবেক, পায়ে কষে বসিয়ে দিলে ফুটব্রেকটা। গাড়ীটা থেমে গেল। চড়াইয়ের মাথা থেকে কেমন করে গড়িয়ে নেমে আসছে একটা আধমণি পাথরের চাঁই।

রাম ফটকী শিউরে উঠেছে। নরসিং হেসে আবার স্টার্ট দিলে। চলল গাড়ী। ফের পঞ্চাশ ফুট চড়াই। কেয়াবাৎ রে দেশ! আহা-হা! চোখ জুড়িয়ে গেল। চারিদিক খাঁ-খাঁ করছে, কিনারায় কিনারায় নীল মেঘ নেমে এসে লাল মাটি ছুঁয়েছে। তার মধ্যে কলিয়ারী হচ্ছে। এদিকে—ওদিকে —সেদিকে। মধ্যে মধ্যে কাঠের পোস্টের মাথায় কাঠের ফলকে লেখা—টু—কলিয়ারি। দেখা যাচ্ছে গীয়ার হেডের ছাঁদাছাদি-করা ফ্রেমের একেবারে মাথার উপরে ঘুরছে চাকা, আকাশ-ছোঁয়া চিমনী, চিমনীর মুখ থেকে আকাশের গায়ে কালো ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। মধ্যে মধ্যে খুব কাছে এসে পড়ছে কলিয়ারী, দেখা যাচ্ছে সারি সারি কুলী-ধাওড়া; নোংরা, ময়লামাটি-কালি-

ঝুলিতে ভরা আধনেংটী সাঁওতাল-বিলাসপুরিয়া মালকাটাদের দুর্গন্ধে ভরা ডেরা। গিজগিজ করছে। কলকল করছে। ফটকী দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দেয়, জোসেফ নাকে রুমাল ঢাকে, রামা হি-হি করে হাসে। নরসিংয়ের দুই হাত বন্ধ,—তা ছাড়া সে গন্ধও পায় না—পেট্রোলের গন্ধ ঢেকে দিয়েছে সব। হঠাৎ তার হাসি পায়। জোসেফ নাকে রুমাল দিচ্ছে। হায় দুনিয়া! নিজের গায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে না। তেলে কালিতে মোবিলে পেট্রোলে ধুলোয় ভরা, গায়ে মোবিলের লোহার গন্ধ! ওরা কাটে মালিকের জন্যে কয়লা—নরসিংরা গাড়ী চালায় পরকে চাপিয়ে, পরের হুকুমেতে, পরের দরকারে, পরের আমোদের কারবারে। কুছ ফরক নেহি। গাড়ী আবার ঘুরল। নতুন পিট কাটাই হচ্ছে এখানে। পিটের মুখে স্তূপ হয়ে জমে আছে মাটি পাথরের রাশি, ইটের ভাটা পুড়ছে, ইট পাড়াই হচ্ছে, টিনের এবং ছাপরার শেড দেখা যাচ্ছে, বড় বড় শেড তৈরী হচ্ছে, তার টি-আঙ্গেল-জয়েস্ট গড়া বিচিত্র ফ্রেম দাঁড়িয়ে আছে; মধ্যে মধ্যে সাদা চুনকাম করা বাংলো ঝকমক করছে; মাঝে মাঝে এসে পড়ছে সাইডিং লাইন, লাইনের উপর দাঁড়িয়ে আছে সারিবন্দী ওয়াগন। দু-একখানা মোটরও পেরিয়ে গেল; তার মধ্যে সাহেবী পোষাকপরা ম্যানেজার কিম্বা মালিক যাচ্ছে বোধ হয়। কেয়াবাৎ দেশ! আজব কারখানার নতুন দেশ তৈরী করছে মানুষ এখানে। বিলকুল নতুন দুনিয়া! তার পূর্ব্বপুরুষ গিরধারী সিংয়ের আমলে এ দুনিয়া ছিল না। গিরধারী সিং এসে বনের মধ্যে আড্ডা গড়ে বন কেটে চাষী ক্ষেত গড়েছিল। সে চলেছে একালের এই নতুন দুনিয়ায়। ঘোড়ায় চড়ে বয়েল গাড়ীতে মাল নিয়ে এসেছিল গিরধারী সিং। সে চলেছে মোটরে চেপে। কলকারখানা—লোহা লক্কড়ের কারবার। ভাল নসীব বল—ভাল নসীব। মন্দ বল—মন্দ। কিন্তু না এসে নরসিংয়ের উপায় ছিল না। দুনিয়াই তাকে ঠেলে নিয়ে এসেছে। সেও এসেছে খুশী হয়ে। এইখানেই নরসিং ঘর বাঁধবে। সেই ঘরে থাকবে

ফটকী। পুরনো গাড়ী বেচে নতুন গাড়ী কিনবে, ট্রাক কিনবে। রোজকারে পকেট ভরে এনে ফটকীর আঁচলে দেবে—ব্যাঙ্কে রাখবে। খোকা হবে। হবে বৈকি। তাকেই দিয়ে যাবে সে নিজের সব বিদ্যে, মেকানিক করে তুলবে; তাকেই তো দিয়ে যাবে সে তার জমি-বিক্রী-করা টাকায় কেনা গাড়ী আর উপার্জ্জন-করা টাকা।

বাঁয়ে।—হাঁকলে জোসেফ।

সামনেই রাস্তাটা তিন ভাগ হয়েছে। বাঁয়ের রাস্তাটার গায়ে লেখা—'টু—মিশন'। বেঁকে মোড় ফিরল মোটর। ফের গিয়ার দিয়ে নরসিং স্পীড বাড়ালে গাড়ীর। চলল গাড়ী।